সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-খ

গ. কিরিলেঙ্কো, ল. করশুনোভা

দর্শন কী

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

150/-

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ

গ. কিরিলেঙ্কো, ল. করশুনোভা

দর্শন কী

GRONTHO.COM

বুক পয়েন্ট
সোনাদিঘীর মোড়, রাজশাহী
মোবাইল নং-০১৫৫৮৮৬০৭৭০

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: প্রফুল্ল রায়

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী: ফ. ভোলকভ (প্রধান সম্পাদক), ইয়ে. গুবাস্কি (প্রধান সহসম্পাদক), ফ. বুর্লাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন, ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউরলভ

АВС СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Г. Кириленко, Л. Коршунова

ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?

На языке бенгали

ABC OF SOCIAL AND POLITICAL KNOWLEDGE

G. Kirilenko, L. Korshunova

WHAT IS PHILOSOPHY?

In Bengali

© Progress Publishers 1985
©বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

К $\frac{0301010000-541}{014(01)-88}$ 298—88

ISBN 5-01-000809-2

সূচী

১। দার্শনিক জ্ঞানের উৎস ৭
জাগরূক চিন্তা ১০
বিশৃঙ্খলা থেকে সুসমঞ্জসতা ১৭
'অত্যাশ্চর্য গ্রীক ব্যাপার' ২৩
সক্রেটিসের প্রাণনাশ করা হয়েছিল কেন? . ২৭
বিজ্ঞানের ক্রোড়ভূমি ৩১
যে বিজ্ঞান সর্বদাই নবীন ৩৮
বিজ্ঞানী, না বিজ্ঞ ব্যক্তি? ৪২

২। দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্ন ৪৯
কী দিয়ে আমরা শুরু করব? ৪৯
ভাববাদ ও ভাব ৬১
বস্তুবাদী চোখে পৃথিবী ৬৫
বিরাট ঘড়ি-প্রস্তুতকারক ও বিরাট ঘড়ি . . ৭০
তৃতীয় এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কি সম্ভব? . ৭৪
হতাশাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ৭৮

আশাবাদের মূল ৮২
হ্যামলেট না ফাউস্ট? ৮৬
বাদ্যযন্ত্রহীন বাদক ও একটি উন্মাদ পিয়ানো ৯১
দ্বন্দ্বগুলির মূল ৯৭
পার্থিব ঝঞ্ঝার 'স্বর্গীয়' প্রতিধ্বনি . . ১০৬

৩। পৃথিবীর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দুটি মত ১১২
ডায়ালেকটিকস কী? ১১৪
সব কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ১১৮
অধিবিদ্যা কী? ১২৫
তিনটি বিরাট আবিষ্কার ১২৮
ক্রমবিকাশ কীভাবে কাজ করে? . ১৩৪
গতির কি শুরু আছে? ১৪০
ডায়ালেকটিকস ও একলেকটিকস . . ১৪৫
নিরাকরণের নিরাকরণ ১৫০
বৃত্ত, সরল রেখা, না ঊর্ধ্বমুখী সর্পিলতা? ১৫৩
পদ্ধতিতত্ত্ব — বিজ্ঞানের আত্মা . . ১৬০
ডায়ালেকটিকস — বিপ্লবের বীজগণিত . . ১৬৮

৪। মানুষ কীভাবে পৃথিবীকে জানতে পারে ১৭২
জ্ঞানের সমীপবর্তী হওয়ার দুটি পথ . ১৭২
জানা মানে কাজ করা ১৮৪
'অলিখিত ফলক' ও 'জন্মগত ভাবধারণার' তত্ত্ব ১৮৭
মানুষের কী বিশ্বাস করা উচিত — তার ইন্দ্রিয়,
না মন? ১৯২
ইন্দ্রিয়গুলি হল জগৎকে দেখার জানালা . ১৯৪
ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে মন ২০২
ভাবগুলি কীভাবে দেখা দেয়? ২০৫
অবধারণা ও সৃষ্টিশীলতা ২১১
একটি সমস্যা উপস্থিত করেই সৃষ্টিশীলতা
শুরু হয় ২১৪

নতুনের সন্ধান ২২০
'রহস্যোদ্ঘাটন' ও তার রহস্য ২২৩
কল্পনা করা মানে রূপান্তরিত করা . . ২২৫
স্বাভাবিকের মধ্যে অস্বাভাবিক ২৩০
সত্যের অন্বেষণে ২৩৩
সত্যান্বেষীরা প্রবঞ্চিত হতে পারে . . . ২৩৬

৫। দর্শন ও সামাজিক জীবন ২৪৫

টীকা ও ব্যাখ্যা ২৬৩

নামের সূচি ২৬৯

১। দার্শনিক জ্ঞানের উৎস

GRONTHO.COM

অনতিদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর অবস্থা কী রকম হবে, সেটা প্রত্যেকেরই ভাবনার বিষয়, সে ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক কর্ম, রাজনৈতিক সংগ্রাম বা বিপ্লবী আন্দোলন থেকে যত দূরবর্তীই থাকুক না কেন। মানুষের ভাগ্যে কী আছে: যুদ্ধের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড, না শান্তিপূর্ণ জীবন? পৃথিবী কী রকম হবে — প্রকৃতি কি টিকে থাকবে, না বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতির ফলে বিনষ্ট হবে? নিপীড়ন ও সামাজিক অন্যায় কি পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হবে, না চিরকাল থাকবে? ভূমণ্ডলের প্রতিটি মানুষের সামনেই দেখা দেয় এই **সাধারণ** প্রশ্নগুলি। এগুলির সঠিক উত্তর দিতে হলে, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার।

দর্শনশাস্ত্র বা 'ফিলসফি' শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ দিয়ে তৈরি φιλεω — ভালোবাসা, এবং σοφιϑ — জ্ঞান; অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র হল জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা।

আমাদের চার পাশের জগৎ নিঃসীম। মানুষ তার প্রহেলিকাগুলির সমাধান করার শুধু চেষ্টা করতে পারে ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে; তবুও পৃথিবীকে সে সম্পূর্ণরূপে অবধারণা করতে কখনোই পারবে না। দর্শনশাস্ত্রে মূর্ত হয় অসীমকে অবধারণা করার উদ্দেশ্যে, বিদ্যমান সকল জিনিসের 'মূল ও কারণ' অবধারণা করার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য মানুষের প্রয়াস, এবং যা কিছু সে অর্জন করেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ। প্রাচীনকালের মহান দার্শনিক **প্লেটো** বলেছেন যে দর্শনের উৎস ছিল আশ্চর্য, বিস্ময়ের মধ্যে।

সুদূর প্রাচীনকালে দর্শন ও তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানান ধরনের ভাবধারণা দেখা দিয়েছিল। মহান গ্রীক চিন্তানায়ক **আরিস্ততল** এই মত পোষণ করতেন যে দর্শন বাদে সমস্ত বিজ্ঞানই এক বিশেষ লক্ষ্য অনুসরণ করে, দর্শনই 'সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে একা মুক্ত, কেননা একমাত্র এই বিজ্ঞানই আছে তার নিজের জন্য'।* কিন্তু, বিখ্যাত চিন্তানায়ক ও বাগ্মী সিসেরো স্পষ্টভাবে বলেছেন এর বিপরীত: 'আমরা তোমার শরণ নিচ্ছি, তোমার কাছে সাহায্য চাইছি...। হে দর্শন, জীবনের ধ্রুবতারা, আমরা বা স্বয়ং মানবজীবনই তোমাকে

---

* *Aristotle's Metaphysics,* Indiana University Press, Bloomington and London, 1966, p. 15.

ছাড়া থাকতে পারত না!'* কেউ কেউ মনে করতেন যে দর্শন ধর্ম থেকে অবিচ্ছেদ্য, ধর্মীয় মত আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে তা সাহায্য করে, পক্ষান্তরে অন্যদের মত ছিল এই যে তার ভিত্তি হল সন্দেহ আর বিচারবুদ্ধি, তাই তা ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, কারণ ধর্মের প্রস্থানস্থল হল বিশ্বাস।

দর্শনের অন্তঃসার ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তকদের মধ্যে আরও বেশি মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন যে দর্শন হল বিজ্ঞান সম্পর্কে এক মতবাদ, অন্যরা তাকে কলার সঙ্গে মেলান, আর অন্য আরও অনেকে, যেমন, ফরাসী লেখক ও দার্শনিক আলবেয়র কামু বলেন যে একমাত্র গুরুতর দার্শনিক সমস্যা হল আত্মহত্যার সমস্যা। আরও একদল চিন্তক আছেন যাঁরা 'দর্শন' কথাটাই বর্জন করতে বলেন।

এই বহুবিধ মতামতের মধ্যে নিজের অবস্থানটা ঠিক রাখার জন্য দর্শনের উৎসগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। কোথায়, কখন তা আত্মপ্রকাশ করেছিল? দার্শনিক চিন্তা কোনো কোনো সমাজে দ্রুত ও অন্যান্য সমাজে ধীরে ধীরে কেন বিকাশলাভ করেছিল? সব জাতিই কি দর্শনের জ্ঞান অনুধাবন করতে সক্ষম? এই ধরনের সব প্রশ্নই আমরা এই বইতে আলোচনা করতে চলেছি।

---

* Ciceronis, *Tusculanae Disputationes* V, 2, 5.

বোধগম্যভাবেই, সত্তার সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করতে সক্ষম হওয়ার উদ্দেশ্যে পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার, যা চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে। যুগ যুগ ধরে, এমন কি বহু সহস্রাব্দ ধরে মানবজাতির 'স্মৃতি' সূর্যগ্রহণ ও নদীর বন্যার মতো প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলির কারণ সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন সব ছাপ সঞ্চিত করেছে এবং জীবনের আবির্ভাব ও তার স্বাভাবিক বিলোপের কারণ সম্বন্ধে, মানবদেহের গঠনকাঠামো, প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা সঞ্চিত করে রেখেছে।

কিন্তু, প্রাচীন পৃথিবীতে মানুষ দীর্ঘকাল এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার সামান্যীকরণ করতে সক্ষম ছিল না। তার মন বস্তুসমূহ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা গঠন করার মতো যথেষ্ট বিকশিত ছিল না এবং বিশেষ বিশেষ ব্যাপার থেকে নিজেকে সে বিমূর্ত করতে পারে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা জানি যে 'ভালো' একটা বিমূর্তন, অর্থাৎ কোনো এক সাধারণ ধারণা, যা গঠিত হয়েছে বহু ভালো লোকের সঙ্গে, যাদের আমরা বিশেষ বিশেষ সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এক সহৃদয়, সদাশয় ধরনে আচরণ করতে দেখেছি তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের ফলে। এই ধারণাটির অনাবশ্যক দিকগুলি থেকে আমরা যেন নিজেদের বিমূর্ত করে নিচ্ছি, অথচ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করছি তার প্রধান, মূল দিকগুলির প্রতি। তাই, মন্দের মতো, ভালোও একটা

মূর্ত সত্তা বা বস্তু হিসেবে থাকে না। দুটিই নির্দিষ্ট কিছু কিছু লোকের ও তাদের কাজকর্মের কতকগুলি দিক, কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু প্রাচীনকালের লোকেরা বিমূর্তনগুলি গণ্য করত এমনভাবে, যেন সেগুলি মূর্ত বস্তুর রূপে বিদ্যমান; এই বিমূর্তনগুলির বহিঃপ্রকাশের মূর্ত রূপগুলি থেকে নিজেদের তারা বিমূর্ত করতে পারে নি। তাই, প্যান্ডোরার বাক্স সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রীক পুরাণে মন্দকে একটি মূর্ত বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। এপিমেথিউসের গৃহে এই বাক্সের মধ্যে ছিল মানুষের সমস্ত মন্দগুলি। তার স্ত্রী প্যান্ডোরা কৌতূহলবশে বাক্সটি খুলেছিল এবং মন্দগুলিকে ছাড়া পেতে দিয়েছিল। সেইভাবেই মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল মন্দ।

পৃথিবীর সমস্ত জাতিই তাদের বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এই বৈশিষ্ট্যের অংশীদার ছিল, সবাই সাধারণকে অবলোকন করেছিল এক মূর্ত, দৃশ্যমান ভাবমূর্তির মধ্য দিয়ে। তাই, আফ্রিকান জাতিগুলির অন্যতম আশান্তি জাতির এক রূপকথায় জ্ঞান সম্পর্কে সেই একই রকম 'বস্তুগত' ধারণা আমরা দেখতে পাই। আনানসি নামক মাকড়সা পৃথিবীব্যাপী ঘুরে বেরিয়ে জ্ঞানের কণা সংগ্রহ করত ও সেগুলিকে একটি পাত্রে ভরে রাখত। পাত্রটি যখন ভর্তি হয়ে গেল, আনানসি তখন একটি গাছের মধ্যে সেটিকে লুকিয়ে রাখতে প্রস্তুত হল; কিন্তু তার পুত্রের উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে সে পাত্রটিকে নিচে ছুঁড়ে ফেলল। পাত্রটি ভেঙে গিয়ে জ্ঞানের কণাগুলি ছড়িয়ে পড়ল গাছের তলার মাটিতে;

সেখানে যারা যথেষ্ট চটপটে ছিল তারা দানাগুলি তুলে নিল আর যারা চটপটে ছিল না তাদের ভাগ্যে জ্ঞান জুটল না, তারা থেকে গেল জ্ঞানহীন।

মানুষের চারপাশের বস্তু ও প্রক্রিয়াসমূহের গুণাবলী নির্ণীত করার মতো কোনো শব্দ মানুষের ভাষায় দীর্ঘকাল ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাচ্যের প্রাচীনতম ভাষাগুলির অন্যতম, সুমেরীয় ভাষায় 'হত্যা করা' ধারণাটির অন্য কোনো শব্দ ছিল না। কাউকে হত্যা করা হচ্ছে, এমন কারও সম্পর্কে কিছু বলতে চাইলে লোককে একটি শব্দ ব্যবহার করতে হত, যার অর্থ ছিল 'একটা লাঠি দিয়ে মাথার উপরে মারা'।

সামান্যীকরণ ঘটাবার সামর্থ্যের জন্য দরকার হয় আবশ্যকীয় ও আপতিকের মধ্যে, কারণ ও কার্যফলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান। এই সামর্থ্য তাৎক্ষণিকভাবেই দেখা দেয় নি। বস্তু বা ব্যাপারসমূহের মধ্যে এক বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে আদিম মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে সেগুলির মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র আছে। যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার ওরিনোকো উপত্যকায় বসবাসকারী এক ইন্ডিয়ান উপজাতি মনে করত যে একমাত্র নারীদেরই ফসল বোনার কাজে লিপ্ত হতে হবে: তাদের যুক্তিটা ছিল, নারীরাই জন্মদান করতে পারে, তাই জমি ভালো ফলন দেবে একমাত্র যদি মেয়েদের হাত দিয়েই বীজ বপন করা হয়। এমন কি আজও, দৃষ্টান্তস্বরূপ, উগান্ডায় লোকে মনে

করে যে বন্ধ্যা নারী তার স্বামীর ক্ষেত আর বাগানকে নিজের মতোই বন্ধ্যা করবে।

প্রাচীনকালে মানুষ প্রকৃতি থেকে নিজেকে পৃথক করে নি; সে মনে করত যে তার মতো সব সত্তা দিয়েই প্রকৃতি অধ্যুষিত — জল, অগ্নি, বায়ু, জমি প্রভৃতির আত্মা। প্রকৃতির এই ধরনের 'ব্যক্তি-রূপায়ণের' জের টিকে আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, উগান্ডার কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে। মানুষের চারপাশের জগৎ জুয়োক নামক বিদেহী আত্মাগুলিতে গিজগিজ করছে, এগুলিতে যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে এগুলি রীতিমত মূর্ত ও বাস্তব। মৃত্যু হলে মানুষ নিজেই এক জুয়োকে পরিণত হয়; সে তার উপজাতির প্রধানকে মদত দেয় এবং তার উপজাতির লোকদের সাহায্য করে অথবা শাস্তি দেয়।

এইভাবে, প্রকৃতির জগৎ আর মানুষের জগৎ, বস্তুনিচয়ের জগৎ আর আত্মাগুলির জগৎ, আদিম মানুষের চৈতন্যে পরস্পরবিজড়িত ছিল। প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে মানুষ দেখত জীবন্ত সত্তা হিসেবে; ঝড় শিলাবৃষ্টি বা খরা হলে সে সেগুলির উপরে ক্রুদ্ধ হত, এবং ভালো ফসলের জন্য জমিকে আর দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত বৃষ্টির জন্য আকাশকে ধন্যবাদ জানাত।

তাই আদিম মানুষের চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য ছিল বিমূর্ত ভাবধারণা তৈরির ও আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয়ের মধ্যে পার্থক্যনির্ণয়ের অপারগতা এবং বিচারবুদ্ধির উপরে ভাবাবেগের প্রাবল্য। আমাদের কালের মহত্তম চিন্তানায়ক ও কবি, **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** তাঁর একটি

কবিতায় ('অবুঝ মন' — সম্পাঃ) এই ধরনের মনের এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন:

বিরাট অবুঝ এই সে আদিম মন,
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপনারে তার অধীর অন্বেষণ।
ঘর হতে ধায় আগুন-পানে, আগুন হতে পথে,
পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিষ্যবিষম অরণ্যে পর্বতে;
এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কী আক্ষেপে
পায়ের তলায় ধরণীরে আঘাত করে ধূলায় আকাশ ব্যেপে;
হাঠৎ ক্ষেপে উঠে
রুদ্ধ পাষাণভিত্তি — 'পরে বেড়ায় মাথা কুটে।
অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপনগড়া
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওঠাপড়া।
হঠাৎ উঠে ঝেঁকে
যায় সে ছুটে কী রাঙা রঙ দেখে
অদৃশ্য কোন্ দূর দিগন্ত-পানে;
আবছায়া কোন্ সন্ধ্যা-আলোয় শিশুর মতো তাকায় অনুমানে,
তাহার ব্যাকুলতা
স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে রচে বিচিত্র রূপকথা।*

আদিম চৈতন্য এবং আধুনিক মানুষের চিন্তা ও ভাবাবেগের মধ্যে আমূল প্রভেদ সম্বন্ধে সচেতন কিছু কিছু চিন্তক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে মানুষের চৈতন্যের স্বাভাবিক বিকাশের ফলে, আপনা থেকেই দর্শনের উদ্ভব ঘটতে পারে নি। দর্শনকে তাঁরা গণ্য করতেন 'বাছাই করা' কতকগুলি জাতির উপরে,

---

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র রচনাবলী। খণ্ড ১৫, পৃঃ ২০৩-২০৪।

প্রধানত পশ্চিম ইউরোপের জাতিগুলির উপরে কোনো উচ্চতর, দৈব শক্তির প্রদত্ত এক সবিশেষ দান বলে। ১৯শ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ **হার্বার্ট স্পেনসারের** মতে, একজন নিগ্রো তার প্রকৃতিগতভাবেই বিমূর্ত চিন্তনে অক্ষম। সে চিন্তা করে শুধু মূর্ত রূপকল্পেই, এবং তার ভাবাবেগ তার বিচারবুদ্ধির উপরে প্রাধান্য করে। পরিশীলিত দার্শনিক ভাবধারণাও সে উপলব্ধি করতে পারে না।*

২০শ শতাব্দীতে, আরেকটি অভিমত বহুলপ্রচলিত হয়েছিল; এর প্রবক্তারা মনে করেন যে মানুষ জ্ঞানের অন্বেষণে প্রকৃতি ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে ঐক্য হারিয়েছে। একমাত্র প্রাচ্য জাতিগুলিই তাদের সবিশেষ, সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলির দরুন এই আদিম 'সংবদ্ধতা' বজায় রেখেছে। এক বিমূর্ত, যুক্তিসহ কায়দায় চিন্তা করার এবং দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করার অক্ষমতা অতএব মন্দ নয়, বরং ভাল। সেনিগালের কবি, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিক **লিওপোল্ড সেদার সেঙ্গোর** বলেছেন, 'কৃষ্ণাঙ্গরা পেয়েছে ভাবাবেগ আর গ্রীকরা বিচারবুদ্ধি।'** আফ্রিকান চিন্তন হল কল্পনাপ্রধান ও কাব্যিক। একটা

---

* অসাম্য ও সামাজিক নিপীড়নের যাথার্থ্য যে অভিমত প্রতিপাদন করা হয়, জীবনই তাকে বহুকাল আগে খন্ডন করেছে: সোভিয়েত ইউনিয়নে অধ্যয়নরত এশীয়, আফ্রিকান ও লাতিন আমেরিকান দেশগুলির বহু তরুণ-তরুণী সমস্ত বিষয়েই ভালো অগ্রগতি করছে, দর্শনও সে বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত।

** L. S. Senghor, *Negritude et humanisme*, Editions du Seuil, Paris, 1964, p. 24.

'আফ্রিকান ব্যক্তিত্ব' সংক্রান্ত মতবাদের সমর্থকরা যে সিদ্ধান্ত টানে তা এই বর্ণবাদী বক্তব্যেরই অনুরূপ যে, আফ্রিকানরা তাদের নিজস্ব বিজ্ঞান ও দর্শন সৃষ্টি করতে অক্ষম।

উপরের কথাগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে চলতি সমস্যাবলী থেকে আপাত-সুদূর দর্শনের পূর্বশর্তগুলির প্রশ্নটির সঙ্গে পর্যন্ত ভাবাদর্শগত সংগ্রাম জড়িত।

আদিম মানুষের মধ্যে সবিশেষ ধরনের চিন্তন, সবিশেষ ধরনের চৈতন্য কোথা থেকে এসেছিল তা দেখা যাক। আমাদের সম্ভবত এর কারণ খুঁজতে হবে তার ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্মের অবস্থার মধ্যে, অর্থাৎ তার শ্রম, দৈনন্দিন জীবন ও অন্যান্য লোকের সঙ্গে আদানপ্রদানের অবস্থার মধ্যে। ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল জাতিই এমন একটা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে, যেখানে শ্রমের আদিম হাতিয়ার ব্যবহৃত হত। খাদ্য যোগাড় করার জন্য মানুষকে অনেক ঘণ্টা ধরে ক্লান্তিকর কাজ করতে হত, সে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল প্রকৃতি আর তার 'খামখেয়ালের' উপরে। সুতরাং আদিম চিন্তনে অন্তর্লীন কাল্পনিকতা-জাত বিদেহী আত্মাগুলির একটা 'ব্যবহারিক' মূল্য ছিল: তাদের উপযোগী কিছু একটা করতে অনুরোধ করা যেত। সেই জন্যই আদিম মানুষ অরণ্য, প্রান্তর ও নদীগুলিকে অধিষ্ঠিত করেছিল গ্রীসে উপদেবী ও পরী, রাশিয়ায় মৎস্যনারী, সুশীলা পরী ও অরণ্য-অপদেবতা এবং আফ্রিকায় জুয়োকদের দিয়ে।

তাই, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সামনে মানুষের অসহায়তা ও তার জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাবই সৃষ্টি করেছিল 'আদিম চিন্তন'। একে যথাযথভাবে অক্ষত রেখে দেওয়ার চেষ্টা করা ও রক্ষা করার অর্থ সাধারণভাবে সংস্কৃতি ও প্রগতির বিকাশে হস্তক্ষেপ করা।

বিশৃঙ্খলা থেকে সুসমঞ্জসতা

মানুষের শ্রমমূলক ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে কাজের হাতিয়ারগুলি ক্রমে ক্রমে উন্নত হয়েছিল, সঞ্চিত হয়েছিল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। কুঠার, নিড়ানী ও বর্শাফলক হয়েছিল আরও হাল্কা, তীক্ষ্ন ও বেশি টেকসই, কেননা সেগুলি এখন তৈরি হয়েছিল ধাতু দিয়ে, পাথর দিয়ে নয়। মানুষ বহু রোগ আরোগ্য করতে শিখেছিল, লতাপাতার দরকারি গুণ জানতে পেরেছিল এবং পশুপাখি, পোকামাকড় আর গাছপালার আচরণ লক্ষ করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে সে আর পুরোপুরি অসহায় ছিল না, কেননা সে আগুন জ্বালাতে শিখেছিল, চাকা উদ্ভাবন করেছিল, বেশ কিছু বন্য পশুকে পোষ মানিয়েছিল এবং কৃষি-উদ্ভিদ চাষ করা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেছিল। পৃথিবী সম্বন্ধে তার ধ্যানধারণাও তদনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছিল।

তখনও পর্যন্ত মূর্ত রূপকল্পে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির

প্রতীকে চিন্তা করলে, মানুষ এখন পৃথিবী ও সমস্ত জীবন্ত জিনিসের আবির্ভাব কিছুটা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে একটা সুসমঞ্জস রূপকল্প-প্রণালী সৃষ্টি করেছিল। জীবন ও মৃত্যু, কর্তব্য ও সুখ, অপরাধ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সে চিন্তা করতে লাগল — অর্থাৎ সে সাধারণ প্রশ্নগুলি উপস্থিত করেছিল, যদিও সেগুলিকে রূপকল্পের আকৃতি দিয়ে তা করেছিল। পৃথিবীতে সে বস্তুনিচয়ের যে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা দেখেছিল তা বোঝার ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিল।

প্রাচীনকালের লোকদের ধ্যানধারণায় এই পরিবর্তন-গুলি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় গ্রীক পুরাণগুলিতে। প্রাচীন গ্রীক তার ইতিহাসের গোড়ার দিকে, প্রাচীনতম কালপর্বে পৃথিবীকে উপলব্ধি করত বিশৃঙ্খল, কোনোরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন একটা কিছু হিসেবে। কিন্তু গ্রীক সমাজ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণগুলিতে পৃথিবীর চিত্রে এক ধরনের প্রণালীতন্ত্র প্রকাশ পেল: বিশৃঙ্খলার বিপ্রতীপে দেখা গেল অলিম্পিক দেবগণকে, যারা সব ধরনের দানব, সাইক্লোপ ও দৈত্যদের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত। বিজয়ী হওয়ার পরে দেবগণ স্থাপন করেন শৃঙ্খলা, সুসমঞ্জসতা ও স্থিতিশীলতা। তাঁদের সংগ্রামে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন বীররা, অর্থাৎ অসামান্য শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মরমানবরা।

প্রাচীন গ্রীক দেবগণের এক সুসমঞ্জস সোপানবিন্যাস সৃষ্টি করেছিল, তাঁদের প্রত্যেকেই এক বিশেষ ধরনের মানবিক ক্রিয়ার ব্যক্তিরূপ: প্যান রক্ষা করতেন

পশুপালকে, **হার্মিস** দেখাশোনা করতেন বাণিজ্য, **দিমিতের** ছিলেন কৃষি ও উর্বরতার দেবী, **হেরা** ছিলেন বিবাহের দেবী, ইত্যাদি। দেবগণও আরও সদয় হয়ে উঠলেন, কেননা খোদ প্রকৃতিই মানুষের কাছে আর ভয়ঙ্কর কিছু ছিল না। এমনকি অতীতে যিনি ছিলেন দুর্ভাগ্যের অগ্রদূত, সেই **ফেমিদাও** এখন হয়ে উঠলেন নিয়ম-শৃঙ্খলার দেবী।

প্রকৃতিস্থিত বিশৃঙ্খলাকে এইভাবে 'আয়ত্ত' করা -- প্রথমে অধ্যাসমূলক ও শুধু মানুষের কল্পনায় বিদ্যমান -- সমস্ত জাতিরই বৈশিষ্ট্যসূচক। পৃথিবী সৃষ্টি সংক্রান্ত অতিকথাগুলিতে প্রতিফলিত হয় আদিম বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তর-কামেরুনের একটি জাতিসত্তা, ফালিদের কোনো কোনো অতিকথায় একটি কচ্ছপ আর একটি ব্যাঙের গল্প আছে, যারা শুষ্কজমি আর জল ভাগাভাগি করে নিয়েছিল পৃথিবীর অংশগুলি সৃষ্টি করার জন্য। পরে থো-দিনো প্রাণীদের মধ্যে পুরুষ ও মেয়েদের পৃথক করেছিলেন, বন্য পশুদের থেকে গৃহপালিত পশুদের আলাদা করে দিয়েছিলেন এবং সমস্ত শ্রমমূলক কর্তব্য পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন।

আজকের মেক্সিকোর ভূখণ্ডে যারা বসবাস করত সেই আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের কিংবদন্তীগুলিতে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম একই রকম কাল্পনিকভাবে বর্ণিত হয়েছে: পরম ঈশ্বরের পুত্রদের মধ্যে এক বিবাদের দরুন মহাবিশ্ব পর পর চারবার ধ্বংস হয় এবং

পঞ্চম প্রচেষ্টাতেই শুধু পৃথিবীতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।

আমরা দেখতে পাই যে নিয়মের ধারণাটা প্রাচীনকালের মানুষের মনে আকৃতি লাভ করেছিল একটা অতিকথার রূপে। ক্রমে ক্রমে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির অত্যন্ত সামান্যীকৃত রূপকল্প গঠিত হয়েছিল, যেগুলিকে বিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহের মধ্যে অঙ্গীভূত করা যেত না। আফ্রিকান জাতিগুলিও এই ধরনের সামান্যীকৃত রূপকল্প সৃষ্টি করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লাইবিরিয়ার জাতিগুলি তৈরি করেছিল নিওন্‌সভা-র ধারণা যা এমন এক সৃষ্টিশীল ক্ষমতা যার কোনো মূর্ত আকার নেই। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের পরম ঈশ্বর ওমেতেওত্‌লও একটা সামান্য ধারণা। চারটি প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যক্তিরূপ, তাঁর চার পুত্রের রূপকল্পও এতদূর সামান্যীকৃত হয়েছিল যে দার্শনিক নির্মিতির জন্য তা সহজেই ব্যবহার করা যেত।

যে সমস্ত প্রবাদ-প্রবচনে পৌরাণিক রূপকল্পগুলির সাহায্য না নিয়েই বহু ব্যাপার প্রায়শই ব্যাখ্যাত হয়, এবং যেগুলি এমন কি পৌরাণিক রূপকল্পগুলির বিরোধী, সেগুলিতে প্রতিফলিত হয় ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়ে ওঠা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। সেগুলির কোনো কোনোটিতে নির্দিষ্ট কতকগুলি ব্যাপারের মধ্যে নিমিত্তিগত সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আফ্রিকান বেচুয়ান উপজাতিদের প্রবাদে বলা হয়েছে: 'একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার সন্তান।' নেপালে লোকে

বলে: 'আমাদের এমন একটা লোক দেখাও যে অমর হয়েছে,' এইভাবে তারা উপস্থিত করে এমন একটি প্রশ্ন যাকে আমাদের আজকের দেখা দার্শনিক সমস্যাগুলির মধ্যে স্থান দেওয়া যেতে পারে। কোনো কোনো প্রবাদ-প্রবচনে সামাজিক অসাম্য প্রকাশ পায়। বুরুন্দি জাতিসত্তার এক প্রবাদে বলা হয়: 'আমি যখন রাজার একটা কুকুর দেখি, আমিই প্রথমে বলি নমস্কার।' অন্যান্য প্রবচনে সংঘক্রিয়াবাদের সুফল প্রকাশ করা হয়: 'একজন মানুষের মন একটা ফুটো থলির মতো।'

চিন্তনের পরিপক্কতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ ছিল মুক্ত-চিন্তকদের আত্মপ্রকাশ, যাঁরা অতিকথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাচীন মিশরে প্রায় চার হাজার বছর আগে লেখা 'বীণা-বাদকের গান'-এ পরলোকের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে:

শাসকরা সব পিরামিডে নিদ্রামগন
রাজপুরুষ আর পুরুতরা সব কবরে।
আছে শুধু তাদের মমিগুলি
কী হয়েছে তাদের নিজেদের?*

আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের পূর্বপুরুষরাও অতিকথাগুলির সুপ্রাচীন সারবত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করেছিল:

---

* ফারাও খুফু ও জাদুকরবৃন্দ। মস্কো, ১৯৫৮, পৃঃ ২২২-২২৪ (রুশ ভাষায়)।

তুমি, যে কিনা ঈশ্বর,
ওখানে বসে তুমি কী স্থির করো?
আমাদের জন্য এইখানে এই পৃথিবীতে,
তুমি কি দৈবাৎ আলস্যে আচ্ছন্ন?
তোমার মহিমা-গৌরব কি
আমাদের কাছ থেকে লুকিয়েই রাখবে?
কী তুমি নির্ধারণ করবে
এই পৃথিবীতে?*

এই সব কিছু থেকেই এ কথাটা জোর দিয়ে বলা যায় যে সকল জাতির মধ্যেই দার্শনিক চিন্তনের প্রাথমিক উপাদানগুলি আছে, এবং দর্শনের আত্মপ্রকাশের পূর্বশর্তগুলি আছে সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যে। মার্কস লিখেছিলেন: '...বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ চিন্তন সর্বদাই এক রকম হতে হবে, এবং তার তারতম্য হতে পারে শুধু ক্রমে ক্রমে, যে ইন্দ্রিয় দিয়ে চিন্তা করা হয় সেটির বিকাশ সমেত বিকাশের মাত্রা অনুযায়ী।'**

কিন্তু দর্শনের সমস্ত অংকুরই সুসমঞ্জস দার্শনিক মতবাদে বিকশিত হয় নি, তার কারণ কোনো কোনো জাতির 'চিন্তনের সবিশেষতা' নয়, বরং তাদের শ্রমমূলক ক্রিয়াকর্মের অবস্থা ও তাদের রাজনৈতিক জীবনের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। মুখ্যত সামাজিক-

* *Mythologies of the Ancient World,* Quadrangle Books, Inc., Chicago, 1961, p. 466.

** *Marx to Ludwig Kugelmann in Hanover, July 11, 1868,* Marx/Engels, Selected Correspondence, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 197.

অর্থনৈতিক অবস্থাই আড়াই সহস্রাব্দ আগে প্রাচীন ভারত, চীন ও গ্রীসে প্রথম দার্শনিক মতবাদগুলির প্রায় যুগপৎ আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। বহু বিজ্ঞানী বলেন যে আজতেকদের রাজ্যেও দর্শন বিকশিত হতে শুরু করেছিল, এবং ইউরোপীয়দের দ্বারা আমেরিকা জয়ের ফলেই সেই প্রক্রিয়া খর্বিত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসের যে দার্শনিক চিন্তা ইউরোপীয় দর্শনের পরবর্তী প্রগতির উৎস বলে সর্বজনস্বীকৃত, তার বিকাশের কারণগুলি কী?

'অত্যাশ্চর্য গ্রীক ব্যাপার'

কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মত এই যে অত্যন্ত বর্ণাঢ্য নিসর্গ ও অনুগ্র জলবায়ুর অস্বাভাবিক সুসমঞ্জস মিলনই গ্রীকবাসীদের নিবিষ্ট চিন্তায় অনুরাগী করে তুলেছিল।

'অত্যাশ্চর্য গ্রীক ব্যাপারের' আত্মপ্রকাশে প্রাকৃতিক বিষয়গুলি অবশ্যই নির্দিষ্ট একটা ভূমিকা পালন করেছিল, কিন্তু যেভাবে বলা হয় সেভাবে নয়।

গ্রীসে নিসর্গের বিপুল বৈচিত্র্য ও জলপথ ও খনিজ সম্পদের অস্তিত্ব উৎপাদনের তীব্র বৃদ্ধিকে সহজতর করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দকে — দর্শন যখন আকৃতি লাভ করতে শুরু করেছিল — বলা হয় লৌহযুগ (পূর্ববর্তী ব্রোঞ্জ যুগ থেকে যা পৃথক)। আকরিক লোহা ও তামা নিষ্কাশন করা শুরু হয় এবং ধাতু-গলনের নানান উপায় আবিষ্কৃত হয়। ফসল

বাড়ে, হস্তশিল্পের মান উন্নত হয়। মানুষ তার হাতকে ব্যবহার করেছিল যেন এক 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' সৃষ্টি করার কাজে — শহর, উষ্ণ গৃহ, স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক পোশাক, ও উর্বর ক্ষেত্রের এক জগত সৃষ্টির কাজে, যা অহল্যা প্রকৃতির কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ও সুরক্ষিত করেছিল। মানুষের কাছ থেকে দূরে অপসৃত হওয়ায়, প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে মানুষের চৈতন্যে তার মূর্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে এক **সামান্যীকৃত** রূপ ধারণ করেছিল।

ফলে, মনুষ্যজগতের বাইরে বিদ্যমান একটিমাত্র সমগ্র হিসেবে প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ চিন্তা করতে শুরু করেছিল। প্রকৃতির কাছ থেকে তার ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা তার মনেও তাকে পৃথক করা সম্ভব করে তুলেছিল। মানুষ আর নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করল না, চিন্তা করতে শুরু করল, কিসের জন্য সে তার একটি অংশ এবং তার থেকে তার প্রভেদ কিসে।

দার্শনিক চিন্তনের বিকাশের উপরে বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও মুদ্রা তৈরিরও বিরাট প্রভাব পড়েছিল। সমস্ত সামগ্রী সোনার বদলে বিনিময় হতে শুরু হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসবাসীরা বহুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন বস্তুর পিছনে একটিমাত্র সমগ্রকে দেখার এবং যে সমস্ত জিনিস বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় এক নতুন, সাধারণ গুণ অর্জন করে পণ্যসামগ্রী হয়ে ওঠে, সেগুলির বিভিন্ন গুণ থেকে নিজেদের বিমূর্ত করে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছিল।

ধাতব মুদ্রার আবির্ভাব গাণিতিক জ্ঞান এগিয়ে

নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। মানুষ যখন গণনাকার্যে নিযুক্ত থাকে, তখন বস্তুসমূহের বাহ্যিক চেহারা, সেগুলির রঙ, আয়তন ও উদ্দেশ্য থেকে নিজেকে বিমূর্ত করে নেয়: পরিমাণগত দিকটিতেই সে শুধু আগ্রহী থাকে। তাই যে কোনো অংকই একটি বিমূর্তন। গণিতশাস্ত্রের বিকাশের সঙ্গে যে বিমূর্তনগুলি দেখা দেয়, সেগুলি দিয়ে কাজ করার সামর্থ্য দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত, কেননা প্রতিটি দার্শনিক মূল প্রত্যয় এক একটি বিমূর্তন।

পাটীগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাগত জ্ঞান, দুইই সুবিকশিত ছিল প্রাচ্যে — মিশর, আসিরিয়া, বাবিলোনিয়া ও ফিনিসিয়ায় — কেননা জমির জরিপ চালানোর জন্য এবং সূর্যগ্রহণের সময় হিসাব করার জন্য নীল নদে জল কখন বাড়বে ও কমবে তা হিসাব করে দেখা দরকার ছিল। কিন্তু এই জ্ঞানকে পুরোহিতরা গোপন করে রাখত, তারা এমন কি এক বিশেষ গুপ্ত বর্ণমালাও উদ্ভাবন করেছিল, যাতে বিজ্ঞান শুধু তাদের জাতেরই একান্ত বিশেষাধিকার হয়ে থাকে।

গ্রীক মহাজ্ঞানীরা তাঁদের জ্ঞানের অনেকখানিই নিয়েছিলেন প্রাচ্যের কাছ থেকে। এটা কোনোক্রমেই আকস্মিক ঘটনা ছিল না যে গ্রীক দার্শনিকদের প্রথম দলটি — **থেলস, আনাক্সিমান্দের ও আনাক্সিমেনেস** — এসেছিলেন গ্রীসীয় পৃথিবীর সীমা এশিয়া মাইনরের তটে অবস্থিত ইওনিয়া থেকে। কিন্তু গ্রীসে জ্ঞানকে পুরোহিতদের একান্ত বিশেষাধিকার করে রাখা হয় নি, আর এই জাতটিও কড়াকড়িভাবে বিচ্ছিন্ন একটি

গোষ্ঠী ছিল না, যেমন ছিল প্রাচ্যে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে এখানে এমন এক 'ঈশ্বরের দান' বলেও গণ্য করা হত না, যা বিকশিত বা উন্নত করা চলে না। তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রটি ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হয়েছিল, এবং তার পদ্ধতিগুলি উন্নত করা হয়েছিল। আলাদা এক একটি ব্যাপারকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা থেকে গ্রীক চিন্তকরা এসেছিলেন বিদ্যমান সব কিছুর 'মূলকথা ও কারণগুলির' এক ব্যাখ্যার দিকে।

আমরা আস্থার সঙ্গে বলতে পারি যে একজন প্রাচীন গ্রীকের মন সত্তার সাধারণ সমস্যাবলীর মধ্যে ঢোকার জন্য সুপ্রস্তুত ছিল। তবুও, চিন্তায় নিযুক্ত হতে হলে অবসর সময় থাকা দরকার। অবসর সময় কীভাবে দেখা দিয়েছিল এবং কে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারত তা বোঝার জন্য এমন সব জিনিসের দিকে চোখ ফেরানো যাক যেগুলি মনে হয় 'বিশুদ্ধ চিন্তার' ক্ষেত্র থেকে বহুদূরবর্তী, যেমন উৎপাদন।

উৎপাদনে দ্রুত বৃদ্ধি ও সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি সমাজের এক বিশেষ অংশকে ক্ষেতে বা কর্মশালায় কাজ করা থেকে, কিংবা কায়িক প্রয়াস সংক্রান্ত অন্য কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব করে তুলেছিল। মস্তিষ্কের কাজকে কায়িক শ্রম থেকে পৃথক করা হয়েছিল। প্রাচীনরা মনে করত যে কিছু লোকের কাজ করাটা নিয়তি-নির্ধারিত, অন্যদের চিন্তা করা। স্বভাবতই, চিন্তা করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাদেরই ভাগ্যে যারা ছিল ক্রীতদাসের মালিক, চারণভূমি, দ্রাক্ষাকুঞ্জ প্রভৃতির মালিক, অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি। প্রথম গ্রীক

দার্শনিকরা সাধারণত এসেছিলেন ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে। **হেরাক্লিটাস, এম্পেডোক্লিস, ডেমোক্রিটাস, প্লেটো** ও অন্য কয়েকজন গ্রীক চিন্তক সবাই ছিলেন অভিজাত।

তাই দর্শনের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ একমাত্র সম্ভব ছিল এমন এক সমাজে যেখানে কিছু লোকের হাড়-ভাঙা দাসশ্রম অন্যদের সুযোগ দিয়েছিল অনুধ্যানে নিজেদের সময় কাটাতে, অর্থাৎ এমন এক সমাজে যা ছিল শ্রেণীবিভক্ত। বিজ্ঞান, দর্শন ও কলাশিল্প পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে হয়ে উঠেছিল বাছাই-করা সংখ্যালঘিষ্ঠের বিশেষাধিকার।

দর্শন হল একটি শ্রেণীভিত্তিক সমাজের উৎপাদ, যে সমাজে নিয়ত সংগ্রাম চলছে নিপীড়িত আর নিপীড়নকারীর মধ্যে, তথা শ্রেণীগুলির অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে, যেমন ভূস্বামী আর বণিকদের মধ্যে। এই সংগ্রাম প্রাচীন গ্রীসে জীবনের সমস্ত দিকের উপরে ছাপ ফেলেছিল, এবং দর্শনের বিকাশকেও প্রভাবিত করেছিল।

সক্রেটিসের প্রাণনাশ করা হয়েছিল কেন?

বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে বণিকদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। পুরুষানুক্রমিক ভূম্যধিকারী সম্ভ্রান্তবংশীয়দের উপরে তাদের জয়লাভের ফলে রাজারা অপসৃত হল এবং গ্রীক পলিসগুলিতে, বা নগর-রাষ্ট্রগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক শাসন।

গণতান্ত্রিক শাসনের অধীনেও ক্রীতদাসদের কোনো অধিকার দেওয়া হয় নি। দাস-মালিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে রাজনৈতিক সংগ্রামগুলি বেড়ে উঠেছিল। প্রজাতন্ত্রগুলির নাগরিকদের দেওয়া কিছু কিছু অধিকার তাদের সক্ষম করে তুলেছিল নিজেদের মত ও সন্দেহ প্রকাশ করতে, আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে। তর্কবিতর্ক থেকে জাগ্রত হয়েছিল চিন্তনের নিয়ম সম্পর্কে, যুক্তিবিদ্যা ও বাক্যালংকার সম্পর্কে আগ্রহ, যেগুলির বিষয়ে জ্ঞান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করত।

মার্কসের কথায়, 'দার্শনিক অনুসন্ধানের জন্য প্রথম প্রয়োজন হল সাহসী, মুক্ত মন।'* গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রীসে রাজনৈতিক জীবনের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিই ছিল দর্শনের বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত।

প্রতিটি ছোট নগর-রাষ্ট্রের ছিল নিজস্ব নিয়মকানুন, যেগুলির অবলম্বন ছিল অনেকাংশে দেবগণের কর্তৃত্ব, প্রথা পরম্পরা। দার্শনিকরা গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন এই সমস্ত বিষয়ে, যেমন — এই নিয়মকানুনগুলির ভিত্তি কী, ন্যায়বিচার-প্রেম, না নেহাৎ দেবগণের

---

* Karl Marx, *Notebooks on Epicurean Philosophy,* in: Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Vol. I, Progress Publishers, Moscow, 1976, pp. 469.

প্রতিহিংসার ভয়? মানুষ কী? ইত্যাদি। তাঁরা এমন এক নিয়মের জয়গান করলেন যা সকল মানুষের পক্ষে অভিন্ন, অকৃত্রিম মানবিক সদ্‌গুণগুলির সঙ্গে মানানসই হবে। সক্রেটিস বললেন যে মানুষ শুধু তার নিজের পলিসের একজন সদস্য নয়, সে সমগ্র মানব-সম্প্রদায়ের সদস্য, শুধু এথেন্স বা স্পার্টার একজন নাগরিক নয়, মহাবিশ্বেরও নাগরিক। মানবমনকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন আচার-প্রথার ঊর্ধ্বে ও দেবগণ সম্বন্ধে ভীতির ঊর্ধ্বে। প্রকৃতির মতো সমাজও কতকগুলি সাধারণ নিয়মশাসিত এবং মানুষকে মানুষ বলে বিবেচনা করা যায় একমাত্র তখনই, যদি সে পারিপার্শ্বিক বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিশ্বজনীন নিয়মগুলি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে, শুধু তার নিজের রাষ্ট্রে স্বীকৃত আচরণের নিয়ম নয়।

দেবগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে নয়, বরং বিচারবুদ্ধির যুক্তির ভিত্তিতে নিজের রাজনৈতিক মতপ্রত্যয়গুলি প্রতিপাদন করার যে চেষ্টা সক্রেটিস করেছিলেন, তার ফলে দাস-মালিকদের দিক থেকে তাঁর দর্শন সমালোচিত হয় এবং এক পাত্র হেমলক বিষ পান করতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা এমন কি সেই সুদূর কালেও বুঝতে পেরেছিল যে বিচারবুদ্ধি ও সমালোচনাত্মক চিন্তা তাদের বিরুদ্ধে উদ্যত এক শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

সক্রেটিসের মৃত্যু ছিল যুগপৎ বিশ্ব সম্বন্ধে এক নতুন মনোভাবের জন্মক্ষণ, নিয়তিতে অন্ধ বিশ্বাস আর দেবগণের প্রতিহিংসা-ভীতির পরিবর্তে বরং

জ্ঞানই ছিল সেই মনোভাবের ভিত্তি। রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও জীবনের আলোড়ন থেকে প্রথম নজরে বহুদূরস্থিত দর্শন তার জন্মলগ্ন থেকেই শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দ্বন্দ্বপূর্ণ সক্রেটিসের দুর্ভাগ্য এই যে সমাজে সাধারণ নিয়ম, সামাজিক জীবনের 'সর্বজনীনতা' প্রথমে যাঁরা বুঝেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও, দণ্ডিত হয়েছিলেন সেই সমাজেরই দ্বারা, যার ভিতরে ছিল এই মতবাদের উদ্ভবের পূর্বশর্ত। পৃথিবীর প্রতি এক নতুন মনোভাব জন্মগ্রহণ করছিল দ্বন্দ্বগুলির সংগ্রামের মধ্যে এবং বহু প্রতিবন্ধক কাটিয়ে তা নিজের পথ করে নিয়েছিল, যদিও গ্রীসে তার বিকাশের অবস্থা প্রাচ্যের তুলনায় অনেক বেশি অনুকূল ছিল।

যা বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করা যাক। দর্শনের বিকাশের পূর্বশর্তগুলি সন্ধান করতে হবে সর্বপ্রথমে প্রাচীন সমাজগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক জীবনের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে। দার্শনিক সমস্যাগুলি প্রথমে সূত্রায়িত হয়েছিল পুরাণ-অতিকথায়, কিন্তু অচিরেই তা এই কঠিন খোলস বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসেছিল। শ্রমমূলক ক্রিয়াকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সঞ্চয় প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের এটা দেখিয়েছিল যে ইন্দ্রজাল বা অতিপ্রাকৃত জিনিসগুলির শরণাপন্ন না হয়েই বহু ব্যাপার বোঝা যায়। নদীতে বন্যা আসার এবং বৃষ্টিপাত ও শিলাবৃষ্টির প্রাকৃতিক কারণ আছে: তাই মানুষ,

পৃথিবী ও সমগ্র মহাবিশ্বের আত্মপ্রকাশেরও ব্যাখ্যা করা যায় প্রাকৃতিক কারণ দিয়ে। পৃথিবীর উদ্ভবের পৌরাণিক ব্যাখ্যার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চিন্তন আরও সূক্ষ্ম হয়ে উঠছিল, এবং দর্শনের বুনিয়াদি তত্ত্বগুলি আকার লাভ করছিল।

সঞ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দার্শনিক চিন্তনের ক্রমবিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। দর্শন আবার তার দিক দিয়ে সাহায্য করেছিল পৃথিবী সম্পর্কে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত জ্ঞাতব্য তথ্যকে একটিমাত্র সমগ্রে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং বিজ্ঞানকে যুগিয়েছিল এক দৃঢ় তত্ত্বগত ভিত্তি।

বিজ্ঞানের ক্রোড়ভূমি

প্রাচীনকালের দার্শনিককে বহু প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে হত, এখন সেগুলি অধ্যয়ন করে বিজ্ঞানীদের গোটা একটা বাহিনী। প্রাচীন দার্শনিকরা সব কিছু নিয়েই নিজেদের ব্যাপৃত করতেন: তাঁরা পৃথিবীর উদ্ভব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন, তার রহস্যভেদ করা সম্ভব কি না সেই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করতেন, এবং একই সঙ্গে চেষ্টা করতেন রামধনু কীভাবে দেখা দেয়, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ কেন ঘটে, বিদ্যুৎ কী থেকে সৃষ্টি হয়, ইত্যাদি আবিষ্কার করতে।

পিথাগরাসের সঙ্গে একত্রে বৈজ্ঞানিক গণিতশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম গ্রীক দার্শনিক ও 'সপ্তজ্ঞানীর' অন্যতম থেলস একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীও ছিলেন এবং

সূর্যগ্রহণের পূর্বাভাস করতে পারতেন। তিনি বাণিজ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন, রাজনীতিতেও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। লোক-পরম্পরায় বলা হয় যে থেলসই বছরকে ৩৬৫ দিনে এবং মাসকে ৩০ দিনে ভাগ করেছিলেন।

আরেকজন গ্রীক দার্শনিক এম্পেডোক্লিস একাধারে ছিলেন কবি, চিকিৎসক, বাগ্মী, বিজ্ঞানী ও রাজনীতিক। তিনি তাঁর দার্শনিক অভিমত উপস্থিত করেছিলেন কোনো নিবন্ধ-গ্রন্থে নয়, 'প্রকৃতি প্রসঙ্গে' নামক একটি কবিতায়; তিনি সিসিলিতে বাক্যালঙ্কারের একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, একাধিক উদ্ভাবনের রচয়িতা ছিলেন এবং কিংবদন্তীতে বলা হয়, সিসিলীয় তটভূমিতে আগ্রিগেণ্টাস শহরে জলবায়ু পরিবর্তন করেছিলেন। ভালোবাসা ও শত্রুতার বলে গতিশীল পৃথিবীর চারটি উপাদান সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ ছাড়াও এম্পেডোক্লিস আরও অনেক, আরও বিশেষ সব প্রকল্প সূত্রায়িত করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি এই মত পোষণ করেছিলেন যে চন্দ্র গঠিত হয়েছিল বায়ু ঘনীভবনের ফলে; এবং আলোক একটা নির্দিষ্ট দ্রুতিতে বিকীর্ণ হয়, তাঁর এই অনুমান আজ ন্যায্যতই মনে করা হয় প্রতিভার অনুমান বলে। জীবন্ত জীবদেহগুলির উদ্ভব সম্বন্ধে তিনি এক দুঃসাহসিক প্রকল্প উপস্থিত করেছিলেন, জৈব ক্রমবিকাশের ভিত্তি হিসেবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সমস্যাটি সর্বপ্রথম উপস্থিত করেছিলেন, এবং মানবদেহের গঠনকাঠামো বিষয়ে বিরাট আগ্রহ

দেখিয়েছিলেন; বিশেষত, চোখের গঠনকাঠামো ও দৃষ্টিগত সংবেদনগুলির ব্যবস্থাপ্রণালীর এক সুসংগত তত্ত্ব প্রণয়ন করেছিলেন তিনি।

আরিস্ততল ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁর রচনাগুলিতে সমসাময়িক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমস্ত শাখার প্রতিফলন ঘটেছিল। তাঁর যে সমস্ত দার্শনিক রচনা বহু শতাব্দী ধরে পশ্চিমে তথা পূর্বে দর্শনের বিকাশকে প্রভাবিত করেছে, সেগুলি ছাড়াও তিনি নিবন্ধ-গ্রন্থাদি লিখেছিলেন নীতিবিদ্যার সমস্যা সম্পর্কে *(Nicomachean Ethics)*, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে *(Politics)*, শিল্পকলার তত্ত্ব ও বাগ্মিতা সম্পর্কে *(Poetics ও Rhetoric)* এবং চিন্তনের রূপসমূহ সংক্রান্ত বিজ্ঞান-নিয়মগত যুক্তিবিদ্যার এক বিশদ প্রণালীতন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর রচনাগুলি — *On the Heavens, On the Soul, Physics, Parts of Animals, Meteorologica* ইত্যাদি বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ।

অবশ্য, প্রাচীন দার্শনিকরা যে সব ধ্যানধারণা প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি কোনোমতেই সব সময়ে সঠিক ছিল না। পৃথিবীর এক সাধারণ চিত্র উপস্থিত করার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁরা বাস্তব কারণগুলির প্রতিকল্প হিসেবে এনেছিলেন কাল্পনিক সব কারণ, এবং কোনো প্রতিজ্ঞা প্রতিপাদন করার পরিবর্তে একটা সাদৃশ্য থেকে যুক্তি আহরণ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গ্রীক চিন্তক ডেমোক্রিটাস মনে করতেন

যে বায়ুতে দৃষ্ট ধূলিকণাগুলির বিশৃঙ্খল গতির উপমাটাই সমস্ত বিদ্যমান বস্তুর পারমাণবিক গঠনকাঠামো সম্বন্ধে তাঁর প্রকল্পটির যথেষ্ট ভালো প্রতিপাদন। ডেমোক্রিটাসের অনুগামী লুক্রেটিয়াস কারাস তাঁর দার্শনিক কবিতা 'বস্তুপ্রকৃতি'-তে তা এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

মানুষের দৃষ্টিক্ষেত্রে সর্বদাই এই ছবি ভাসে:
যতবার সূর্যালোক আমাদের গৃহগুলি করে উদ্ভাসিত
সূর্যের কিরণ দিয়ে আঁধারকে করে খান্-খান্,
আমাদের চারপাশে তার আলো উপচিয়ে পড়ে,
ততবারই দেখা যায় শূন্যে গতিষ্মান ক্ষুদ্রতম বহু বস্তুরাজি
উজ্জ্বল সূর্যালোকে অপরের প্রতি ধাবমান।
. . . .
এই চিত্র তুলে ধরে, প্রাথমিক বস্তুরাজি
চিরতরে অনন্ত গতিতে
কীভাবে বিরাজ করে সীমাহীন এই শূন্যতায়।*

বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী ও জনজীবনের বিশিষ্ট ব্যক্তি জন ডি. বার্নাল তাঁর *Science in History* গ্রন্থে লিখেছেন যে প্রাচীন গ্রীকরা দুর্ভাগ্যবশত মনে করতেন যে তাঁরা সমস্ত সমস্যা সমাধান করেছেন যথাযথভাবে যুক্তিসংগত, সঠিক ও আনন্দনীয়ভাবে। সমসাময়িক বিজ্ঞানের যে মৌল গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম

---

* লুক্রেটিয়াস কারাস। বস্তুপ্রকৃতি। মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমি প্রকাশনা, ১৯৪৫, পৃঃ ৭৯-৮০ (রুশ ভাষায়)।

প্রায় চারশো বছর আগে দেখা দিয়েছিল, তা হল তাঁদের সমাধানগুলির ভ্রান্তি আবিষ্কার করা। তিনি আরও বলেন, 'কিন্তু, গ্রীক বিজ্ঞানের অনুপস্থিতিতে, সমস্যাগুলি আদৌ উপস্থাপিত হত কি না, তা আমরা বলতে পারি না।'* মার্কসবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস বহু বছর আগে একই চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন: 'প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহের বিশ্বজনীন সম্পর্ক বিশেষ বিষয়গুলির বেলায় প্রমাণিত হয় নি; গ্রীকদের কাছে তা হল প্রত্যক্ষ ধ্যানের ফল।'** আর এটাই হল প্রাচীনদের দর্শনের একাধারে গুণ ও দোষ।

সুতরাং আমরা দেখছি যে মানবজাতির বিকাশের গোড়ার পর্যায়গুলিতে দর্শন ছিল 'বিজ্ঞানসমূহের বিজ্ঞান', এই কারণে নয় যে প্রাচীন দার্শনিকদের অন্তর্দৃষ্টি এক অনন্য গুণ ছিল, অথবা তাঁরা এমন এক গোপন রহস্য জানতেন, পরবর্তী প্রজন্মগুলি যা বিস্মৃত হয়েছে। বরংচ, তার কারণ ছিল এই ঘটনা যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল দুর্বলভাবে বিকশিত ও নিতান্ত প্রাথমিক। ক্রমে ক্রমে, মানুষের জ্ঞান প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, দেখা দিতে শুরু করেছিল আলাদা এক-একটি বিজ্ঞান, প্রথমে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান — গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ত্ব,

---

* J. D. Bernal, *Science in History,* Watts & Co., London, 1954, p. 117.

** Frederick Engels, *Dialectics of Nature,* Progress Publishers, Moscow, 1976, pp. 45-46.

জীববিদ্যা — তার পর সমাজ ও মানুষ সংক্রান্ত বিজ্ঞান, যেমন মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, প্রভৃতি।

১৯শ শতাব্দীতে, মহান জার্মান দার্শনিক **গিওর্গ ভিলহেল্‌ম ফ্রিডরিখ হেগেল** তাঁর 'প্রকৃতির দর্শন' সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন এই মত নিয়ে যে একমাত্র দর্শনই পৃথিবীর সমস্ত প্রহেলিকার সঠিক উত্তর যোগাতে পারে। তিনি তাঁর তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন এমন এক সময়ে যখন ভূতত্ত্ব, জৈব রসায়ন ও উদ্ভিদের শারীরবৃত্তের মতো বিজ্ঞানগুলির — পদার্থবিদ্যার কথা তো বলাই বাহুল্য — ভালো অগ্রগতি ঘটেছিল। সুতরাং, যখন তিনি আলোক সম্বন্ধে তাঁর নিজের 'তত্ত্ব' — যে তত্ত্ব অনুযায়ী আলোককে একটি ত্রিশির কাঁচের মধ্য দিয়ে চালিত করে একটা বর্ণালীতে ভাঙা যায় না — বিশদ করতে চেষ্টা করেছিলেন, অথবা স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক ধারণার বিরুদ্ধে রাসায়নিক মৌল পদার্থগুলির অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন বিজ্ঞানীরা তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন। বিজ্ঞানগুলির সর্বজনস্বীকৃত কৃতিত্বসমূহ 'বিলুপ্ত' করার জন্য হেগেলের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

কিন্তু আজ কোনো কোনো বিজ্ঞানী আরেক চরমপ্রান্তে গিয়ে বলেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের কোনো সম্পর্ক নেই। অতীতে যদিও দার্শনিকরা কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পূর্বানুমান করেছিলেন (যথা, পারমাণবিক তত্ত্ব, মহাকর্ষের নিয়ম, ও বিদ্যুৎশক্তির তত্ত্ব), তবুও এই

বিজ্ঞানীরা বলেন যে তাঁরা এখন 'কর্মহীন', কেননা মূর্ত, 'নিশ্চিত' জ্ঞান দার্শনিক অনুধ্যানকে প্রতিস্থাপিত করেছে। বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের এই অভিমতের সমর্থকরা 'দৃষ্টবাদী' নামে পরিচিত।

প্রথম নজরে তাঁরা ঠিক বলেই মনে হয়। বস্তুতই, দর্শন গাণিতিক সূত্রসমূহ প্রয়োগ করে না, দার্শনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান না বা বস্তুগত পদার্থ সৃষ্টি করেন না। তা হলে, তাঁর আর কী করার থাকে? যাকে বলা যেতে পারে 'মানবজাতির শৈশব', তার বিকাশের সেই আদি যুগের মতো আজ দর্শনের কাজ, তাঁদের মতে, সেই একই রয়ে গেছে — বিজ্ঞানের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই এমন মানুষকে তার আধুনিকতম কৃতিত্বগুলি অনুধাবন করতে সাহায্য করা। দৃষ্টবাদীদের মতে, দার্শনিকদের উচিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে জনপ্রিয় করা, জটিল বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলিকে এমন সরল ভাষায় উপস্থিত করা, যা প্রত্যেকের বোধগম্য হয়।

অবশ্য একটা ভিন্ন অভিমতও আছে। বাস্তব পৃথিবীর অবধারণা মূর্ত বিজ্ঞানগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে বলে, দর্শনের সামনে পড়ে আছে একটিমাত্র ক্ষেত্র — কল্পনা, ইউটোপিয়া, অতিকথার ক্ষেত্র। দার্শনিক একজন স্বপ্নদ্রষ্টা, যিনি তাঁর কল্পনাবলে যদ্দৃষ্ট পৃথিবীকে, অর্থাৎ বাস্তব পৃথিবীকে ধ্বংস করেন, এবং সৃষ্টি করেন আরেক পৃথিবী — যেমন পৃথিবী হওয়া উচিত। যেমন, **ফ্রিডরিখ নীট্শে** এই মত পোষণ করতেন যে এরূপ সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপ

ব্যতীত একজন ব্যক্তি বা একটি সমাজ, কেউই থাকতে পারে না। ‘কেন জানা উচিত? কেন নিজেকে প্রবঞ্চিত করা উচিত নয়?’ লিখেছেন তিনি। ‘মানুষ সর্বদাই আকাঙ্ক্ষা করেছে বিশ্বাসের, সত্যের নয়।’* তাই, দার্শনিক হয়ে ওঠেন অনেকটা কবি বা দিব্য-প্রেরণাপ্রাপ্ত উপদেষ্টার মতো, এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে সরে যান।

দর্শনের এই ধরনের ভাষ্যকে মার্কসবাদীরা বর্জন করে। আজ, মানুষের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যাগুলি রয়েছে, সেগুলি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ভিত্তিতে, গণিতশাস্ত্র ও জীববিদ্যার ভিত্তিতে সমাধান করা যায় না। তা হলে, দেখা যাক, দর্শনের বিষয়বস্তু কী।

যে বিজ্ঞান সর্বদাই নবীন

কখনও কখনও লোককে একথা বলতে শোনা যায় যে দর্শনকে একটা বিজ্ঞান বলে বিবেচনা করা যায় না, কেননা তার গোটা ইতিহাস জুড়ে তা একই প্রস্তু প্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা করেছে, পক্ষান্তরে প্রতিটি মূর্ত বিজ্ঞান, একটি সমস্যা সমাধান করার পর, কখনও তাতে

---

* Friedrich Nietzsche, *Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte. Ausgewählt und geordnet von Peter Gast,* Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1959, p. 317.

ফিরে যায় না বরং নতুন নতুন সমস্যা উপস্থিত করে ও বিশদ করে। কিন্তু দার্শনিক সমস্যাগুলিকে 'চিরন্তন' বলা হয় এই কারণে নয় যে সেগুলি সমাধান করা যায় না, বরং এই কারণে যে প্রতিটি যুগ সেগুলিকে উপস্থিত করে তার নিজস্ব ধরনে। সমাজে, জীবনের অবস্থায়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিমাণে, মানুষ প্রকৃতিকে যতখানি আয়ত্ত করেছে সেই মাত্রায়, এবং মানুষের নিজেরই মধ্যে পরিবর্তনগুলি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ ও তার চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবীর মধ্যেকার সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়।

পৃথিবীতে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটছে সেগুলির উৎস কী, বস্তু, ব্যাপার ও ঘটনাসমূহের বহুবিধতা ও বৈচিত্র্য কিসের জন্য ঘটে, সে বিষয়ে দার্শনিকরা সর্বদাই চিন্তা করেছেন। প্রাচীন আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা মনে করত যে মানুষ তার চারপাশে যা কিছু দেখে সে সবই পরম ঈশ্বরের চার পুত্রের সংগ্রামের ফল। প্রাচীন পারসিকরা পৃথিবীকে গণ্য করত অর্মাজ্‌দ (ধ্বংসের বিদেহী আত্মা) ও আরিমানের (সৃষ্টির বিদেহী আত্মা) মধ্যে সংগ্রামের এক পরিণতি ও চিরন্তন রণভূমি বলে, এবং এই মত পোষণ করত যে তাদের সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পৃথিবীতে অন্ধকার ও আলোকের শক্তিগুলি আধিপত্য করত। ভাষান্তরে, প্রাচীন মানুষের কাছে পৃথিবী ছিল চেহারায় মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্যবিশিষ্ট অতিপ্রাকৃত সত্তাগুলির মধ্যে সম্পর্কের ফল।

কিছুকাল পরে, মানুষ যখন মূর্ত অনুপুঙ্খগুলি

থেকে নিজেকে বিমূর্ত করে নিতে পেয়েছিল এবং সাধারণ কল্পিত ধারণায় চিন্তা করতে সক্ষম হয়েছিল, তখন পৃথিবীতে ঘটমান পরিবর্তনগুলির কারণের জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলির চেয়ে বরং খোদ প্রকৃতির মধ্যেই সন্ধান করতে শুরু করেছিল। তাই আমরা দেখি যে মানুষের পরিপক্ব চিন্তার, কল্পিত ধারণা গঠনের সামর্থ্যের একটা অভিঘাত পড়েছিল দার্শনিক সমস্যাবলী তুলে ধরার উপরে।

মূর্ত বিজ্ঞানগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, দার্শনিক ধ্যানধারণাও পরিবর্তিত হয়। তাই, দার্শনিকরা ও ব্রহ্মবিদ্যাবিদরা দীর্ঘকাল ধরে মনে করতেন যে পৃথিবীতে মানুষ আত্মপ্রকাশ করেছিল ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের ফলে, ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষ সে সবের চরম শিখর, এবং তাই যে পৃথিবীতে সে বাস করে সেই পৃথিবী হল মহাবিশ্বের কেন্দ্র। কিন্তু, পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী **নিকোলাস কোপারনিকাস**-কৃত আবিষ্কারের পরে, এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে পৃথিবী সৌরজগতের একটি কণা মাত্র; পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিল যে সৌরজগৎ নিজেই ছায়াপথ নামে পরিচিত নক্ষত্রপুঞ্জের অংশ মাত্র। কোপারনিকাসের তত্ত্ব পৃথিবীর ধর্মীয় চিত্র ভাঙতে সাহায্য করে; এই তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবী হল মহাবিশ্বের অচল কেন্দ্র, এবং মানুষ হল দেবতার মনোযোগের প্রধান বিষয়। কোপারনিকাসের দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটিয়ে **জর্ডানো ব্রুনো** মহাবিশ্বের অন্তহীনতার ধারণাটি প্রতিপাদন করেছেন। এই সমস্ত আবিষ্কার

মানুষের অনন্য চরিত্র ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে, তথা তার স্বর্গীয় উদ্ভব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিল।

কোনো কোনো দার্শনিক সমস্যা সমাজের বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়েই শুধু উদ্ভূত হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রগতিশীল সমাজবিকাশের ধারণা দেখা দিয়েছিল একমাত্র সেই কালপর্বেই যখন বুর্জোয়া সম্পর্ক গঠিত ও বিকশিত হয়েছিল, যখন উৎপাদনের সম্প্রসারণ অর্থনীতিতে একটা বড় প্রবণতা হয়ে উঠেছিল। তার আগে পর্যন্ত, সমাজে ঘটমান পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে সবচেয়ে নমুনাসই অভিমত ছিল চক্রবৎ চিরন্তন বিকাশের অভিমত। উল্লেখ করা দরকার যে প্রগতির ধারণাটি আজকের বুর্জোয়া সমাজের দর্শনে আবার ফ্যাশান-বহির্ভূত হয়ে গেছে, তার জায়গায় এসেছে চিরন্তন পুনরাবৃত্তির ধারণা। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে বুর্জোয়া সমাজ সমাজপ্রগতির মূলপথ থেকে আজ পথভ্রষ্ট হয়েছে, তা প্রতিফলিত হচ্ছে দার্শনিক ধ্যানধারণাতেও। বহু অসামান্য বুর্জোয়া চিন্তক, যেমন ফ্রিডরিখ নীট্‌শে, **অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার, আর্নল্ড টয়েনবি ও পিতিরিম সরোকিন** সমাজের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এ নৈরাশ্যবাদী অভিমত পোষণ করেন।

আমরা দেখেছি যে দার্শনিক সমস্যাগুলি তুলে ধরা ও সমাধান করার পদ্ধতি সমাজের বিকাশের স্তরের সঙ্গে এবং তার সমস্ত দিকের — অর্থনীতি, রাজনৈতিক সম্পর্ক, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশের স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দর্শন হল তার যুগের সারনির্যাস

ও সেই যুগের চৈতন্য, মানবজাতি তার বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তার সারাৎসার।

বিজ্ঞানী, না বিজ্ঞ ব্যক্তি?

আমরা যদি জীবন ও মৃত্যু, সুখ, ও জীবনে কোন পথ বেছে নেওয়া উচিত, এই সব প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে শুরু করি তা হলেই কি দার্শনিক হয়ে যাই? এটা যথেষ্ট গুরুগম্ভীর প্রশ্ন। বস্তুতপক্ষে, নিজের ভুল যে বুঝতে পারে এবং যার উপদেশ প্রয়োজন তাকে মূল্যবান উপদেশ দিতে পারে, তাকে আমরা বলি বিজ্ঞ ব্যক্তি বা জ্ঞানী, এই ধরনের বিজ্ঞতা মানুষের হয় শুধু বৃদ্ধ বয়সে। কিন্তু দর্শন হল জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা; তার মানে কি এই যে জীবনে ভুল পদক্ষেপ এড়িয়ে চলতে জানে এমন যে কোনো লোককেই দার্শনিক বলা যায়? মনে হয় না। অথচ, সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষ আর মানুষের পক্ষে মৌল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সমাধানে ব্যস্ত একজন দার্শনিকের মধ্যে কিছুটা মিল আছে। বহু সমসাময়িক বুর্জোয়া দার্শনিক দর্শনকে তার অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বঞ্চিত করে তাকে বিশেষ জ্ঞানের একটি শাখায় পরিণত করতে চেষ্টা করছেন; তাঁরা এই মত পোষণ করেন যে তত্ত্বগত, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞতা বেমানান। সমসাময়িক বুর্জোয়া চিন্তনের অসামান্য প্রতিনিধি **বারট্রান্ড রাসেল** যুক্তি দেন, 'বিজ্ঞতা বলে কিছু আছে কি, না এরূপ বলে যা মনে

হয় তা নিতান্তই মূর্খতার চূড়ান্ত পরিশীলিত রূপ?'*

তা হলে, সাংসারিক জ্ঞান আর দার্শনিক জ্ঞানের মধ্যে অভিন্ন কী, এবং কী তাদের পৃথক করে? প্রাচীন দার্শনিকরা জ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, **ইবন সিনা (আভিৎসেন্না)** লিখেছিলেন: 'আমাদের মনে, জ্ঞান হতে পারে দুই ধরনের। প্রথম, তা ত্রুটিহীন জ্ঞান।... দ্বিতীয়, তা ত্রুটিহীন ক্রিয়া।'** সুতরাং, জ্ঞানের বিশিষ্ট লক্ষণ হল জ্ঞান ও আচরণের ঐক্য, সেই ধরনের জ্ঞান যা মানুষকে জীবনে তার পথ বেছে নিতে সাহায্য করে, এবং সেই ধরনের জ্ঞান নয় যা বিমূর্ত ও মৌল মানবিক প্রয়োজন থেকে সুদূর।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন মানুষকে এক প্রবুদ্ধ জীবন ও ত্রুটিহীন আচরণের পথনির্দেশ যোগাতে চেষ্টিত হয়েছিল। আধুনিক ভারতীয় দার্শনিকরা সেই একই ধারায় লেখেন যে 'দার্শনিক জ্ঞানের লক্ষ্য শুধু বুদ্ধিবৃত্তিগত কৌতূহল চরিতার্থ করাই নয়, বরং প্রধানত দূরদৃষ্টি, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে পরিচালিত এক প্রবুদ্ধ জীবন।'***

---

* Bertrand Russel, *A History of Western Philosophy*, Simon and Schuster, New York, 1945, p. XIV.

** ইবন সিনা। দানিস-নামে। দুশানবে, ১৯৫৭, পৃঃ ১৯৩ (রুশ ভাষায়)।

*** Satishchandra Chatterjee and Dhirendramohan Datta, *An Introduction to Indian Philosophy*, University of Calcutta, 1950, p. 12.

এইভাবে আমরা দেখি যে জ্ঞান সব সময়েই একটা 'ব্যবহারিক' দর্শন এবং তা সব সময়েই মানুষের স্বার্থ, প্রয়োজন ও লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে, বোধ হয়, কোনো দার্শনিকই আপত্তি করবেন না। অথচ, কেউ কেউ যেখানে মনে করেন যে মৌল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সমাধানে জ্ঞান অপরিহার্য এবং প্রকৃত 'জ্ঞান রয়েছে শুধু সত্যের মধ্যেই' (গ্যেটে), সেখানে অন্যরা যুক্তি দেন যে মানুষের নিজস্ব ভাগ্যই যখন বিপন্ন তখন জ্ঞান ও বিজ্ঞান কোনো কাজে লাগে না। বরং তার ঠিক বিপরীত, জ্ঞান মাঝে মাঝে তার সঙ্গে নিয়ে আসে সন্দেহ, মোহভঙ্গ আর দুঃখ। Ecclesiastes গ্রন্থের মতে, 'যে জ্ঞান বাড়ায় সে দুঃখকেও বাড়ায়।'* আধুনিক বুর্জোয়া দর্শনে অত্যন্ত জনপ্রিয় এক ধারার অনুগামী, প্রয়োগবাদীরা বলেন, ভাবাবেগগত স্বাচ্ছন্দ্য আর মানসিক শান্তি উপভোগ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত অবস্থান থেকে সত্যকার একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি সন্দেহে, অনুধ্যানে বা সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হবেন না। যে কোনো ধরনের কুসংস্কার আর ভ্রান্ত তথ্য আমাদের মনকে ভরে ফেলুক না কেন — সেগুলিকে থাকতে দিন; একমাত্র আসল জিনিসটা হল সেগুলি সত্যি বলে বিশ্বাস করা।

এই ধরনের 'বিজ্ঞ ব্যক্তির' অবস্থান মনে পড়িয়ে দেয় উটপাখির কথা, যে বিপদের প্রথম ইঙ্গিতেই বালির

---

* *The Oxford Dictionary of Quotations*, London, Oxford University Press, 1956, p. 50.

মধ্যে তার মাথা লুকোয়। কিন্তু যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, যখন মানবজাতি থাকবে কি থাকবে না, পারমাণবিক মহাপ্রলয়ে তা নিশ্চিহ্ন হবে, না তার শান্তিপূর্ণ জীবনের অধিকার রক্ষা করতে সক্ষম হবে, সেই প্রশ্নের ফয়সালা হচ্ছে — আমাদের এই পৃথিবীতে সত্যকার বিজ্ঞতা রয়েছে সারা পৃথিবীব্যাপী শান্তির জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখতে প্রত্যেক মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে, এই কথা বোঝার সামর্থ্যের মধ্যে যে মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ, তার ভাগ্য ও সুখ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করছে মানবজাতির প্রগতিশীল অংশের ও বিশেষত প্রতিটি ব্যক্তির চালানো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সংগ্রামের ফলাফলের উপরে।

আমরা আস্থার সঙ্গে জোর দিয়ে বলতে পারি যে, বাস্তব পৃথিবী ও তার সহজাত দ্বন্দ্বগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানের সঙ্গে যে 'বিজ্ঞতার' বিরোধ আছে, সেই বিজ্ঞতাই অহরহ ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে অমানুষিক কার্যকলাপের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য। এই ধরনের যে 'বিজ্ঞতা' সমাজের বিকাশের প্রধান প্রগতিশীল ধারাগুলির পরিপন্থী, তাকে স্বয়ং জীবনই, এবং বিশেষত আমাদের যুগই খন্ডন করে।

ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে, দর্শন এমন সমস্ত প্রশ্নও আলোচনা করে যেগুলি মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দর্শন তথাকথিত সাংসারিক জ্ঞান থেকে পৃথক। তত্ত্বগত জ্ঞানের একটি রূপ হিসেবে তা তার মতগুলি প্রমাণ

করতে চায় এবং সে সবগুলিকে উপস্থিত করে সুসংগত ধরনে; তার নীতিসমূহ ও প্রধান ধারণাগুলি হল মানুষের জীবন ও ক্রিয়াকলাপের বিচিত্রতম ক্ষেত্রগুলি সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক তথ্যের সামান্যীকরণ ও বিশ্লেষণের ফল; তা নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক উপাত্তগুলির উপরে।

জীবনের সুনির্দিষ্ট অবস্থা নিয়ে, মানুষের সমস্ত অনন্য বৈচিত্র্যসম্পন্ন সম্পর্ক নিয়ে, তার জীবনের পথ নিয়ে দর্শন বিবেচনা করে না; তার জীবন কাহিনীতেও তা আগ্রহী নয়। প্রতিটি মানুষ যেন দুটি ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত: একটি একক 'ক্ষুদ্র অহং', যার মধ্যে তার ভাগ্য জীবনের পরিস্থিতির অনন্য প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়, এবং একটি 'বৃহৎ অহং', যা তাকে তার জাতির ও সামগ্রিকভাবে মানবজাতির অংশ করে তোলে। মানুষের 'বৃহৎ অহং'-এর যে সমস্ত সমস্যা আছে, দর্শন সেগুলি নিয়েই, অর্থাৎ, মানব অস্তিত্বের সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়েই ভাবিত।

দর্শন কী? — এই প্রশ্নের একটা যথাযথ উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থায় এখন এসেছি আমরা। তা হল এক **বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি**। তা হল পৃথিবী সম্বন্ধে — প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে, ও তার মধ্যে মানুষের স্থান সম্বন্ধে — এক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাকে উপলব্ধি ও রূপান্তরিত করার সম্ভাবনার এক বিশ্লেষণ। কিন্তু তা অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে সক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তার একটা প্রত্যয়, একটা বিশ্বাসও বটে। তা হল জ্ঞান ও মূল্যায়নের, জ্ঞান ও প্রত্যয়ের, ভাবাবেগগত ও

যুক্তিসহের এক মিশ্রণ। তাই, দর্শন এক বিশেষ রূপের তত্ত্বগত জ্ঞান, তার সঙ্গে জড়িত শুধু সমগ্র মানবিক অভিজ্ঞতার এক বিষয়গত সামান্যীকরণই নয়, বরং সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে সেই সমস্ত মুহূর্তগুলির শনাক্তকরণ, যেগুলি মানুষের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যবহ।

বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত সাধারণতম প্রশ্নগুলির মীমাংসাকারী তত্ত্বগত জ্ঞানের একটি রূপ হিসেবে দর্শনের মার্কসীয় সংজ্ঞার্থ দর্শনের কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে সমস্ত পূর্ববর্তী ধ্যানধারণা থেকে, তথা তার আধুনিক বুর্জোয়া ভাষ্যগুলি থেকে সারগতভাবে পৃথক।

অতীতে, দর্শন 'অনন্তকালের দৃষ্টিকোণ থেকে' প্রকৃতি ও সমাজের অস্তিত্বের বহু সমস্যা সমাধান করেছে এবং চিরতরে উভয়ের নিয়মগুলি স্থির করে দিয়েছে বলে দাবি করা হত। আজকাল, কিছু কিছু দার্শনিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ সমস্যাগুলির প্রতিকল্প হিসেবে স্থাপন করতে চান পৃথিবী সম্বন্ধে এক সবিশেষ মনোভাব, যা বিশুদ্ধ একক মানব অস্তিত্ব, ক্ষুদ্র মানবিক 'অহং'-এর দৃষ্টিকোণ থেকে, মামুলি মানবিক সুখদুঃখ, ভয় আর উদ্বেগের দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া। এই ধরনের অবস্থান, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অস্তিত্ববাদীদের বিশিষ্ট লক্ষণসূচক।

এইভাবে, কেউ কেউ যেখানে দর্শনকে পর্যবসিত করেন বিশ্বের নিয়ামক নিয়মগুলি অধ্যয়নে, যেন ভুলে যান যে মানুষ সেই বিশ্বের শুধু একটা কণাই নয় বরং তার রূপান্তরসাধকও, সেখানে অন্যরা তাকে পরিণত করে আলাদা আলাদা ভাবাবেগে, তাঁরা এই ঘটনাটা

উপেক্ষা করেন যে মানুষের সমস্ত ভাবাবেগই পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের মিথষ্ক্রিয়ার ফল, শূন্য থেকে সেগুলি উদ্ভূত হয় না। দর্শনের ‘এলাকার’ সত্যকার সীমানা নির্ধারিত হয় মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া দিয়ে। **দর্শন সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্ব, মানুষ ও মনুষ্যজাতির নিয়ামক সাধারণতম নিয়মগুলি অধ্যয়ন করে; মানুষ ও সমাজের, মানুষ ও প্রকৃতির ঐক্যের বনিয়াদগুলি তা অধ্যয়ন করে।**

চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের যোগসূত্রগুলি অত্যন্ত বহুবিধ। এই অজস্র যোগসূত্র ও সম্পর্কের মধ্যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক জগতের ঐক্যের অন্তর্নিহিত মূল জিনিসটিকে শনাক্ত করা কি সম্ভব? পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রশ্নটিই আলোচনা করা হবে।

২। দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্ন

কী দিয়ে আমরা শুরু করব?

যে কোনো বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির মূলে কী আছে? যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করে তার প্রতি নিজের মনোভাব ও নিজের আচরণ ধারা নির্ধারণ করতে হলে সর্বপ্রথমে কী খুঁজে পেতে হবে?

জার্মান দার্শনিক **ইমানুয়েল কাণ্ট** মনে করতেন যে একজন দার্শনিককে অবশ্যই উত্তর যোগাতে হবে তিনটি প্রশ্নের: 'আমি কী জানতে পারি?' 'কী আমাকে অবশ্যই করতে হবে?' এবং 'আমি কিসের আশা করতে পারি?'* দেখা যাক, এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে আরও সাধারণ একটি প্রশ্ন লুকানো আছে কি না। বস্তুতই, মানুষ অনেক কিছু শেখে, আশা করে এবং নিজের সামনে লক্ষ্য নির্ধারণ করে শুধু এই কারণেই

---

* Immanuel Kant, *Kritik der reinen Vernunft,* Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, 1917, p. 818.

যে তার আছে একটি মন, চৈতন্য ও ইচ্ছাশক্তি, এবং তার চারপাশে যা কিছু ঘটে সেগুলিকে অনুভব করার ও ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা। মানুষ শুধু মাংসপেশী আর স্নায়ু নয়, শুধু একটা শরীর নয়; তার আছে, প্রাচীনদের কথায়, একটি 'আত্মা'। সমস্ত বিশেষ প্রশ্নের উত্তরগুলি পুরোপুরি নির্ভর করে প্রধান প্রশ্নটির উত্তর কীভাবে দেওয়া হয় তার উপরে: 'আত্মা' কী, ভাবগত চৈতন্য কী, তা কোথা থেকে আসে, এবং জড় প্রকৃতির সঙ্গে তা কীভাবে সম্পর্কিত?'

তাই, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নটি হল মন ও প্রকৃতির, চৈতন্য ও সত্তার আন্তঃসম্পর্কের প্রশ্ন। প্রথমে মন আবির্ভূত হয় না প্রকৃতি আবির্ভূত হয়, মানুষের মস্তিষ্কের বাইরে আপনা থেকে চৈতন্য থাকতে পারে কি না, এবং আত্মিক মূলনীতি ছাড়া প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করতে ও থাকতে পারে কি না — এই সব বিষয় স্থির করার পরেই শুধু আমরা মানুষ ও তার চারপাশের পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারি।

কাণ্ট যে প্রশ্নগুলিকে দর্শনের পক্ষে বুনিয়াদি বলে মনে করতেন, তার একটি বিচার করা যাক: 'কী আমাকে অবশ্যই করতে হবে?' ভাষান্তরে, কোন কোন নিয়ম ও আচরণের নীতি দিয়ে মানুষ জীবনে পরিচালিত হবে, নিজেকে সে কিসের দিকে অভিমুখী করবে এবং কাকে সে কর্তব্য বলে দেখবে? এ হল মানুষের সুনীতির প্রশ্ন। **কীভাবে** আচরণ করতে হবে, তা বুঝতে হলে প্রথমেই জানা উচিত সুনীতি, বা নীতিশাস্ত্র কী। মানুষ কেন নিজের সম্মান ও মর্যাদা

রক্ষা করে? কেন সে তার বিবেকের নির্দেশ মানে, কেন সে তার কর্তব্য করে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হলে, কর্তব্য, ন্যায়বিচার, সদ্‌গুণ ও সম্মানবোধ কীভাবে ও কেন মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে আমরা বাধ্য। এই সমস্ত বোধ কি আমাদের বাসনা, চৈতন্য ও ইচ্ছাশক্তি নির্বিশেষে আমরা যে অবস্থার মধ্যে বাস করি তার দরুনই বিকশিত হয়েছিল, না কি সেগুলি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত এক যুক্তিসংগত, সুবিবেকী চুক্তির ফল? কিংবা, হয়তো বা, নীতিশাস্ত্র কোনো দেবতার সঙ্গে মানুষের সংস্পর্শের একটা ফল?

আমরা স্পষ্টতই ফিরে এসেছি আত্মিক ও প্রাকৃতিকের মধ্যে, চৈতন্য ও সত্তার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটিতে। তাই এই প্রশ্নটাই দর্শনে সবচেয়ে সাধারণ প্রশ্ন, এবং এর সমাধান না করে অধিকতর সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলি সমাধান করা যায় না।

অবশ্য, একথা বলাটা ন্যায়সংগত হবে না যে দার্শনিকরা সর্বদা এই বুনিয়াদি প্রশ্নটির মীমাংসা করার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করেছেন। অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ধারা, মত ও ধারণাগুলি আমরা যদি পরীক্ষা করি তা হলে দেখতে পাব যে কোনো কোনো দার্শনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করেন, অন্যরা মনুষ্যমুক্তির সমস্যায় আগ্রহী, অন্যরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টায় তাঁদের জীবন কাটিয়েছেন, এবং অন্যরা মানুষের মধ্যে একজন নাগরিককে শিক্ষিত করার বিষয়ে ভাবিত, কেউ বা শিল্পকলার দিকে তাঁদের

চিন্তা চালিত করে চলেছেন, যা, তাঁদের মতে, অনুধ্যানের উপযুক্ত একমাত্র বিষয়। অথচ, বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করলেও এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও সমস্ত দার্শনিকই সেই এক সমস্যায় ফিরে আসেন — **মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যে, আত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক**। মানুষ কি পৃথিবীকে অবধারণা করতে পারে? তার অনুভূতি, চিন্তা ও প্রয়োজনকে বাস্তব কীভাবে প্রভাবিত করে? সে কি পৃথিবী পরিবর্তন করতে সক্ষম, শিল্পকলা একজন শিল্পীর নিজেকে প্রকাশ করার উপায় মাত্র, না কি তা পৃথিবীর এক প্রতিফলন? — এই সমস্ত প্রশ্নই একটি সাধারণ বিষয়ের বিশেষ বিশেষ দিক।

চৈতন্য ও সত্তার মধ্যে, আত্মিক ও বস্তুগতের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটিকে দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্ন বলে দার্শনিকরা প্রথমেই স্বীকার করেন নি। মধ্যযুগীয় দার্শনিক মতবাদ তত্ত্বগত জ্ঞান ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যেকার সম্পর্ককে বুনিয়াদি প্রশ্ন বলে গণ্য করত। **ফ্র্যান্সিস বেকন** মনে করতেন যে দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্ন হল প্রকৃতির উপরে মানুষের আধিপত্য প্রসারিত করার (বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে) প্রশ্ন। **ক্লদ হেলভেশিয়াস** মনে করতেন তা রয়েছে মানুষের সুখের সারনির্যাস অধ্যয়ন করার মধ্যে, এবং **জাঁ জাক রুসো** — মানুষের মধ্যে অসাম্য কীভাবে দূর করা যায় তা আবিষ্কার করার মধ্যে।

লেনিন বলেছেন যে আত্মা না বহির্জগৎ কাকে মুখ্য বলে বিবেচনা করা উচিত সেই প্রশ্নের উত্তরই

দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিকাশকে নির্ধারণ করেছিল, কথায় নয় প্রকৃত ঘটনায়। 'এই ক্ষেত্রটিতে বিদ্যমান হাজার হাজার ভুল ও বিভ্রান্তির উৎস হল এই ঘটনা যে পরিভাষা, সংজ্ঞার্থ, পান্ডিত কৌশল ও মৌখিক চাতুরির আবরণের তলায়, এই দুটি বুনিয়াদি ধারা অলক্ষিত থাকে।'*

একমাত্র বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের পরেই দর্শনের বিকাশের পর্যায়গুলির, তার মূল সমস্যাগুলির ও প্রধান ধারাগুলির সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। 'সমস্ত বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক অগ্রগতি বহুবিধ পরস্পরবিরোধী ও আঁকাবাঁকা পথের মধ্য দিয়ে গিয়ে পেঁছয় প্রকৃত প্রস্থান-বিন্দুটিতে। অন্য স্থপতিদের সঙ্গে বিজ্ঞানের অমিল এইখানে যে বিজ্ঞান শুধু-যে হাওয়ায় অট্টালিকা নির্মাণ করে তাই নয়, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার আগেই ইমারতের পৃথক পৃথক বাসযোগ্য তলা গেঁথে তুলতে পারে।'** **মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারাই, বিশেষত ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নটি প্রতিপাদন করেছিলেন এবং দার্শনিক তত্ত্বসমূহ গঠনে তার ভূমিকা প্রকাশ করেছিলেন।** এঙ্গেলস তাঁর 'লুড়ভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' রচনায় লিখেছিলেন: 'সমস্ত

---

* V. I. Lenin, *Materialism and Empirio-Criticism*, Collected Works, Vol. 14, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 336.

** কার্ল মার্কস। অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৩, পৃঃ ৫৫।

দর্শনের, বিশেষত সাম্প্রতিক দর্শনের, বিরাট বনিয়াদি প্রশ্নটি হল চিন্তন ও সত্তার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্ন।'*

দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নটিতেই দার্শনিক সমস্যাগুলির সমগ্র সম্পদ কোনোমতেই নিঃশেষ হয়ে যায় না, কিংবা মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যেকার সম্পর্কের, সত্তা ও চিন্তনের সমস্ত বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় না। আসল বিষয়টা হল, **জটিল 'সত্তা-চিন্তন' সম্পর্কের মধ্যে কোনটা মুখ্য, কোনটা নির্ধারক।** এই বিষয়টির নিষ্পত্তি না করে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। ফলত, **যে কোনো দার্শনিক সমীক্ষাই শুরু হয়** দর্শনের বুনিয়াদি বিষয়টির নিষ্পত্তি দিয়ে।

এটা অবশ্য সত্য শুধু দার্শনিক গবেষণার ক্ষেত্রেই নয়। বস্তুতপক্ষে, একটি জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান করতে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার করে মহাবিশ্বের আরও একটি প্রহেলিকা নিরসন করতে যিনি ব্রতী হন, এমন প্রত্যেক বিজ্ঞানীই রীতিমত নিশ্চিত যে আলোচ্য নক্ষত্রটি শুধু তাঁর কল্পনার খামখেয়াল নয়, তা রয়েছে বাস্তবে, তার চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে, অর্থাৎ, **বিষয়গতভাবে।** তিনি যদি এর বিপরীতটা বিশ্বাস করতেন, তা হলে গ্রহ-

---

* Frederick Engels, *Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy,* in: Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works in three volumes, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, 1973, p. 345.

নক্ষত্রগুলির অবস্থান অধ্যয়নে নিজেকে সাহায্য করার জন্য পরিশীলিত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করার ঝামেলার মধ্যে যেতেন না, শুধু তাঁর কল্পনাশক্তির উপরেই নির্ভর করতেন।

তাই, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নটির মীমাংসা যে কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এক গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। যদিও মনে রাখা দরকার যে, বাহ্যিক দুনিয়ার বিষয়মুখতা ও অধ্যয়নের সামর্থ্যে 'স্বতঃস্ফূর্ত-বস্তুবাদী' বিশ্বাসকে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই দার্শনিক মততন্ত্রে রূপান্তরিত করে না। এমন বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিকে বলা হয় **প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক বস্তুবাদ**।

একজন শিল্পী যখন ক্যানভাসের উপরে প্রকৃত মানুষের জীবন থেকে একটি দৃশ্য আঁকেন, অথবা রেখা ও রঙের এক জটিল জাল আঁকেন তখন তিনিও নিজের জন্য দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নটির মীমাংসা করেন। প্রথম ক্ষেত্রে, বাস্তব জগতকে তিনি দেখেন তাঁর নিজের শিল্পকলার এবং সাধারণভাবে সব ধরনের মানবিক সৃষ্টিশীলতার উৎস হিসেবে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তিনি তাঁর অন্তর্জীবনকে, তাঁর মেজাজ ও ভাবাবেগকে — বাস্তব বস্তুনিচয়ের জগতের সঙ্গে যেগুলি কোনোমতেই সম্পর্কিত নয় — গণ্য করেন চিত্রিত করার উপযুক্ত বলে।

একজন রাজনীতিক বা রাষ্ট্রনীতিকের কাজেও বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শুধু মানব চৈতন্যকে প্রভাবিত করে, মানুষকে আলোকদান

ও শিক্ষাদান করে সমাজকে কি বদলানো যায়, না কি যে অবস্থায় সে বাস করে তাও রূপান্তরিত করা দরকার? 'নীতিশাস্ত্রসম্মত সমাজতন্ত্র', বা 'মানবিক সমাজতন্ত্রের' মতবাদের সমর্থকরা এই মত পোষণ করেন যে সমাজকে ঢেলে সাজানোর যাত্রাবিন্দুটা রয়েছে মানবচৈতন্য পরিবর্তনের মধ্যে, মানুষের উন্নয়ন ও আত্মোন্নয়নের মধ্যে। এর প্রতিতুলনায়, সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের তত্ত্বগত ভিত্তি বলে, মার্কসবাদ মানুষ যে অবস্থায় বাস করে তা পরিবর্তন করাকেই তার চিন্তার ধরনের রূপান্তরসাধনের একমাত্র দৃঢ় ভিত্তি বলে গণ্য করে।

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে ভাবাদর্শগত ধারাগুলি অধ্যয়ন করার সময়ে দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের এক সমাধান লাভের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চরম বামপন্থার তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে বিপ্লবের অগ্নিশিখা যে কোনো জায়গাতেই লেলিহান হয়ে উঠতে পারে, তাতে শুধু একটু ইন্ধন যোগানো দরকার। এই মতবাদের সমর্থকরা অগ্রসর হয় এই অনুমিতি থেকে যে মানুষের চৈতন্য, তার ইচ্ছা ও ক্রিয়াকলাপ পৃথিবীতে ঘটমান সমস্ত সামাজিক পরিবর্তনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। যেমন, হার্বার্ট মার্কুজে নির্দিষ্ট কিছু ঐতিহাসিক বিপ্লবী শক্তির সন্ধান করাকে বৃথা বলে মনে করেন। তিনি বলেন, এই শক্তিগুলি বিপ্লব চলাকালেই শুধু আত্মপ্রকাশ করতে পারে, আর

বৈপ্লবিক রূপান্তরের আসল উৎস ও ভিত্তি হল মানুষের কল্পনা।

বিপরীতপক্ষে, মার্কসবাদীরা সমেত, প্রকৃত বিপ্লবীরা জোর দিয়ে বলেন যে একটা বিপ্লব সফল হতে পারে, একমাত্র যদি বিষয়গত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পূর্বশর্তগুলি থাকে, তার মানে এই যে বিপ্লব 'রপ্তানি' করা যায় না। এবং, একটা বিপ্লবে চৈতন্যের, ইচ্ছাশক্তির পালিত ভূমিকা বিরাট হলেও, কোনো বাস্তব অর্থনৈতিক বুনিয়াদ না থাকলে যে কোনো বৈপ্লবিক কর্ম-তৎপরতাই নিছক হঠকারিতায় পর্যবসিত হতে পারে।

অতএব আমরা দেখি যে দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নটি প্রত্যেকের পক্ষেই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সমস্ত মৌল সমস্যার সমাধানের উপরে তার ছাপ পড়ে। এটা বিস্ময়কর নয়, কেননা মানুষ যখন প্রকৃতি, সমাজ ও নিজেকে বোঝার কাজে, পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে আয়ত্ত করার কাজে নিযুক্ত ছিল, তার তখনকার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি যে দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আমরা মানুষের পক্ষে মৌল গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি করতে পারি। অন্য দিকে, প্রত্যেক দার্শনিক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে যদি অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তা হলে খুব বৈধভাবেই প্রশ্ন করা যায় — অন্যান্য প্রশ্নের

বিশদীকরণের কাজটা অত্যন্ত দীর্ঘকাল স্থগিত থাকবে কি না, এবং বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ স্তিমিত হবে কি না, বৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগতি ব্যাহত হবে কি না?

বস্তুতপক্ষে, এই পরিস্থিতি মানবজাতির প্রগতিশীল বিকাশকে গুরুতরভাবে জটিল করে তুলত, যদি প্রাসঙ্গিক সমাধানগুলির সঠিকতা প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন করে প্রমাণ করতে হত। কিন্তু মানবসংস্কৃতি বিকশিত হয় ভিন্নভাবে: যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা চিরকালের জন্য থেকে যায় মানব অভিজ্ঞতার সম্পদ-ভাণ্ডারে — বই, খসড়া, কাজের যন্ত্রপাতি, মেশিন-টুল, যন্ত্রব্যবস্থা, আচার-প্রথা ও ঐতিহ্যের মধ্যে। এবং দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের ক্ষেত্রে তা পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রযোজ্য।

দীর্ঘকাল হল সমগ্র মানবিক অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান, বৈপ্লবিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও ইতিহাস নিজে আত্মিক জগত ও চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে সত্তার, বাস্তব জগতের মুখ্য প্রকৃতি প্রমাণ করেছে। **বিষয়গত নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানের উপরে নির্ভর করেই শুধু পারিপার্শ্বিক জগতকে রূপান্তরিত করা সম্ভব,** প্রকৃতির ভিতরে পরিবর্তন আনা ও সমাজ পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব — এর প্রমাণ পাওয়া গেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবে এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণরত অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতায়। বাস্তব অবস্থা গণ্য না করে ইচ্ছাপূরণে মগ্ন থাকলে, তা বৈপ্লবিক রূপান্তরের ব্যর্থতা ডেকে আনে।

সত্তার, প্রকৃতির মুখ্যতার সমর্থনে বিজ্ঞানীরাও প্রত্যক্ষগোচর প্রমাণ যোগান। আধুনিক গবেষণার উপরে নির্ভর করে, নিরাপদেই বলা যেতে পারে যে একজন মানুষের বা একটি প্রাণীর মন নিজে থেকে থাকতে পারে না, মস্তিষ্কের ভিতরে চলমান প্রক্রিয়াসমূহের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অসামান্য আমেরিকান স্নায়ু-শারীরবৃত্তবিদ **হোসে দেলগাদোর** চালানো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে ইলেকট্রোড প্রবিষ্ট করিয়ে তার দীর্ঘকাল-বিস্মৃত স্মৃতি জাগ্রত করা সম্ভব, এবং নির্দিষ্ট একটা ভাবাবেগ বা কিছু কিছু অটল মায়া জাগিয়ে তোলা যায়। আমাদের চিন্তা ও ভাবাবেগগুলির অন্তর্বস্তু আর বাস্তবের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ এক যোগসূত্র আছে। আমাদের আত্মিক জগত যা কিছু দিয়ে তৈরি, তা গঠিত হয় অভিজ্ঞতার ফলে, আমাদের চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবীর সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে। মনোবিদরা যা প্রমাণ করেছেন, এমন কি আমাদের স্বপ্ন যত উদ্ভট বা অদ্ভুতই হোক না কেন, সেগুলির মূল রয়েছে বাস্তব জীবনের মধ্যে।

আমরা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি যে দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নটি আজ আর এমন একটা জটিল সমস্যা নয়, যা সমস্ত দার্শনিকের কাছে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। **মোটের উপরে, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নটি মীমাংসিত হয়েছে চৈতন্যের ব্যাপারে বাস্তব জগতের মুখ্যতার অনুকূলে।** সুতরাং, এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গেলে, সমসাময়িক একজন দার্শনিককে নতুন প্রমাণ দাখিল

করতে হয় না। এঙ্গেলসের কথায়, পৃথিবীর বস্তুগততা 'প্রমাণিত হয় সামান্য কিছু বুলির মারপ্যাঁচে নয়, বরং দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এক দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর বিকাশ দিয়ে।'*

মনে হতে পারে যে, বুনিয়াদি প্রশ্নটির যেহেতু মীমাংসা হয়ে গেছে, তাই তর্ক করার মতো আর কিছু নেই, সমস্ত দার্শনিক অবশ্যই ঐকমত্যে উপনীত হবেন। কিন্তু, ব্যাপারটা অত সরল নয়। একটা চালু উক্তি আছে: জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলি যদি মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হত, তা হলে সেগুলি অপ্রমাণিত হত। আর, শুধু ব্যক্তিমানুষের স্বার্থের সঙ্গেই নয়, জনগণের বড় বড় গোষ্ঠী, শ্রেণীগুলির স্বার্থের সঙ্গেও যা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সেই দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের ব্যাপারে কী বলা যায়? লেনিনের শরণাপন্ন হওয়া যাক: 'শ্রেণী সংগ্রাম-ভিত্তিক এক সমাজে কোনো 'অপক্ষপাত 'সামাজিক বিজ্ঞান থাকতে পারে না।... এক মজুরি-দাস সমাজে বিজ্ঞান অপক্ষপাত হবে এটা আশা করাটা পুঁজির মুনাফা কমিয়ে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো উচিত কি না সেই প্রশ্নে ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছ থেকে পক্ষপাতহীনতা প্রত্যাশা করার মতোই মূর্খসুলভ অতিসারল্য।'**

---

* Frederick Engels, *Anti-Dühring*, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 58.

** V. I. Lenin, *The Three Sources and Three Component Parts of Marxism*, Collected Works, Vol. 19, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 23.

দর্শনের এই বুনিয়াদি প্রশ্নটির উত্তর-সাপেক্ষে কেউ স্থির করবে সমাজের একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন কি না, না হয় এই সিদ্ধান্ত করবে যে তা অসম্ভব; কেউ মানুষের রোগ ও শারীরিক কষ্টভোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের আয়ু বাড়াবে, না হয় মানবদেহকে গণ্য করবে আত্মার সাময়িক আবাস বলে, তাকে আরও ভালো করার চেষ্টা করবে না।

মানুষের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে অর্জিত সাফল্যগুলি যে বিষয়গত পৃথিবীর মুখ্যতা কিংবা দার্শনিকদের ভাষায় বলতে গেলে, চৈতন্যের ব্যাপারে বস্তুর মুখ্যতা প্রতিপন্ন করেছে, সেই ঘটনা সত্ত্বেও এই প্রশ্নের অন্যান্য বিপরীত উত্তর এখনও চালু রয়েছে, যেগুলি বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলির বিরোধী বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু কিছু স্বার্থ পূরণ করে। তাই দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের দিকে আমাদের অবশ্যই বার বার ফিরে দেখতে হবে, এবং যা বহুকাল আগে প্রমাণিত হয়েছে তা বার বার প্রমাণ করতে হবে। এই কারণে, ঠিক দুই সহস্রাব্দ আগেকার মতোই, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের মীমাংসা অনুযায়ী দার্শনিকরা দুটি বড় বড় গোষ্ঠীতে পড়েন — বস্তুবাদী ও ভাববাদী। প্রথমোক্তরা, লেনিনের ভাষায়, অনুসরণ করেন 'ডেমোক্রিটাসের ধারা' আর শেষোক্তরা অনুসরণ করেন 'প্লেটোর ধারা'।

ভাববাদ ও ভাব

সব দার্শনিকই সর্বপ্রথমে হয় বস্তুবাদী না হয় ভাববাদী, এবং তাঁদের বিভক্ত করে প্রধান রেখাটা টানা

হওয়ার পরেই তাঁদের বিভক্ত করা যায় অস্তিত্ববাদী, ফ্রয়েডপন্থী, নয়া-টমপন্থী, দৃষ্টবাদী ও মার্কসবাদীতে। বস্তুবাদীরা এই মত পোষণ করেন যে বস্তু, পারিপার্শ্বিক পৃথিবী, প্রকৃতি (এই সমস্ত কথাই মোটামুটি একই ধারণা বোঝায়) আত্মপ্রকাশ করেছিল চৈতন্যযুক্ত মানুষের আগে। প্রকৃতির ক্রমবিকাশের সময়ে পশু, উদ্ভিদ ও জীবন্ত জীবসত্তা আবির্ভূত হয়েছিল এবং আরও পরে দেখা দিয়েছিল মানুষ। বস্তুকে আরও যথাযথ ভাষায় নির্ণয় করার চেষ্টা করা যাক। **বস্তু** হল তাই যা আছে আমাদের চৈতন্যের বাইরে, চৈতন্য থেকে স্বতন্ত্র, এবং গঠিত হয়েছে চৈতন্যের আগে, অর্থাৎ যা আছে **বিষয়গতভাবে**। তা সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংস করা যায় না; তা চিরন্তন ও অসীম। সর্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হয়ে, এবং সারা জীবন ধরে মানুষ বস্তুর সংস্পর্শে আসে — সে কাজ করুক অথবা তার চারপাশে কী ঘটছে তার শুধু রসগ্রহণই করুক। মানবদেহও বস্তু: বস্তুতপক্ষে, তার উদ্ভব, বৃদ্ধি ও ক্রিয়াগুলি পুরোপুরি মানুষের ইচ্ছাশক্তির আয়ত্ত নয়, মানুষ তা যতই কামনা করুক না কেন। বস্তুগত পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের মিথষ্ক্রিয়া ঘটায়, বস্তুগত পৃথিবী ক্রমাগত এক অভিঘাত সৃষ্টি করে তার উপরেও — তার ভাবাবেগ, চৈতন্য ও ইচ্ছার উপরে। সুতরাং, শুধু চৈতন্যের আত্মপ্রকাশই বস্তুর উপরে নির্ভর করে না, তার 'অন্তর্বস্তুও' বস্তুর উপরে নির্ভর করে — কেননা মানুষের সমস্ত জ্ঞান আহৃত হয়েছে পারিপার্শ্বিক জগত থেকে।

ভাববাদীরা আত্মা ও বস্তুর মধ্যেকার সম্পর্ককে দেখেন ভিন্নভাবে। তাঁদের কাছে, বাস্তব, প্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে পৃথিবী, প্রকৃতি ও মানুষ এক বিশেষ আত্মার সৃষ্টি, কারও ভাবের, ভালো বা মন্দ ইচ্ছার রূপায়ণ। একজন স্থপতির পরিকল্পিত ও বিশদীকৃত নকশা অনুযায়ী একজন নির্মাতা যেমন একটি বাড়ি তৈরি করতে পারে, সেইভাবেই সমগ্র পৃথিবী ও স্বয়ং মানুষ এক অজানা সর্বশক্তিমান স্থপতির সংসাধিত এক বিশালাকার 'নকশার' এক মূর্তরূপ মাত্র।

তাই ,বস্তুবাদীরা যেখানে এই মত পোষণ করেন যে বস্তুই মুখ্য এবং আত্মা, চৈতন্য তার উৎপাদ, সেখানে ভাববাদীদের মত এই যে সমগ্র পৃথিবী চৈতন্যের ক্রিয়ার ফল। মনে হতে পারে, বিষয়টা যথেষ্ট পরিষ্কার। কিন্তু, মানবজাতির অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে এই কথাগুলির টীকাভাষ্যে সব সময়েই এক ধরনের বিহ্বলতা থাকে।

কখনও কখনও, কাউকে 'ভাববাদী' বলে অভিহিত করার সময়ে লোকে বোঝাতে চায় যে আলোচ্য ব্যক্তিটির উচ্চ ও মহৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ ও আদর্শ আছে, বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে সে গুণবান। কখনও কখনও, কিছুটা ব্যঙ্গের ভাবও যোগ করা হয়, কেননা একজন ভাববাদী সর্বদাই স্বপ্নদ্রষ্টা এবং নিজের 'নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের' কথা, রূঢ় বাস্তবের কথা ভুলে যায়, বাস্তব তার কাঙিক্ষততম ভাবগুলিকে কঠোরভাবে ধ্বংস করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, 'বস্তুবাদীরা' নীচ আত্মার মানুষ, যারা সদ্‌গুণ ও সৌন্দর্যে বিশ্বাস করে না,

নিজেদের জৈব চাহিদাগুলি চরিতার্থ করার কথাই শুধু চিন্তা করে। সুতরাং, মানুষের সমস্ত দোষ — অতিভোজন, পানমত্ততা, কামলালসা, লোভ ও মুনাফার বাসনা — বস্তুবাদীদের বৈশিষ্ট্যসূচক। এমন কি জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক ও মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম সাক্ষাৎ পূর্বসূরী, লুডভিগ ফয়েরবাখ পর্যন্ত 'বস্তুবাদ' শব্দটির বিরুদ্ধে নিজের প্রতিকূল ধারণা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সমসাময়িক দার্শনিকবৃন্দ-কৃত বস্তুবাদের অপকৃষ্ট, ইতর ব্যাখ্যার সঙ্গে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বস্তুবাদকে মিশিয়ে ফেলে তিনি লিখেছিলেন: 'পিছন দিকে আমি বস্তুবাদীদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত; কিন্তু সামনের দিকে নয়'।*

অবশ্য, এই ধরনের 'বস্তুবাদী' কারও সহানুভূতি উদ্রেক করবে না। কিন্তু একজন গোঁড়া বুর্জোয়া দেউলিয়াপনার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে নিজে শুধু সদ্‌গুণ, ভালোবাসা, আস্থা আর পারস্পরিক সহায়তার কথাই মনে আনে। মহৎ আদর্শগুলির প্রদীপ্ত প্রবক্তা কখনও কখনও গোপনে এমন সব অপকর্মে লিপ্ত থাকতে পারে, যেগুলিকে সে প্রকাশ্যে ঘৃণাভরে ধিক্কার জানায়। সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজ এটা প্রতিপন্ন করার মতো যথেষ্ট উদাহরণ যোগায়।

---

* Frederick Engels, *Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy,* in: Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works in three volumes, Vol. 3, p. 349.

একেবারে উঁচু মহলের কর্মকর্তাদের মধ্যে জঘন্য দুর্নীতি, প্রকাশ্য বা গোপন কিন্তু কর্তৃপক্ষের নীরব অনুমোদন-প্রাপ্ত বর্ণবৈষম্য 'মানবাধিকার রক্ষার' প্রচারের পাশাপাশি চলে।

তা হলে, শুভ, ন্যায়বিচার ও উন্নততর ভবিষ্যৎ অর্জনের সংগ্রাম সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট দর্শনের প্রতিনিধি হিসেবে বস্তুবাদী ও ভাববাদীদের প্রকৃত মনোভাব কী? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, বস্তুবাদী দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের প্রথমে বিবেচনা করতে হবে।

বস্তুবাদী চোখে পৃথিবী

পৃথিবীর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে গিয়ে দার্শনিক প্রথমেই তার বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হন। বিশাল বিশাল গ্রহ-নক্ষত্র আছে, সেগুলির মধ্যে পৃথিবী কোনোমতেই সর্ববৃহৎ নয়, এবং আমাদের জগতে আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অদৃশ্য কণাও — অণু, পরমাণু ও প্রাথমিক কণা। আমরা পরিবেষ্টিত জড় প্রকৃতি দিয়ে — পাহাড়-পর্বত, বিস্তীর্ণ জলভাগ, জমি, এবং বিপুল সংখ্যক জীবন্ত সত্তা দিয়ে। বসবাস করার জন্য মানুষ গৃহ ব্যবহার করে, স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করে বাস ও বিমান, সে সবই সে তৈরি করেছে নিজের হাতে। কিন্তু সে তার চারপাশে এমন সব বস্তুও দেখতে পায়, যেগুলি সে নিজে তৈরি করে নি, তার আত্মপ্রকাশের আগেই যেগুলি ছিল। এই সমস্ত

বহুবিচিত্র চিত্রের মধ্যে কি কোনো ধরনের ঐক্য আছে? এই প্রশ্নের উত্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুতপক্ষে, জগত যদি নিতান্তই বিশৃঙ্খল এক পিণ্ড হয়, তা হলে মহাবিশ্বে একটি বালুকণার মতো মানুষ সেখানে 'নিরুদ্দিষ্ট'। জগতে যদি কোনো শৃঙ্খলা না থাকে, কোনো নিয়ম না থাকে, তা হলে চৈতন্যযুক্ত সত্তা স্বয়ং মানুষ সমেত সমস্ত জীবন্ত পদার্থের উদ্ভব বোঝা অসম্ভব। খোদ বস্তুবাদ সম্পর্কেও প্রশ্ন ওঠে, কেননা মানব চৈতন্য বস্তু থেকে কীভাবে উদ্ভূত হয়েছিল তা-ই যদি আমরা জানতে না পারি, তা হলে, হয়তো বা তা আদৌ বস্তু থেকে উৎপন্ন হয় নি, তা ছিল বস্তু থেকে স্বতন্ত্রভাবে? সেই জন্যই পৃথিবীর ঐক্যের প্রশ্নটি, যে নিয়মগুলি তাকে একটিমাত্র সমগ্রে বেঁধে রেখেছে সেই নিয়মগুলির প্রশ্নটির মীমাংসা কোনো বস্তুবাদীই এড়িয়ে যেতে পারেন না।

প্রথমে পৃথিবীতে বিশ্বজনীন নিয়মগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণাগুলি ছিল নিছক আন্দাজের ব্যাপার। প্রাচীন গ্রীসে বস্তুবাদী দার্শনিকরা এই নিয়মগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুসমূহের বিশ্বজনীন সম্পর্ক যিনি এক কাল্পনিক রূপে প্রকাশ করেছিলেন, সেই হেরাক্লিটাস মনে করতেন যে বিশ্ব এক ঐক্য, কারণ তা স্থাপিত একটিমাত্র ভিত্তির উপরে — অগ্নির উপরে, যে অগ্নি 'পরিমাপমতো প্রজ্বলিত ও পরিমাপমতো নির্বাপিত'। থেলস জলকে মনে করতেন পৃথিবীর মুখ্য ভিত্তি, এবং

আনাক্সিমেনেস — বায়ুকে। পৃথিবীর গঠনকাঠামো সম্বন্ধে একটা সঠিক অভিমতের সবচেয়ে কাছাকাছি যিনি এসেছিলেন সেই ডেমোক্রিটাস মনে করতেন যে বস্তুসমূহের একটিমাত্র মুখ্য ভিত্তি হল পরমাণুগুলি — চলমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাগুলি। প্রথম গ্রীক বস্তুবাদী দার্শনিকদের অভিমতকে এঙ্গেলস বর্ণনা করেছেন এইভাবে: 'এখানে ...ইতিমধ্যেই রয়েছে সমগ্র প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ, যা তার শুরুতে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহের অসীম বৈচিত্র্যের ঐক্যকে গণ্য করে স্বাভাবিক ঘটনা বলে, এবং তার মধ্যে সন্ধান করে নির্দিষ্টভাবে বাস্তব একটা কিছুর, একটা বিশেষ জিনিসের, যেমন থেলস করেন জলের মধ্যে।'*

পৃথিবীর ঐক্য সম্বন্ধে প্রাচীন বস্তুবাদীদের অনুমানগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করে, সুনির্দিষ্ট করে ও সংশোধন করে এবং তাঁদের সাদাসিধা প্রকল্পগুলিকে যথার্থ সত্যে পরিণত করে। অণু-পরমাণু, জীবন্ত জীবসত্তা ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-নির্ধারক নিয়মগুলি এখন আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানের অস্তিত্বই 'পৃথিবীর ঐক্যের প্রমাণ, কেননা বিজ্ঞান সর্বদাই অধ্যয়ন করেছে সাধারণ, স্থিতিশীল, সমস্ত প্রক্রিয়ায় ও ব্যাপারে পুনঃঘটমান একটা কিছুকে।

বস্তুবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে বৈচিত্র্যময় পৃথিবী শুধু একটিই মাত্র সমগ্র নয়; স্থানে বা কালে তার কোনো

---

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, p. 186.

শেষ বা শুরু নেই। আমরা যদি কল্পনা করি যে বহু বহুকাল আগে পৃথিবী ছিল না এবং কোনো মানুষজন বা পশু ছিল না, কোনো গাছ বা ঘাস ছিল না, কোনো আগুন ও কোনো জল ছিল না, বস্তুর এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা পর্যন্ত ছিল না, তা হলে তার মানে এই যে 'কিছু না' থেকে পৃথিবীর অভ্যুদয় হয়ে থাকতে পারে। আর পৃথিবী যদি একদিন অদৃশ্য হয়ে যেতে বাধ্যই হয়, শুধু আমাদের পৃথিবীই নয়, অন্য সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রও — তা হলে তার মানে কি এই যে সেগুলিও চলে যাবে 'কোথাও নয়' এবং পরিণত হবে 'কিছু না'-তে? আধুনিক বিজ্ঞানের বুনিয়াদি নিয়মগুলির সঙ্গে — বস্তুর সংরক্ষণের নিয়মগুলির সঙ্গে এই ধরনের অনুমিতির একটা আপোসহীন দ্বন্দ্ব বাধে। কিছু-না থেকে উদ্ভূত না হওয়ার ও নিশ্চিহ্নরূপে অদৃশ্য হয়ে না যাওয়ার যে সুনির্দিষ্ট প্রবণতা বস্তুগত জগতের একেবারে সমস্ত বহিঃপ্রকাশেরই বিশিষ্ট লক্ষণসূচক, এই নিয়মগুলি সেই প্রবণতাকে সবচেয়ে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট করে। বস্তুর 'অনন্ততা'-র সমর্থককে তাঁর অবশিষ্ট একমাত্র যুক্তিটির আশ্রয় নিতে হবে: 'কিছু না' থেকে পৃথিবীর অভ্যুদয় বিজ্ঞানের পরিপন্থী হোক — এটাই তো তার অলৌকিক ব্যাপার। এবং এ কথা সুবিদিত যে অলৌকিক ব্যাপারগুলি ঘটনাবলীর স্বাভাবিক গতিধারাকে সব সময়েই ব্যাহত করে: সেগুলির ব্যাখ্যা করা চলে না। কিন্তু অলৌকিক ব্যাপার একেবারে অকারণে ঘটে না, এমন কি রূপকথাতেও না। অলৌকিক

ব্যাপারটি সর্বদাই সংসাধিত হয় কোনো আশ্চর্য শক্তির দ্বারা, যে প্রকৃতি ও বস্তুকে অগ্রাহ্য করতে পারে। তাই বলা হয়েছে: এই শক্তি **অ-বস্তুগত।** কিন্তু পৃথিবীতে বস্তু ও চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই: এগুলিই হল সত্তার সাধারণতম ক্ষেত্র। সুতরাং, বস্তুর অনন্ত প্রকৃতি সংক্রান্ত বক্তব্য অবশ্যম্ভাবীরূপেই নিয়ে যায় ভাববাদের দিকে, এই সিদ্ধান্তের দিকে যে বস্তুর আত্মপ্রকাশ ও বিবর্তনের উৎস, এবং যে নিয়ম অনুযায়ী তা বিকশিত হয় সেগুলিরও উৎস হল এক নির্দিষ্ট অধ্যাত্মা, কিংবা, সাধারণত যা বলা হয়, ভগবান।

এ থেকে দাঁড়ায় এই সিদ্ধান্ত: **পৃথিবীর বস্তুগত ঐক্য, তার চিরন্তন ও অনন্ত প্রকৃতির স্বীকৃতি ছাড়া খাঁটি, সুসংগত বস্তুবাদ অচিন্তনীয়।**

কিন্তু মানুষ কি এই ধরনের পৃথিবীতে একাকী হয়ে যাবে না, সে যখন অনন্তকালের সম্মুখীন হবে তখন কি সে সন্ত্রস্ত হবে না? আমেরিকান দার্শনিক **উইলিয়াম জেমস্** যখন বস্তুবাদকে বর্ণনা করেছিলেন এক তমসাচ্ছন্ন, নিষ্করুণ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি বলে, যা দুঃস্বপ্নের চেয়ে কম কিছু নয়, তখন তাঁর মনে ঠিক এই জিনিসটাই ছিল। প্রকৃতির ক্রমবিকাশের অনন্ত প্রক্রিয়ায় মানুষ বুঝি বা নিজেকে একটি ক্ষুদ্র নগণ্য অংশ বলে বোধ করে; প্রয়োজনীয়তার লৌহশৃঙ্খল ভাঙার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের যে সব অভিযোগ বর্ষিত হচ্ছে, তার কি কোনো ভিত্তি আছে?

এর উত্তর 'হ্যাঁ', 'না', দুটোই হতে পারে। বস্তুবাদ একটিমাত্র, একশিলাসদৃশ একটি মতধারা নয়: তার অসংখ্য বর্ণাভা ও রূপ আছে। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ, অর্থনৈতিক বিকাশ, রাজনীতি, এমন কি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দও বস্তুবাদী দর্শনের চরিত্রের উপরে তাদের ছাপ রেখে যায়। বিশেষত, অতীত ও বর্তমানের ভাববাদী দার্শনিকরা বস্তুবাদের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ করেছেন, তা প্রধানত তার অন্যতম একটি রূপ সম্পর্কেই: **অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদ।**

এই নাম কেন? ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে, বস্তুবাদের এই রূপটি যখন গড়ে উঠছিল, তখন যথেষ্ট বিকাশপ্রাপ্ত একটিই মাত্র বিজ্ঞান — যন্ত্রনির্মাণবিদ্যা। এটা সুবিদিত ঘটনা যে লোকেরা তাদের কৃতিত্ব ও সাফল্যগুলি অতিরঞ্জিত করতে চায়; এবং এটা শুধু ব্যক্তিমানুষদেরই নয়, সামগ্রিকভাবে মানবজাতিরও বিশিষ্ট লক্ষণসূচক।

বিজ্ঞান সেই সময়ে সারগতভাবেই ছিল মাতৃঅঙ্কে। মানুষের কাজে ও জীবনে মানুষকে তা সবে সাহায্য করতে শুরু করেছিল এবং যন্ত্রনির্মাণবিদ্যাকে গণ্য করা হয়েছিল ব্যাপারসমূহ বোঝার একমাত্র সম্ভাব্য ভিত্তি বলে। অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদের প্রতিনিধিরা যন্ত্রনির্মাণবিদ্যার নিয়মগুলিকে বিশ্বজনীন নিয়ম বলে গণ্য করতেন, সেই নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত চেতন ও জড় প্রকৃতি বিকাশলাভ করছে। পশুকে মনে করা হত

এক ধরনের যন্ত্র, এবং এও জোর দিয়ে বলা হত যে যন্ত্রের মতো পশুও বেদনা অনুভব করে না। এই দার্শনিকদের মতে, মানুষ নিজে এক অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রব্যবস্থা মাত্র। জনৈক ফরাসী দার্শনিক, **জুলিয়েন অফ্রে দ্য লামেত্রি** এমন কি তাঁর মূল রচনার নাম দিয়েছিলেন 'মানুষ-যন্ত্র'।

সেই সময়ে মহাবিশ্বকে গণ্য করা হয়েছিল বিশালাকৃতি এক ঘড়ি হিসেবে। কিন্তু সেই ঘড়ির কলকব্জায় কাউকে তো নিশ্চয়ই চাবি দিতে হবে। সেই বিরাট ঘড়ি প্রস্তুতকারক কে? ভাষান্তরে, মহাবিশ্ব, উদ্ভিদ ও জীবজগৎ এবং মানুষের আত্মপ্রকাশ ব্যাখ্যা করা যায় কীভাবে? শুধু যন্ত্রনির্মাণবিদ্যার নিয়মগুলির ভিত্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ দুরূহ ছিল। যন্ত্রনির্মাণবিদ্যায় সব কিছুই সরল: একটি বিলিয়ার্ড বলকে ঠেলে দিন, সেটি গড়িয়ে চলতে চলতে শেষে থেমে যাবে, যদি না আবার ঠেলে দেওয়া হয়। মহাবিশ্বের বেলাতেও কি একই রকম হতে পারে? একদা কেউ হয়তো ঘড়ির কলকব্জায় ঠেলা দিয়েছিল, তাই কিছুকালের জন্য সেটি চলবে বিনা গোলমালে। আমরা উপরে যেমন দেখিয়েছি, একমাত্র যে 'ঘড়ি-প্রস্তুতকারক' এরূপ কাজ করতে সক্ষম, তা নিশ্চয়ই অ-বস্তুগত, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা।

তাই এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদ সংগতিহীন, কেননা, শেষাবধি, পৃথিবীতে ঘটা পরিবর্তনগুলির, এবং খোদ পৃথিবীর উৎসের সমস্যাটির মোকাবিলা করতে গিয়ে তা শরণাপন্ন হয়

এক আধ্যাত্মিক নীতির, কিংবা, ভাষান্তরে, ঈশ্বরের। এই ধরনের অবস্থানকে বলা হয় ঈশ্বরবাদ; ঈশ্বরকে তা পৃথিবীর মুখ্য কারণ হিশেবে স্বীকার করে: পৃথিবী সৃষ্টি করার পর, তার 'ঘড়ির কলকব্জায়' চাবি দেওয়ার পর ঈশ্বর তাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন, এবং তাকে তার নিজের সহায়-সামর্থ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। ইংরেজ দার্শনিক **জন লক্** বস্তুকে দেখেছিলেন কোনো মৃত ঢেলা হিসেবে, যা বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজের মধ্যে গতি সৃষ্টি করতে অক্ষম। ফরাসী দার্শনিক, পরমাণুবিজ্ঞানী **পিয়ের গাসেন্দি** মনে করেছিলেন যে, পরমাণু সৃষ্টি হয়েছিল প্রকৃতির বাইরে একক দেবতা দ্বারা, যিনি পরে পৃথিবীকে নিজ নিয়মগুলির অনুসারে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা যুগিয়েছিলেন।

কিন্তু মহাবিশ্ব ও মানুষ সম্বন্ধে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি উত্তর যোগায় নি এই প্রশ্নগুলির: চৈতন্য কী; মানুষ কীভাবে বিচারবুদ্ধির, সৌন্দর্য উপভোগ করার সামর্থ্যের, কীভাবে বিবেক-দংশিত হওয়ার বা আরেকজনের প্রেমে পড়ার সামর্থ্যের বিকাশ ঘটিয়েছিল? অধিযন্ত্রবাদীরা এই ব্যাপারটি নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন।

কেউ কেউ এই মত পোষণ করতেন যে খোদ চিন্তাই বস্তুগত ও স্পর্শনীয়। বলা হত যে চিন্তাগুলি মস্তিষ্ক থেকে নিঃসৃত হয় ঠিক তেমনভাবেই যেমনভাবে যকৃৎ থেকে পাচকরস নিঃসৃত হয়। এই অভিমতের মধ্যে অনেকখানি যুক্তি আছে বলে মনে হয়। তবুও

চিন্তনের ক্রিয়াটি মানুষের মধ্যে থাকে কেন, সেটা পরিষ্কার নয়। তাই আরেকদল অধিযন্ত্রবাদী এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যেমন, বা চৈতন্য হল মানবদেহের সুষ্ঠুভাবে ক্রিয়াশীল যন্ত্রপ্রণালীটির এক অতিরিক্ত 'সম্পূরক অংশ'। অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদের সংগতিহীনতা এই সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

বস্তুবাদের পক্ষে এই মত পোষণ করাটাই অসংগতিপূর্ণ যে পৃথিবীতে বস্তু ছাড়া আদৌ আর কিছু নেই এবং যাকে কোনো মানদণ্ডেই বস্তু বলে বিচার করা যায় না — দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানবমন — এমন যে কোনো জিনিসই অনুসন্ধানের অযোগ্য। **একজন সুসংগত বস্তুবাদীকে মানুষের চিন্তা, ভাবাবেগ ও ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বকে বস্তুর বিকাশের এক নিয়ম-শাসিত ও আবশ্যিক ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতে হবে।** অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদ সেটা করতে পারে নি, কারণ যন্ত্রনির্মাণবিদ্যার নিয়মগুলি মানুষকে এক সচেতন, চিন্তাশীল, নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ ও সেই সমস্ত লক্ষ্যার্জনে সক্ষম সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। অধিযন্ত্রবাদী দর্শনে পৃথিবীর ঐক্যের ধারণা এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে না যে পৃথিবী একক, কিন্তু একক তার বৈচিত্র্যের মধ্যে। সুতরাং অধিযন্ত্রবাদী পৃথিবীর যে বর্ণহীন, তমসাচ্ছন্ন ছবিটি আঁকেন তা সহজেই পর্যবসিত হয় সক্রিয় অধ্যাত্মা ও অক্রিয় বস্তুতে; এবং এটা ভাববাদ থেকে সুদূর নয়।

তৃতীয় এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কি সম্ভব?

যে মতবাদ পৃথিবীতে দুটি নীতির — আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত — অস্তিত্ব স্বীকার করে তাকে বলা হয় **দ্বৈতবাদ**; এবং যেন বস্তুবাদ ও ভাববাদের মাঝামাঝি একটা কিছু। এরূপ 'অর্ধ-পক্ব' দর্শন হল নিজ সীমাবদ্ধতা ও অসংগতি সহ অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদের একটি ফল। ভাববাদীরাও মাঝে মাঝে গড়িয়ে নেমে আসেন দ্বৈতবাদে, কেননা বিজ্ঞান ও বাস্তবের দাবিকে তাঁদের গণ্য করতেই হয়, এবং তাই তাঁরা বস্তুগত জগতের অস্তিত্ব পুরোপুরি বাতিল করতে পারেন না।

দ্বৈতবাদ অবশ্য দর্শনে, বস্তুবাদ ও ভাববাদের সঙ্গে মিলে, একটা 'তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি' নয়, বা তৃতীয় ধারা নয়। অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি বিচার করার সময়ে এর প্রতিনিধিরা নির্ভর করেন হয় ভাববাদের উপরে, না হয় বস্তুবাদের উপরে। কখনও দ্বৈতবাদ বস্তুবাদকে বর্জন করার প্রকাশ্য ভঙ্গি করার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদকে চোরাপথে নিয়ে আসার সংগোপন প্রচেষ্টা হিসেবে কাজ করে। এই ধরনের চোরাগোপ্তা, কুণ্ঠিত-অবগুণ্ঠিত বস্তুবাদ বহু বুর্জোয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর বিশিষ্ট লক্ষণ। দ্বৈতবাদের এক ক্লাসিকাল দৃষ্টান্ত দেখা যায় ১৭শ শতাব্দীর ফরাসী চিন্তক, **রেনে দেকার্তের** তত্ত্বে: তিনি এই মত পোষণ করতেন যে পৃথিবীতে আছে দুটি মুখ্য পদার্থ — বস্তুর ব্যাপক-স্থূলগত পদার্থ ও মনের চিন্তাশীল পদার্থ, অর্থাৎ বাস্তব ও আধ্যাত্মিক। এই পদার্থগুলি সব দিক দিয়েই একে অপরের

বিরোধী এবং কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, দেকার্ত এসে পৌঁছেছিলেন এই ভাববাদী সিদ্ধান্তে যে আত্মা ও বস্তু উভয়েই সমকেন্দ্রাভিমুখী হয়ে মিলতে পারে আরও বেশি সাধারণ এক মুখ্য নীতিতে, অর্থাৎ ঈশ্বরে।

দ্বৈতবাদের মতে, মানুষও বাস্তব ও আধ্যাত্মিকের, অন্ধকার ও আলোক নীতির এক সংমিশ্রণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ অর্ধ-পশু ও অর্ধ-দেবদূত। তার শ্রেয়তর প্রেরণাগুলি তাকে চালিত করে শুভ, জ্ঞান ও সৌন্দর্যের দিকে, কিন্তু তার নীচ প্রবণতাগুলি তাকে বাধ্য করে তার জান্তব কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে। দ্বৈতবাদ ব্যবহারিক উপদেশও দেয়: মানুষের উচিত তার দেহ সম্বন্ধে, এবং আহার, পান বা ভালোবাসার প্রয়োজন সম্বন্ধে অবজ্ঞাপূর্ণ হওয়া; তার উচিত 'তার মরদেহকে কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা দমন করা,' নিজের শরীরের উপরে অত্যাচার করা, কেনন তা তার অমর আত্মার সাময়িক আবাস মাত্র। এই ক্ষেত্রেও, দ্বৈতবাদ ভাববাদের সমতুল।

দ্বৈতবাদের বিপরীতে আছে **অদ্বৈতবাদ** — এই মতবাদে বলা হয় যে কোনো একটি নীতি ধারণ করা ও সুসংগতভাবে মেনে চলা উচিত। তদনুযায়ী, অদ্বৈতবাদ বস্তুবাদীও হতে পারে অথবা ভাববাদী হতে পারে।

কিন্তু ভাববাদ কি পুরোপুরি সুসংগত এক অদ্বৈতবাদী মতবাদ হতে পারে? সুসংগততম ভাববাদকে, হেগেলের ভাববাদকে, সাধারণত একটি

আগে যে সমস্যাটি তুলে ধরা হয়েছিল এখন আমরা তার দিকে আবার দৃষ্টিপাত করতে পারি — ভাববাদ ও বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের ভাগ্যে কী রয়েছে, হয় বস্তুবাদী না হয় ভাববাদী মতবাদে সংসক্ত থেকে জীবনে আমরা কোন অবস্থান গ্রহণ করব?

আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে একজন বস্তুবাদীকে কখনও কখনও বর্ণনা করা হয় একজন নীচ, স্থূল ব্যক্তি হিসেবে, যার একমাত্র বাসনা হল উত্তম ভোজন। ভাববাদীরা এই অতিকথাটা টিকিয়ে রাখতে চান। বস্তুবাদকে তার শুধু একটি রূপে, অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদে, পর্যবসিত করে তাঁরা প্রকাশ করেন যে অধিযন্ত্রবাদী দার্শনিকরা এক আশাহীন, হতাশাবাদী চিত্র উপস্থিত করেন: প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের হাতে মানুষ এক অসহায় পুতুল, 'অন্যান্য বস্তুনিচয়ের মধ্যে একটি বস্তু' মাত্র। ইচ্ছার স্বাধীনতা, সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপ, পৃথিবী পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম... এগুলি সব অলীক মায়া। একমাত্র যে জিনিসটা মানুষ করতে পারে তা হল সমগ্র পৃথিবীর কাছ থেকে নিজেকে আগলে আলাদা করে রাখা, নিজের লোকজনের ও সমগ্র মানবজাতির প্রয়োজনের কথা ভুলে যাওয়া, বৃথা সংগ্রাম পরিহার করে যতখানি পারা যায় সুখভোগ করা। কিন্তু, আমরা এইমাত্র দেখেছি যে এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব শুধু অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদের অসংগতিপূর্ণ চরিত্রের

দরুন, অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভাববাদের দিকে যাওয়ার চরিত্রের দরুন।

ভাববাদ আমাদের কী জীবনের মূল্যবোধ দেয়, তা দেখা যাক। পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে নিজেকে প্রকাশ করার সম্ভাবনা তা দেখে না। সুতরাং, ভাববাদীর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সারগতভাবে হতাশবাদী। মৃত্যু, দুঃখকষ্ট ও একাকিত্বই পৃথিবীতে প্রাধান্য করে। সত্যকার মুক্তি, সৃষ্টিশীলতা, প্রেম ও সুখ — মানুষ যা কিছুর উপযুক্ত সে সবেরই অভাব আছে। তবুও, ভাববাদী বলেন, আমরা এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব অন্তত সহনীয় করে তুলতে পারি তাকে পরিবর্তন না করেই। কীভাবে? এই বিশ্বাস করে যে আরেকটি জগৎ আছে এবং এই অদৃশ্য জগত এক প্রকৃত জগৎ; মানুষ তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে যুক্ত, তার সঙ্গে সে ভাবের আদানপ্রদান করতে পারে এবং অচিরেই সেখানে প্রবেশ করবে চিরতরে। এই দর্শনকে যদি আশাবাদী বলা যায়, তা হলে এটা একটা জাল, অলীক আশাবাদ।

সমসাময়িক পশ্চিমি দর্শনেও হতাশাবাদী সুরটি বেশ প্রকট: আমাদের সমগ্র জীবনই অমীমাংসেয়, মর্মান্তিক দ্বন্দ্বে পরিব্যাপ্ত, এই অস্তিত্ব নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে, তাই মনুষ্যজীবন কোনোরূপ অর্থহীন, তা এক অবাস্তবতা। মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই বোধ থেকে কোনো কোনো দার্শনিক (দৃষ্টান্তস্বরূপ, **জাঁ-পল সার্ত্র**) যদিও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করেছিলেন, তবুও সেগুলি ছিল অস্পষ্ট নৈরাজ্যবাদী-

ব্যক্তিতাবাদী মতবাদ। পৃথিবীর রূপান্তর বাস্তবের বিষয়গত নিয়মগুলির উপলব্ধির ভিত্তিতে হতে পারে না, বরং তা চলা উচিত উদ্ভট বাস্তব সত্ত্বেও। তাই এই ধরনের একটা বিপ্লবের সযত্ন-বিশদীকৃত তত্ত্ব, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, বা যৌথ সংগঠন প্রয়োজন হয় না। পাস্কাল লেনে-র ক্ষুদ্র উপন্যাস *L'irrevolution*-এ একজন নায়ক বলে, শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপরে ও পার্টির উপরে তাদের অধিকার রক্ষার দায় ন্যস্ত করে, এইজন্য তারা অস্বাধীন। সর্বপ্রথমে, তাদের শেখানো উচিত নিজেদের ও তাদের অন্তরতর 'আমি'-কে প্রকাশ করতে এবং বস্তুগত জগতের এক কণায় পরিণত না হতে। ধর্মঘট করা, নিজেদের অধিকারের জন্য, উন্নততর বৈষয়িক অবস্থা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে, 'বস্তুনিচয়ের ক্ষমতার' কাছে, বস্তুগত পৃথিবীর ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করা। অবশ্য, বিষয়গত নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে সংগ্রামের বাস্তব রূপগুলি উপেক্ষা করা হলে সমাজকে রূপান্তরিত করা যায় না। ভাববাদীরা যাকে তাঁদের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ বলে গণ্য করেন সেই 'সুমহান আদর্শগুলির দিকে প্রয়াস' সারগতভাবে এইখানেই এসে দাঁড়ায়। তা প্রচার করে গভীর হতাশাবাদ, অস্মিতা, বাস্তব কর্ম-তৎপরতায় অক্ষমতা, এবং সদম্ভ, শূন্যগর্ভ কথা।

ভাববাদ নিয়ে যায় মানুষের প্রতি, তার ক্ষমতার প্রতি, জীবনে তার নিজের পথ বেছে নেওয়ার প্রতি বিশ্বাসের অভাবের দিকে। একটি দৃষ্টান্ত হল কাণ্টের

নীতিবিদ্যাগত, 'ব্যবহারিক' দর্শন। কাণ্ট মনে করতেন যে মানুষকে অবশ্যই কর্তব্যের কণ্ঠস্বরে কর্ণপাত করতে হবে তর্কাতীত বিধান হিসেবে, তাকে অবশ্যই তার বিবেকের নির্দেশ মেনে চলতে হবে, এমন কি যদি তা তার বৈষয়িক স্বার্থের পরিপন্থী হয় — যেমন, কাজে পদোন্নতি, একটা লাভজনক ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি — তা হলেও। মানুষকে তার সুনীতিসম্পন্ন আচরণের জন্য পুরস্কার প্রত্যাশা করলে চলবে না। এইখানে বলা যেতে পারে: দার্শনিক ভাববাদ এইখানেই মহৎ আদর্শে বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়! কিন্তু কাণ্ট আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন: মানুষের ইহজগতে পুরস্কারের প্রত্যাশা করা উচিত নয়। পরজগতেই প্রত্যেক সুনীতিপরায়ণ মানুষ তার ভালো আচরণের জন্য পুরস্কৃত হবে, এবং যারা কর্তব্যের কণ্ঠস্বরে কর্ণপাত করে নি, তারা শাস্তি পাবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, কাণ্ট এই মত পোষণ করতেন যে মানুষকে যদি তার নিজের মতো থাকতে হয় এবং তাকে 'উপর থেকে' নিয়ন্ত্রণের অধীন না করা হয় তা হলে সে সুনীতিপূর্ণভাবে আচরণ করবে না।

পৃথিবীতে সম্ভাব্য পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্বন্ধে, এবং মহৎ আদর্শ অভিমুখে মানুষের প্রয়াস সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদের বক্তব্য কী, তা দেখা যাক।

আমরা শুরু করব এই উক্তিটি দিয়ে: 'আমি বিজ্ঞতাসম্পন্ন তথাকথিত 'কেজো' লোকদের উপহাস করি। কেউ যদি বলদ হওয়াটাই পছন্দ করে, তা হলে অবশ্য মানবজাতির দুঃখকষ্টের দিকে পিছনে ফিরে থাকা যায় এবং নিজের চামড়া বাঁচিয়ে চলা যায়।'* এই কথাগুলি বলেছিলেন কার্ল মার্ক্স — সমস্ত ভাববাদী মতবাদ সম্বন্ধে আপোসহীন এক সুসংগত বস্তুবাদী।

ভাববাদীদের সঙ্গে একজন বস্তুবাদীর তফাৎ এই যে বস্তুবাদী পরজগতের শক্তিগুলির কাছ থেকে সাহায্য নেয় না, যে শক্তিগুলি মানুষকে পুণ্যের পথে নিয়ে যায় শাস্তি আর পুরস্কারের ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে। একজন সুসংগত বস্তুবাদী মানুষের প্রতি, তার ক্ষমতা ও সামর্থ্যের প্রতি বিশ্বাস করে। একজন সুসংগত বস্তুবাদীর নমুনাসই এই আশাবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত হয় পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

একজন বস্তুবাদীর কাছে, পৃথিবী তার বৈচিত্র্যে এক, এবং স্থানে ও কালে অনন্ত। কিন্তু তবুও বস্তুবাদীকে ব্যাখ্যা করতে হয় এই পৃথিবীতে মানুষ কোন স্থান অধিকার করে আছে, এবং চৈতন্য কীভাবে দেখা

---

* *Marx to Sigfrid Meyer in New York, April 30, 1867,* Marx/Engels, Selected Correspondence, p. 173.

দেয়। 'বিরাট ঘড়ি-প্রস্তুতকারকের' কাছ থেকে সাহায্য না নিয়ে পৃথিবী সম্বন্ধে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপাদন করার জন্য এটা স্বীকার করা দরকার যে চেতন ও অচেতন প্রকৃতির, এবং চূড়ান্ত বিচারে মানুষের (যে বিচারবুদ্ধি ও ভাবাবেগ পেয়েছে), সমগ্র বৈচিত্র্যের মধ্যে যে শক্তিগুলি নিহিত আছে, সেগুলি অবশ্যই আছে খোদ বস্তুর মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যেও, তার বাইরে নয়।

এমন একটা সময় ছিল যখন প্রকৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচণ্ডভাবে সীমিত ছিল এবং প্রশ্নটার মোকাবিলা করা হত অতি সরলভাবে: চৈতন্য, 'আত্মা', অচেতন বস্তুর ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করে না, বরং অনুস্যূত থাকে প্রকৃতির যে কোনো ব্যাপারে এবং তা প্রকৃতির মধ্যে সর্বদাই উপস্থিত থেকেছে। তা যেন পাথর, জল ও মাটির মধ্যে 'ঘুমন্ত', ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে গাছপালায় ও জীবজন্তুতে এবং শেষ পর্যন্ত 'চোখ খুলছে' মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় **জড়বাদ**। তা অত্যন্ত সরল, কিন্তু সত্য থেকে বহুদূর। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য সমসাময়িক একজন বস্তুবাদীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্নটি অন্য একটি কোণ থেকে বিবেচনা করা যাক। জীবন কী? একটা শিলাখণ্ডকে যদি নিয়ত প্রবল বায়ু ও তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে রাখা হয় তবে সেটি ক্রমে ক্ষয় পাবে; তা দেখতে অন্য রকম হবে, অথচ তার জায়গাতেই থাকবে। প্রতিতুলনায়, একটি জীবন্ত জিনিস, এমন কি ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গও, খারাপ আবহাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য

আশ্রয় খ্ুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করবে। এমন কি একটি উদ্ভিদও একভাবে 'ব্যবস্থা অবলম্বন' করবে তার ফুলের পাপড়িগ্ুলি বন্ধ করে। তাই, অচেতন প্রকৃতির অনন্ুর্পভাবে, যে কোনো জীবন্ত জিনিস সর্বদাই পরিবেশের সঙ্গে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে, বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য, খাদ্য খ্ুঁজে পাওয়া ও তার বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য তার অস্তিত্বের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সাড়া দেয়।

কিন্তু, পরিবেশের পরিবর্তনগ্ুলিতে ঠিকভাবে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর মধ্যেই সীমিত, মান্ুষ ছাড়া; মান্ুষ বাস করে অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল অবস্থায় এবং নিত্যই সম্ম্ুখীন হয় একেবারে নতুন নতুন পরিস্থিতির। জলের তলায় রাখলে যে কোনো ভূমিচর পশ্ুই মারা যাবে, কিন্তু মান্ুষ অক্সিজেন ট্যাঙ্কয্ুক্ত একটা ডুব্ুরির পোশাক ব্যবহার করতে পারে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় বসবাসকারী জীবজন্তু উত্তর মের্ুতে বে'চে থাকতে পারে না, এমন কি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যও নয়। অন্য দিকে, মান্ুষ সেই কঠোর অবস্থাতেও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। যে মান্ুষ শারীরিক দিক দিয়ে তত ভালোভাবে আয়্ুধসজ্জিত নয়, যার প্ুর্ু লোমের আবরণ বা তীক্ষ্ম নখ-দন্ত নেই, সেই মান্ুষ কেন জীবজন্তুর উপরে এত স্ুবিধা ভোগ করে?

মান্ুষের একটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, সে যা দেখেছে তার সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করা এবং ভবিষ্যতের প্ুর্বাভাস করার ক্ষমতাই এর কারণ।

নিকৃষ্টতম স্থপতিও শ্রেষ্ঠতম মৌমাছিকে ছাড়িয়ে যায়, কেননা সে প্রথমে একটি বাড়ি বানায় নিজের মাথার মধ্যে। আর মানবচৈতন্য ঠিক এই ক্রিয়াগুলিই সম্পন্ন করে। ফলত, চৈতন্য আত্মপ্রকাশ করে চেতন প্রাণীসমূহের জীবনের অবস্থার জটিলতার ফলে। তা হল জীবন্ত বস্তুর বিকাশের ফল, পরিবেশে দিকস্থিতির সবচেয়ে ত্রুটিহীন উপায়। কতকগুলি বিজ্ঞান, যেমন— নৃবিদ্যা, মনোবিদ্যা, জীববিদ্যা ও মনো-শারীরবৃত্ত তর্কাতীতভাবে একথা প্রকাশ করে। তাই আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত টানতে পারি:

প্রথম, চৈতন্য যদি মানুষকে পৃথিবীতে নিজের দিক-স্থিতি ঘটাতে সাহায্য করার জন্য আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে তা নিশ্চয়ই পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের সত্যকার তথ্য যোগাবে, অন্যথায় তা মানুষের পক্ষে অকেজো এমন কি ক্ষতিকর হবে। দ্বিতীয়, চৈতন্য যদি মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনের ফল হয়, তা হলে তা তার অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্মগুলি সমাধানের একটি হাতিয়ার। এইভাবে, মানুষ বাস্তবকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতাসম্পন্নই শুধু নয়, যে জ্ঞান সে অর্জন করেছে তাকে তার জীবনমান উন্নত করার জন্য ব্যবহার করতেও সক্ষম।

বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি আশাবাদী কেন, তা এখন পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আমাদের চারপাশের পৃথিবীর বিপুল বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, এবং মানুষ কোনোমতেই সর্বশক্তিমান না হওয়া সত্ত্বেও, সেই পৃথিবীতে তার অবস্থান আশাহীন নয়। কিছুটা সময় লাগলেও, সে

পৃথিবী সম্বন্ধে এক উপলব্ধি লাভে সক্ষম, এবং তার নিজের স্বার্থে সে এই জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। মানুষের পক্ষে, তার বর্ধিষ্ণু ক্ষমতার পক্ষে, পৃথিবী হল ক্রিয়াকলাপের এক সীমাহীন ক্ষেত্র। কোনো পরম শক্তি তার উপরে এই গুণ বর্ষণ করে নি; বরং এই আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হল প্রকৃতি ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তার গভীর অঙ্গীয় যোগসূত্র।

হ্যামলেট না ফাউস্ট?

আমরা ইতিমধ্যেই একথা পরিষ্কার করে দিয়েছি যে পৃথিবীকে বোঝা সম্ভব কি না, এই প্রশ্নটিই বস্তুবাদী ও ভাববাদী দর্শনের মধ্যে বিবাদের অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এও বলা যেতে পারে যে দর্শনের বুনিয়াদী বিষয়টি যথাযথভাবে সূত্রায়িত করা যায় একমাত্র তখনই, যদি পৃথিবী জ্ঞেয় কিনা, সেই প্রশ্নটি দিয়ে একে সম্পূরিত করা যায়। তা হলে, দর্শনের বুনিয়াদি বিষয়টির আরও যথাযথ এক সংজ্ঞার্থ দেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

এই বিষয়টির দুটি দিক আছে। প্রথমটি হল **তত্ত্ববিদ্যাগত**: প্রথমে কী আত্মপ্রকাশ করে — চৈতন্য না সত্তা? আর দ্বিতীয়টি হল **জ্ঞানতত্ত্বগত**: মানুষের চারপাশের পৃথিবী কি জ্ঞেয়?

আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি যে একজন সুসংগত বস্তুবাদী প্রকৃতির ভিতর থেকে চৈতন্যের আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী জ্ঞেয় কি না

সেই প্রশ্নেরও জবাব দেয়। বস্তুতপক্ষে, জীবন এবং পরবর্তীকালে তার সর্বোচ্চ কৃতিত্ব মানুষ **কীভাবে** আত্মপ্রকাশ করে, আমরা শুধু সেটাই ব্যাখ্যা করি না; জীবন ও চৈতন্য **কেন** আত্মপ্রকাশ করে সে প্রশ্নেরও আমরা উত্তর দিই। পৃথিবী সম্বন্ধে এক সঠিক জ্ঞান মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে এক অপরিহার্য শর্ত, এটা আবিষ্কার করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে মানুষ তা অবধারণা করতে পারে। বস্তুর মুখ্যতা সংক্রান্ত প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার পর, আমরা মানুষের পৃথিবীকে অবধারণা করার সামর্থ্য সংক্রান্ত প্রশ্নটিরই ইতিবাচক উত্তর দেওয়ার একটা সুযোগ পাই। তাই, এই দুটি প্রশ্ন এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে যুক্তিসংগত কারণেই আমরা সে দুটিকে একত্রে মেলাতে পারি এবং সে দুটিকে দর্শনের বুনিয়াদি বিষয়টির অঙ্গীয় অংশ বলতে পারি।

কিন্তু, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের দুটি দিকের মধ্যে যোগসূত্র নির্ণয় করা সব সময়ে তত সহজ নয়। কখনও কখনও ভাববাদীরা এই সরল সমস্যাটিকে ইচ্ছা করে জটিল করে তোলেন। কী কারণে? এবং কীভাবে?

ভাববাদীরা এই মত পোষণ করেন যে মানুষের আত্মার একটি দিকের বৈশিষ্ট্য হল অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা। এটি হল মানুষের 'ডক্টর ফাউস্ট' প্রকৃতি। মানুষের আত্মার আরেকটি দিক প্রতিফলিত হয় পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে হ্যামলেটের 'অভিশপ্ত' প্রশ্নগুলিতে: আমি কে, আমি কোথায় চলছি, নিয়তির নির্দেশের সামনে আমি নতিস্বীকার করব,

না লড়াই করব? একজন দার্শনিকের তা হলে কাকে অনুসরণ করা উচিত — যে শুধু মানুষের জ্ঞান সংক্রান্ত সামর্থ্যে আগ্রহী, সেই ফাউস্টকে, না পৃথিবীতে মানুষের স্থান নিয়ে যে চিন্তা করছে সেই হ্যামলেটকে? ভাববাদী দার্শনিকদের মত এই যে একজন দার্শনিক নিজের জন্য এই বুনিয়াদি প্রশ্নটির মীমাংসা করেন তাঁর আত্মার কোন দিকটি প্রাধান্যশালী তদনুযায়ী।

সমসাময়িক কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেন যে একটি নয়, দুটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁরা দাবি করে যে দৃষ্টবাদের প্রতিনিধিরা জ্ঞানতত্ত্বগত প্রশ্নটিতেই শুধু লিপ্ত — মানবিক জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করেন — মানুষের অবধারণা করার সামর্থ্য কীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে বিন্দুমাত্রও আগ্রহী নন।

প্রয়োগবাদীরা এই মত পোষণ করেন যে জ্ঞানের প্রশ্নটি অত্যন্ত বেশি সাধারণ, তাই সমস্ত দার্শনিকের কাছে তা আগ্রহজনক হতে পারে না। পৃথিবীকে কীভাবে অবধারণা করা যায় তা নয়, কীভাবে তার মধ্যে একটু আরামদায়ক কোণ খুঁজে পাওয়া যাবে, জীবনকে কীভাবে আরও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক করা যাবে, তাকেই তাঁরা নিজেরা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। অমীমাংসেয় রহস্যের কিনারা করার চেষ্টায় নিজেদের মাথা না ঘামানোই তাঁরা শ্রেয় করেন। একজন দার্শনিকের সত্যকে জানার চেষ্টা করা উচিত নয়, বরং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের সামনে যেসব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলিরই মোকাবিলা করা উচিত।

নয়া-টমপন্থীরা মনে করেন যে দার্শনিকদের এটা দেখানোর চেষ্টা করা উচিত যে প্রতিটি ঘাসের শিষ ও প্রতিটি ফুলের অস্তিত্ব, প্রতিটি মানুষ, প্রত্যেক রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানের শাখার, এবং সমগ্র মহাবিশ্বের অস্তিত্বই ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং আমাদের পৃথিবীতে তাঁর নিয়ত উপস্থিতি প্রমাণ করে।

অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন যে পৃথিবী জ্ঞেয় কি না এই প্রশ্নটি ওঠানো উচিত মানুষের আত্ম-জ্ঞানের প্রশ্নের রূপে কেননা আমাদের প্রত্যেকেই বাইরে বিদ্যমান পৃথিবীর চেয়ে বরং আমাদের অন্তর্জগতে, আমাদের 'অহং'-এই সর্বপ্রথমে আগ্রহী।

দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নটির এই খণ্ডবিক্ষিপ্তকরণের ফল কী? ধরে নেওয়া যাক, আমরা এই অভিমতের সঙ্গে একমত যে একজন দার্শনিক শুধু মানুষের আত্ম-অবধারণা আর তার মূল্যবোধের অভিমুখীনতা সনাক্তকরণের প্রশ্নেই আগ্রহী। কিন্তু আমরা কি সেই প্রশ্নটির কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি, যদি আমরা সচেতনভাবে নিষিদ্ধ করে রাখি এই ধরনের প্রশ্নকে: পৃথিবী, এবং তার অংশ হিসেবে মানুষ কীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে? এই পৃথিবীতে মানুষ কি একাকী, না সে প্রকৃতি ও সমাজের অংশ? ভাষান্তরে, আমরা যদি আত্মা বা বস্তুর মুখ্যতার প্রশ্নটির উপেক্ষা করতে চেষ্টা করি তা হলে মানুষকে আমরা প্রকৃতি ও অন্য লোকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে, অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে 'বঞ্চিত' করব। পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সমস্ত বহুবিচিত্র

সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলার পর আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না শুধু এই কথা ঘোষণা করা ছাড়া যে মানুষ সমাজের সঙ্গেও কোনোমতেই সম্পর্কিত নয়। শেকসপীয়র যদি হ্যামলেটকে এই ধরনের তুচ্ছ ব্যক্তিসত্তায় পরিণত করতেন, তা হলে এমন বিরাট শিল্পমূল্যসম্পন্ন একটি চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি সফল হতেন না। অথচ অস্তিত্ববাদীরা এই অবস্থানই আঁকড়ে থাকেন।

এই ধরনের দর্শন মানুষের সমস্যার **সামাজিক দিকটিকে** উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে উপেক্ষা করে, এইভাবে আমাদের কালের জরুরি প্রশ্নগুলির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যেকার, তার ক্রিয়াকলাপ ও পৃথিবীর রূপান্তরসাধনে তার নির্ধারিত লক্ষ্যের মধ্যেকার **পারস্পরিক সম্পর্ক** সম্বন্ধে চিন্তা করতে 'নিষেধ' করেন অস্তিত্ববাদী।

তাই, দার্শনিক সমস্যাগুলির গোটা প্রস্তুটিকে জ্ঞান ও আত্ম-জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির চারপাশে কেন্দ্রীভূত করে আমরা এমন কি সাধারণ জ্ঞানতত্ত্বগত সমস্যাগুলিও সঠিকভাবে সমাধান করতে পারব না। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার অর্থ হবে সামাজিক সংগ্রামের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করা এবং নানা বিশ্ববীক্ষা সংক্রান্ত জটিল সমস্যাগুলি সমাধানের সমস্ত প্রচেষ্টা বিসর্জন দেওয়া।

কিন্তু, বুনিয়াদি দার্শনিক প্রশ্নটিকে দুই বা আরও বেশি ভাগে ভাগ করার সমর্থকরা নিজেদের অবস্থানের যাথার্থ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাঁরা বলেন যে

পৃথিবীকে অবধারণা করার সম্ভাবনা বস্তু ও মনের মুখ্যতার সঙ্গে কোনোক্রমেই সম্পর্কিত নয়, কেননা ভাববাদীদের মধ্যে এমন বহু দার্শনিক আছেন যাঁরা স্বীকার করেন যে তাঁদের চারপাশের পৃথিবী জ্ঞেয়। প্রাচীনকালের মহান ভাববাদী দার্শনিক প্লেটো, এবং হেগেল দুজনেই মনে করতেন যে পৃথিবী জ্ঞেয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এটা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, দুই ধরনের ভাববাদ পরীক্ষা করে দেখা যাক — বিষয়ীমুখিতা ও বিষয়মুখিতা।

বাদ্যযন্ত্রহীন বাদক ও একটি উন্মাদ পিয়ানো

বিষয়মুখ ভাববাদীরা এই মত পোষণ করেন যে পৃথিবীর ভিত্তি হল আত্মা বা চৈতন্য। কিন্তু মানুষের চৈতন্য ত্রুটিহীন নয়। পৃথিবীর প্রহেলিকাগুলি কখনও কখনও তার মনের সাধ্যাতীত। সে সহজেই পরাস্ত হয় এবং অসুবিধার সামনে পশ্চাদপসরণ করে, এবং আবেগ প্রায়শই সুস্থ বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। মানুষ সহজেই ভুল করতে পারে এবং স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের সামনে নত হয়। অধিকন্তু, তার জীবন সংক্ষিপ্ত, তার মনকে সে তাই দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করতে পারে না। এমনভাবে বিচার করে বিষয়মুখ ভাববাদীরা। কিন্তু আরেক ধরনের বিচারবুদ্ধি আছে — পরম ও অতিপ্রাকৃত বিচারবুদ্ধি — মানুষের অস্তিত্বের আগে যা ছিল এবং যা চিরন্তনভাবে থাকবে। এই ত্রুটিহীন বিচারবুদ্ধির পক্ষে প্রকৃতির সমস্ত রহস্য, সমস্ত মানবিক

ভাগ্য খোলা। মানবমন হল স্বর্গীয় বিচারবুদ্ধির একটি কণা, এক পান্ডুর প্রতিফলন মাত্র।

তাই, পরম, স্বর্গীয় বিচারবুদ্ধি আছে **মানুষ থেকে স্বতন্ত্রভাবে, অর্থাৎ বিষয়গতভাবে,** আর স্বয়ং মানুষ ও সমগ্র পৃথিবী এই অতিপ্রাকৃত পরমাত্মার ক্রিয়াকলাপের ফল। এই হল বিষয়মুখ ভাববাদের সারকথা।

একজন **বিষয়ীমুখ ভাববাদীর** কাছেও মন বা বিচারবুদ্ধি হল বিদ্যমান সব কিছুর বুনিয়াদ। কিন্তু এখানে এক স্বর্গীয়, পরম, দৈব বিচারবুদ্ধির কোনো উল্লেখ নেই, কেননা বিষয়ীমুখ ভাববাদী মনে করেন যে মানুষের চারপাশের সমস্ত কিছুই তার নিজের মনের, তার নিজের কল্পনার উৎপাদ মাত্র, অর্থাৎ তা আছে শুধু বিষয়ীগতভাবে। বিষয়ীমুখ ভাববাদী এই বিষয়ে প্রত্যয়শীল যে প্রভাতে যখন তিনি জেগে ওঠেন, তখন সব কিছু দৃশ্যমান হয় এবং তিনি নিদ্রামগ্ন হলে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এই তত্ত্বের অনুসারী, ১৮শ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক **জর্জ বার্কলির** মতে, 'বিদ্যমান থাকার অর্থ উপলব্ধ হওয়া।'*

সমস্ত বিষয়ীমুখ ভাববাদীই যে এই রকম চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তা নয়। যেমন কান্ট মনে করতেন যে পৃথিবী বাস্তবিকই রয়েছে, তা নেহাৎ কল্পনার ফল নয়, কিন্তু তিনি এই মত পোষণ করতেন

---

* V. I. Lenin, *Materialism and Empirio-Criticism,* Collected Works, Vol. 14, p. 24 থেকে গৃহীত।

যে তার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। আমরা বলতে পারি শুধু আমাদের সংবেদনগুলির কথা, সেগুলির পিছনে কী আছে তার কথা নয়। যে সমস্ত বিষয়ীমুখ ভাববাদী চরম সব সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছন এবং বলেন যে বাস্তবে শুধু মানবচৈতন্য রয়েছে, তাঁদের বলা হয় **আত্মজ্ঞানবাদী**। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯শ শতাব্দীর জার্মান ভাববাদী দার্শনিক **আর্টুর শোপেনহাওয়ারের** মতবাদের বিশিষ্ট লক্ষণ হল চরম বিষয়ীমুখিতা; তিনি লিখেছিলেন যে পৃথিবীটা আমাদের কল্পনা। অতীতের একজন ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিক বলেছিলেন যে বিষয়ীমুখ ভাববাদের যুক্তি হল সেই পিয়ানোর যুক্তি, যে পাগল হয়ে গেছে এবং মনে করে যে নিজে-নিজেই সে বাজতে পারে, তার চাবিগুলিতে আঘাত করার মতো কেউ না থাকলেও। সেইভাবেই, একজন বিষয়ীমুখ ভাববাদী নিশ্চিত যে মানুষ চিন্তা করে, অনুভব করে ও কষ্টভোগ করে কোনো বাহ্যিক কারণ ছাড়াই।

এই ধরনের দর্শন কাণ্ডজ্ঞান-বিরুদ্ধ, মানুষের প্রাথমিক যুক্তি-বিরুদ্ধ। তা রীতিমত বিপজ্জনকও বটে, কেননা আমাদের সমগ্র জীবন যদি আমাদের নিজেদের কল্পনারই উৎপাদ হয়, তা হলে অধ্যয়ন করা, কাজ করা, লড়াই করার কোনোই অর্থ থাকতে পারে না। সব কিছু স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়, আর যে কোনো সংগ্রামই বাতচক্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

বিষয়মুখ ভাববাদের যুক্তিও কম উদ্ভট নয়। আমরা যদি একটি বাদ্যযন্ত্রের উপমা ব্যবহার করে চলি, তা

হলে বিষয়মুখ আত্মা হল সেই বাদক যে একটি 'পিয়ানো' (প্রকৃতি, পশু বা মানুষ) ছাড়াই বাজাচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, ভাববাদের পক্ষ গ্রহণ করলে একজন দার্শনিক কী বিস্ময়কর সব অভিমতে এসে পৌঁছন। আর পৃথিবীকে জানার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভাববাদ কী বলে?

একজন বিষয়মুখ ভাববাদী বলবেন: হ্যাঁ, অবশ্যই, পৃথিবীকে জানা যায় বই কি। কিন্তু 'জ্ঞেয়' কথাটিকে তিনি কীভাবে ব্যাখ্যা করেন তা দেখা যাক। প্লেটো মনে করতেন যে মানুষ জগৎকে অবধারণা করতে পারে, কিন্তু বস্তুর জগৎকে নয়, বরং বিশুদ্ধ ভাবের জগৎকে, যে সমস্ত বিশুদ্ধ ভাব সেই বস্তুকে সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে জীবন-সঞ্চার করে। খোদ মানবাত্মা একদা ভাবের এই জগতে বাস করত, তাই যে জগৎ আগে তাকে বেষ্টন করে ছিল তাকে 'স্মরণে আনা' তার পক্ষে সহজ। এইভাবে, একজন বিষয়মুখ ভাববাদীর কাছে 'জগৎ' বাস্তব নয়, বরং এক সুনির্দিষ্ট, ভাবগত জগৎ। মানব চৈতন্য সেই ভাবগত জগতের একটি অংশ বলে, অবধারণামূলক প্রক্রিয়াটি হল স্মরণের প্রক্রিয়া। সত্যের সন্ধানে বাস্তবকে অধ্যয়ন করা, অথবা তথ্যাদি সংগ্রহ, তুলনা, বিশ্লেষণ করে সেগুলির সামান্যীকরণ ঘটানো, কিংবা সন্দেহ প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষকে শুধু একটু চিন্তা করতে হবে — তা হলেই মহাবিশ্বের রহস্যের চাবি তার হাতে এসে যাবে।

একজন বিষয়ীমুখ ভাববাদীর পক্ষে তা আরও সরল। সমগ্র জগৎ যদি আমাদের সংবেদন, মন ও কল্পনার

উৎপাদই হয়, তা হল আমরা অবশ্যই সেই 'জগৎকে' — আমাদের চৈতন্য-সৃষ্ট রূপকল্পগুলির জগৎকে অবধারণা করতে সক্ষম। এ থেকে এটাই দাঁড়ায় যে বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর অবধারণা হল আত্ম-অবধারণা। বাস্তব, প্রকৃতি, সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের সমস্ত বৈচিত্র্য একজন বিষয়ীমুখ ভাববাদীর আগ্রহ জাগায় না: তার কাছে সেগুলির অস্তিত্বই নেই।

তাই আমরা দেখেছি যে বিষয়মুখ ও বিষয়ীমুখ উভয়প্রকার ভাববাদীই স্বীকার করে যে জগৎকে জানা যেতে পারে। কিন্তু কোন জগৎ? যে প্রকৃত জগতে আমরা বাস করি — বিবিধ দ্বন্দ্বে পূর্ণ এই সুন্দর, বিরাট জটিল জগৎ? না — তাঁদের 'নিজস্ব' জগৎ, ভাব ও সংবেদনের জগৎ, দার্শনিকরা নিজেরা যাকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করেছে। স্বভাবতই, অবধারণামূলক প্রক্রিয়াটি তাঁদের মতে অসাধারণ সরল হয়ে দাঁড়ায়: একজন বিজ্ঞানীর সামনে সাধারণত যত অসুবিধা দেখা দেয়, মানবচিন্তা যখন 'কঠোর' বাস্তবের মুখোমুখি হয় তখন যে সমস্ত সন্ধান আর সৃষ্টির যন্ত্রণা দেখা দেয়, সে সবই অস্তিত্বহীন। একজন ভাববাদীর কাছে এটা নিছক একটি ভাবের আরেকটি ভাবকে আবধ্যরণা করার ব্যাপার, সমগ্র অবধারণাই পর্যবসিত হয় আত্ম-জ্ঞানে।

একজন বস্তুবাদীর কাছে তা একেবারে পৃথক। সুসংগতভাবে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অবধারণা অত্যন্ত জটিল, দুরূহ ও অসীম এক প্রক্রিয়া। ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে, মানবজাতি প্রকৃতির রহস্যগুলি

উদ্‌ঘাটন করে। মানুষ তার নিজের চৈতন্য, ভাবনা ও সংবেদনকে অবধারণা করে না, বরং তার চৈতন্য, এবং সাধারণভাবে যে কোনো চৈতন্য থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান বিষয়গত পৃথিবীকে অবধারণা করে। এই পৃথিবীকে সঠিক জানার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে মানুষ আর বিষয়গত পৃথিবী বা বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান আবশ্যিক সম্পর্কের মধ্যে। এই প্রক্রিয়াটি অবশ্য 'স্মরণের' মধ্যে ঘটে না। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, জ্ঞানের প্রক্রিয়াটি হল পারিপার্শ্বিক বস্তুনিচয় বা ব্যাপারসমূহের এক প্রতিলিপি, এক ছাঁচ। আমরা সবাই জানি যে একটা প্রতিলিপি করা — তা একটি ছবিই হোক বা দলিলই হোক — রীতিমত কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া; প্রকৃতির এই ধরনের 'প্রতিলিপি' করা কোনো মতেই কম কঠিন নয়।

তাই আমরা দেখেছি যে খোদ পৃথিবীকে, তার অবধারণায় নিযুক্ত মানুষকে ও পৃথিবীকে জানার প্রক্রিয়াকে একজন ভাববাদী ও একজন বস্তুবাদী দেখে বিপরীত অবস্থান থেকে।

এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, **পৃথিবীকে জানার সম্ভাবনার প্রশ্নটি বস্তু ও চৈতন্যের মুখ্যতার প্রশ্নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ও সাক্ষাৎভাবে যুক্ত**। তাই, দর্শনের কোনো দুটি প্রশ্ন নেই; একটিমাত্র বুনিয়াদি প্রশ্ন আছে। দর্শনকে তার একত্ব ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা তাই বৃথা প্রচেষ্টা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

প্রকৃতি, মানুষ ও জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত বিচিত্র, এবং কখনও বা উদ্ভট কিছু ধারণা আলোচনা করেছি। এই ধারণাগুলির কি কোনো বুনিয়াদ আছে, না সেগুলি কিছু কিছু খামখেয়ালি ব্যক্তির উদ্ভট কল্পনা মাত্র এবং তাঁদের দিকে আমাদের এই দ্রুতগামী, কর্মব্যস্ত বিংশ শতাব্দীতে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন নেই?

পুরনো বস্তুবাদীরা মনে করতেন যে ভাববাদী ধ্যানধারণাগুলি নেহাৎ কতকগুলি আবোলতাবোল ব্যাপার, বিকৃত কল্পনার খেয়াল, সুতরাং সেগুলির বিরুদ্ধে গুরুত্ব সহকারে সংগ্রাম চালানো উচিত নয়। কিন্তু ভাববাদকে তো স্রেফ হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার মূল পর্যন্ত যাওয়া দরকার এবং দেখা দরকার কেন তা আজও পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছে।

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে দর্শনের মূল, তার আবির্ভাবের মূল, খুঁজে পাওয়া যাবে মানুষের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে, তার শ্রমে, তার প্রাত্যহিক জীবনে। বস্তুবাদ ও ভাববাদ — এই দুটি পরস্পরবিরোধী দার্শনিক ধারার আত্মপ্রকাশের 'ব্যবহারিক' কারণও আছে।

শ্রমের প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক মানুষ নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। তার পরে সে উপযুক্ত উপায়ের খোঁজ করে এবং সেগুলিকে প্রয়োগ করে তার ফল হিসেবে অর্জন করে নিজের কল্পিত জিনিসটি — তা একটা কোদাল

বা কুড়ুল হোক, নতুন জাতের পশু বা গমের ফলন যাই হোক না কেন। স্বভাবতই, কাজ করার সময়ে সে এই ধারণাটা করতে বাধ্য যে তার চারপাশের পৃথিবী রয়েছে তার থেকে স্বতন্ত্রভাবে, তা বিষয়গত, এবং একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্য তার দিক থেকে শারীরিক প্রয়াস দরকার, কিছুটা পরিমাণ কর্মশক্তি, এবং এক নির্দিষ্ট স্তরের জ্ঞান ও দক্ষতা দরকার। তবুও, সেই পৃথিবী অবধারণা করা সম্ভব, তাকে উন্নত করা ও মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে তাকে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব ঠিক সেইভাবে, যেভাবে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে কৃষিতে বা পশু-প্রজননে তাকে সাহায্য করার কাজে লাগায়, অথবা বিভিন্ন সাধিত্র উৎপন্ন করার জন্য প্রাকৃতিক পদার্থগুলিকে কাজে লাগায়।

এইভাবে মানুষ তার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে সমগ্র মহাবিশ্বে প্রয়োগ করে; প্রকৃতি তার কাছে এক অতিকায় কর্মশালা আর সে নিজে সেই কর্মশালায় একজন কর্মী। এই বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিই বস্তুবাদী ধ্যানধারণার সাক্ষাৎ অগ্রদূত।

মানুষের শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হল তার সত্যিকার সহকারী। সেই জন্যই, বস্তুবাদী দর্শন তার সিদ্ধান্তগুলির প্রমাণ সন্ধানে বিজ্ঞান থেকে নিয়তই আহরণ করে, বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলির উপরে প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে, এবং নিজের দিক থেকে, বিজ্ঞানকে সাহায্য করে। ২০শ শতাব্দীর অসামান্য পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক মনে করতেন যে বস্তুবাদী

অভিমত ফলপ্রসূ বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত, যদিও প্রকৃতির এক পরম বাস্তবতায় এই দৃঢ়, অটল বিশ্বাস একজন তদন্তকারীর কাজের এক স্বাভাবিক ও অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

বস্তুবাদের বিভিন্ন ধারার আত্মপ্রকাশ যে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত, সেটা আপাতিক ঘটনা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সূর্যকেন্দ্রিকতা সম্বন্ধে কোপারনিকাসের ধ্যানধারণা শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই নয়, বস্তুবাদী দর্শনেও এক 'বৈপ্লবিক কাজ' বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কোপারনিকাসের আমলে, পৃথিবীকে মহাবিশ্বের অনড় কেন্দ্র বলে মনে করা হত। গ্রহ, নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বিভিন্ন গগনমণ্ডলে পৃথিবীর চারপাশে চক্রাকারে ফেরে বলে মনে করা হত। 'উপচান্দ্র' জগতে, অর্থাৎ পৃথিবীতে, সব কিছুকে মনে করা হত সাময়িক ও ত্রুটিপূর্ণ, পক্ষান্তরে 'অতিচান্দ্র' জগতে সব কিছুকে বলা হত চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় ও ত্রুটিহীন।

ভূকেন্দ্রিক মতবাদকে খণ্ডন করার অর্থ ছিল পৃথিবীকে অনেকগুলি গ্রহের একটিতে পরিণত করা এবং প্রতিটি নিজস্ব নিয়ম-শাসিত 'উপচান্দ্র' ও 'অতিচান্দ্র'-তে জগতের বিভাজন দূর করা। বিশ্বকে এইভাবে স্বীকার করা হয়েছিল একটিমাত্র সমগ্র হিসেবে। কোপারনিকাস মহাবিশ্বের সীমানা 'সম্প্রসারিত' করেছিলেন এবং স্থানে বিশ্বের অনন্ততা প্রতিপাদন করার পথ প্রদর্শন করেছিলেন।

সূর্যকেন্দ্রিকতা জ্ঞানের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত দার্শনিক

ধারণাগুলিকে সুনির্দিষ্ট করাও সম্ভব করেছিল এই জিনিসটা দেখিয়ে যে প্রকৃত জ্ঞান এমনভাবে চোখের উপরে পড়ে থাকে না যে মানুষ এসে সেটা তুলে নেবে, বরং তা নিষ্কাষণ করে নিতে হয় বাহ্যিক ব্যাপারসমূহের পিছনে বস্তুনিচয়ের অন্তঃসার উদ্ঘাটন করে। কোপারনিকাস-কৃত আবিষ্কার এইভাবে প্রকৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে বস্তুবাদী অভিমত প্রতিপন্ন ও বিকশিত করার কাজে লেগেছিল।

১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বস্তুবাদী দর্শনের অধিযন্ত্রবাদী রূপটির আত্মপ্রকাশের অন্যতম কারণ ছিল যন্ত্রনির্মাণবিদ্যার ক্রমবিকাশ। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীতে, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের অগ্রগতি ঘটায় গড়ে ওঠে বস্তুবাদের আরেকটি, উচ্চতর রূপ — দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।

বস্তুবাদ নির্ভর করে যুক্তি, বিজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের উপরে; কিছু মাত্রায় সংশয় বা সন্দেহে তা সর্বদাই পরিব্যাপ্ত থেকেছে। অবিশ্বাস, বস্তুনিচয়ের ও ব্যাপারসমূহের মূল সম্বন্ধে অনুসন্ধান, যাচাই ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পীরক্ষা — এগুলি হল বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত বৈশিষ্ট্য। সেখান থেকেই আসে ধর্মীয় মতবাদগুলি সম্বন্ধে সমালোচনাত্মক মনোভাব। খ্রীষ্টান ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানী **তের্তুলিয়ান** বলেছিলেন: 'আমার তার প্রতি বিশ্বাস আছে কারণ তা উদ্ভট।' প্রতিতুলনায়, একজন বস্তুবাদী বলে যে তা যদি উদ্ভট হয় তবে ঠিক হতে পারে না, তাই সে সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টায় একটা দ্বন্দ্বের

সন্ধান করতে শুরু করে। একটি সমালোচনাত্মক মনই সকল কালের ও সকল জাতির বস্তুবাদীদের বিশিষ্ট লক্ষণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদীদের (**লোকায়তিক**) সম্বন্ধে **জওহরলাল নেহরু** লিখেছেন: 'বস্তুবাদীরা চিন্তায়, ধর্মে ও ঈশ্বরতত্ত্বে কর্তৃত্বকে ও সমস্ত কায়েমি স্বার্থকে আক্রমণ করেছিলেন। বেদ ও পুরোহিততন্ত্র ও চিরাচরিত বিশ্বাসগুলিকে তাঁরা সমালোচনা করেছিলেন, এবং ঘোষণা করেছিলেন যে বিশ্বাস অবশ্যই হবে মুক্ত এবং পূর্বানুমানের উপর কিংবা অতীতের কর্তৃত্বের উপারে নির্ভর করবে না। সর্বপ্রকার ইন্দ্রজাল ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা আক্রমণ চালিয়েছিলেন।'* ১১শ শতাব্দীর মহান প্রাচ্য কবি, বিজ্ঞানী ও চিন্তানায়ক **ওমর খৈয়মও** একই কথা প্রকাশ করেছিলেন:

মসজিদে আর গীর্জায় আর দেবগণের মধ্যে,
দোজখকে সব ভয় পায় আর বেহেশ্‌তে দেখে স্বপ্নে।
কিন্তু যে-জন জট খুলেছে বিশ্ব-প্রহেলিকার
আগাছাকে জন্মাতে সে দেয়নি কো তার মনে।**

এইভাবে চিন্তন আরও সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছিল, জ্ঞানার্জনের উপায়গুলি আরও পরিশীলিত হয়েছিল

---

* Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India*, Asia Publishing House, Bombay, 1964, p. 100.

** ওমর খৈয়ম। দুশানবে, ইরফন প্রকাশন, ১৯৭০, পৃঃ ১০৯ (পারসিক ভাষায়)।

এবং সূত্রায়িত হয়েছিল বাস্তব সম্বন্ধে এক সুসমঞ্জস বস্তুবাদী অভিমত।

কিন্তু ভাববাদও আকাশ থেকে পড়ে নি। মানুষের সেই একই ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ তার জন্মেও এক নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তা 'নেতিবাচক' অর্থে। মানুষ যা অর্জন করতে চায় তা অর্জন করতে সব সময়ে সফল হয় না। এ কথা বিশেষভাবেই সত্য ছিল প্রাচীনকালে, যখন প্রারম্ভিক দার্শনিক ধ্যানধারণাগুলি রূপ পরিগ্রহ করছিল। তার জীবনে দেখা দিয়েছিল প্রচুর দুর্ভাগ্য। প্রায়শই সে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হত এবং যার সামনে এসে সে বাধা পেত, তার সব কিছু সে ব্যাখ্যা করতে পারত না। কেন একজন মানুষকে কাজ করতে হয় অথচ আরেকজনকে করতে হয় না? এই বিশেষ বন্দোবস্ত কে প্রতিষ্ঠা করেছে? মানুষ জীবিত থাকে, চিন্তা করে, কষ্ট ভোগ করে, খুশি হয় এবং হঠাৎ মারা যায়। মানুষ মারা যাওয়ার পর তার আত্মা কোথায় যায়?

প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষের অসহায়তা, মৌল গুরুত্বপূর্ণ বহু সমস্যা সমাধানে তার ব্যর্থতা এবং জীবনের রহস্যগুলি ব্যাখ্যায় তার ব্যর্থতা তাকে চালিত করেছিল অবলম্বনের জন্য এক পরাক্রান্ত, 'পরম', আদর্শ ভাবগত ক্ষমতার শরণাপন্ন হতে। এই ধরনের মানুষের কাছে প্রকৃতি সেই কর্মশালা নয় যেখানে সে একাধারে প্রভু ও শ্রমিক, বরং তা হল অন্যদের নির্মিত এক গীর্জা, যেখানে সে অল্পকালের জন্য আসে বিনম্র আবেদনকারী হিসেবে, ভিক্ষুক

হিসেবে। তাই আমরা দেখেছি যে মানুষের ক্রিয়াকলাপ বস্তুবাদী ও ভাববাদী উভয়প্রকার অভিমতেরই জন্ম দেয়। প্রথম ক্ষেত্রে, নির্ধারক হল মানুষের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — তার দুর্বলতা।

মার্কস লিখেছেন: '...দার্শনিকরা জমি থেকে ছত্রাকের মতো গজিয়ে ওঠেন না; তাঁরা তাঁদের কালের, তাঁদের জাতির উৎপাদ, যার সবচেয়ে সূক্ষ্ম, মূল্যবান ও অদৃশ্য রস প্রবাহিত হয় দর্শনের ধ্যানধারণার মধ্যে। যে অন্তরাত্মা শ্রমিকদের হাত দিয়ে রেলপথ নির্মাণ করে, সেই একই অন্তরাত্মা দার্শনিক মতবাদ নির্মাণ করে দার্শনিকদের মস্তিষ্কে।'*

মানুষ অতীতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল, বর্তমানেও হয়। আমাদের চারপাশের জগৎ এত জটিল ও বহুমুখী যে আসল অবস্থা কখনও কখনও আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। শৈশবকাল থেকে আমরা বহুবিধ ধ্যানধারণা ও আদর্শ শিখি। কর্তব্য, সম্মান, ন্যায়বিচার আর আইন প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা শিখি, অধ্যয়ন করি যুক্তিবিদ্যা আর গণিতের নিয়ম। কিন্তু এই সমস্ত ধ্যানধারণা ও আইন, এই সমস্ত নিয়ম ও প্রথা আসে কোথা থেকে? সত্যি কি আমরাই এই সব কিছু উদ্ভাবন করেছি? এগুলি প্রতিষ্ঠা করে থাকতে পারে এমন কোনো ব্যক্তির নাম আমরা বলতে পারি না;

---

* Karl Marx, *The Leading Article in N° 172 of the 'Kölnische Zeitung'* in: Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Vol. 1, p. 195.

সেই সঙ্গে, ভাববাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, যদিও তা বস্তুবাদের ছদ্মবেশে নিজেকে গোপন করে এবং দাবি করে যে তা ভাববাদ ও বস্তুবাদ উভয়েরই 'ঊর্ধ্বে'। বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রাম কি চিরকাল চলবে? ,

পার্থিব ঝঞ্ঝার 'স্বর্গীয়' প্রতিধ্বনি

ভাববাদ যে নাছোড় হয়ে নিজের অবস্থানগুলি আঁকড়ে থাকে, তার কারণ, অংশত, সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্বগুলি। আজ ভাববাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে শুধু জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ায় ও শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপে, এবং সামগ্রিকভাবে জীবনে মানুষের সামনের অসুবিধাগুলির দরুনই নয়। স্মরণাতীত কাল থেকে, এমন কিছু শক্তি ছিল ও আছে, **যারা ভাববাদী দর্শন প্রচার করে মুনাফা করে।** দীর্ঘকাল ধরে সমস্ত মানবজাতি বিভক্ত ছিল জমি ও কাজের উপকরণের মালিক উঁচু-মহলের বাছাই সমাজ এবং যারা কিছুরই মালিক ছিল না সেই নিপীড়িত, বঞ্চিতদের মধ্যে। দাস-মালিক, সামন্ত প্রভু, আর পুঁজিপতি তাদের ক্ষমতা ও সম্পদ বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল শুধু কামান আর বন্দুক, সেনাবাহিনী আর কারাগারের সাহায্যেই নয়। দরিদ্র ও ধনীতে, নিপীড়িত ও নিপীড়নকারীতে বিভক্ত এক সমাজে দর্শন, ধর্ম, এমন কি শিল্পকলাকেও আত্মিক বলপ্রয়োগ ও শ্রেণী আধিপত্যের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছিল। খুব স্বাভাবিক কারণেই প্লেটো এই মত

পোষণ করতেন যে মানুষ অক্রিয় বস্তুর দ্বারা, যা কিছু স্বতঃস্ফূর্ত, নীচ ও স্থূল তার দ্বারা পরিবেষ্টিত, আর বস্তুর মধ্যে প্রকৃত শৃঙ্খলা প্রবর্তিত হয় ভাবের দ্বারা। ভাবই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ বস্তুকে সুসমঞ্জস অবস্থায় আনে; এমন ভাব যেভাবে বস্তুজগতের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রবর্তন করে, অভিজাতদেরও সেইভাবে জনসাধারণকে শাসন করতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে একজন দার্শনিক প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বন্দোবস্তকে যেন 'প্রতিপন্ন' করেন, এবং জোর দিয়ে বলেন যে তাকে পরিবর্তন করা অসম্ভব।

কালক্রমে, হানাদারদের আঘাতে আঘাতে প্রাচীন সমাজ ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল; দাসদের অভ্যুত্থান আর অর্থনৈতিক অবক্ষয়ে তা ভিতর থেকেও দীর্ণ হয়েছিল। ক্ষমতাসীনরা বুঝতে পেরেছিল যে ইতিহাসের গতিধারা বিপরীতগামী করা অসম্ভব এবং তারা টের পেয়েছিল যে শাসনের রজ্জু তাদের হাত থেকে খসে পড়ছে। সেই কালপর্বে, তারা 'সান্ত্বনা' পেয়েছিল বিষয়ীমুখ ভাববাদী মতবাদের মধ্যে: সব কিছু বিস্মৃতির গহ্বরে চলে যাবে, সুখভোগ ছাড়া সব কিছুই মায়া। কিংবা, বিপরীতভাবে, আমাদের সমস্ত কামনাবাসনাই অসার, মানুষ কখনোই প্রকৃত সুখী হতে পারে না, তাই আমরা অবশ্যই তার প্রয়োজনকে কমিয়ে এক ন্যূনতম মাত্রায় আনব এবং এক তপস্বীর জীবন, সুখদুঃখে নির্বিকার সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করব। ক্ষমতা, সুখ বা সম্পদ কিছুই এই জগতে মানুষের আয়ত্তে নয়। সেগুলির অস্তিত্বই নেই!

আজকের বুর্জোয়া সমাজে, বিষয়ীমুখ ভাববাদী অভিমতগুলি প্রতিযোগিতায় নিঃশেষিত পেটি বুর্জোয়াদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। এই সমস্ত অভিমত, সাফল্য ও সম্পদের প্রয়াস থেকে, সত্যের সন্ধান ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়। প্রয়োগবাদের বিষয়ীমুখ ভাববাদী দর্শন এই মত পোষণ করে যে একমাত্র আসল কথা হল জীবনে সামান্য কিছু সৌভাগ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা।

সাধারণত, ভাববাদ ধনীদের স্বার্থ প্রকাশ করে, তার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে ও তাকে রক্ষা করে। তবুও, প্রকৃত অবস্থায় যারা হতাশ হয়েছে এবং তাকে পরিবর্তন করতে চায়, তারাও কখনও কখনও ভাববাদে নিমগ্ন হয়। কিন্তু ভাববাদী দর্শন কি সমাজের রূপান্তরের মহৎ কর্মাদর্শে সত্যিই সাহায্য করতে সক্ষম?

১৮শ শতাব্দীর শেষে ও ১৯শ শতাব্দীর গোড়ায়, জার্মানির আপেক্ষিকভাবে পশ্চাৎপদ এক অর্থনীতি ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধনের যে ধারণা ফরাসী বিপ্লব থেকে জন্মলাভ করেছিল, তা খুবই সজীব ছিল। বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ প্রকাশকারী নবীন জার্মান বুদ্ধিজীবিসমাজ আমূল সামাজিক সংস্কারকর্ম চাইছিল। কিন্তু, সমাজের বাস্তব রূপান্তরসাধনের শক্তির অভাব ছিল তাদের, কেননা জনসাধারণের মধ্যে তাদের প্রতি সমর্থন ছিল না, এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তিগুলির পক্ষাবলম্বী রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল অতি প্রবল। তাই

একটাই মাত্র পথ ছিল — সেই পৃথিবীকে পুনর্নির্মাণ করা... কল্পনায়, গড়ে তোলা এমন এক দর্শন, এক ভাবগত জগৎ, যেখানে বাস্তব জগৎ পরিত্যক্ত হবে। এই ধরনের ভাববাদী দর্শন সৃষ্টি করা হয়েছিল (**ইয়োহান ফিখ্‌টে, ফ্রিডরিখ শেল্লিং, গিওর্গ হেগেল**), কিন্তু পৃথিবীকে প্রকৃতই ঢেলে সাজানোর কাজে তা খুব সামান্যই সাহায্য করেছিল, কেননা বাস্তব সমস্যাগুলিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ভাবের জগতে।

বিপরীতপক্ষে, ফ্রান্সে বস্তুবাদী ধ্যানধারণা অনুপ্রাণিত করেছিল সেই বুর্জোয়াদের, যারা ফরাসী বিপ্লবের আগে ক্ষমতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছিল। বুর্জোয়া সমাজ তখনও পর্যন্ত সংকট আর বেকারির দুর্ভাগ্য ভোগ করে নি। শ্রমিক শ্রেণী ছিল অত্যন্ত দুর্বল ও স্বল্প সংগঠিত। বুর্জোয়ারা তখনও বিশ্বাস করত যে পুঁজিবাদী সমাজ মানুষের সামনে সীমাহীন সুযোগ খুলে দেয়, এবং তারা এই ঘটনাটি সম্বন্ধে সচেতন ছিল না যে তাদের ভবিষ্যৎ কবর-খনক — জায়মান প্রলেতারিয়েত — দৃশ্যপটে আবির্ভূত হতে চলেছে। তখনও তারা কর্মোৎসাহ ও ইচ্ছাশক্তিতে ভরপুর ছিল, পূর্ণ ছিল আশায়। কিন্তু, পুঁজিবাদ যখন জয়লাভ করল, তার 'অন্ধকার' দিকগুলি অচিরেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। বস্তুবাদী দর্শন ক্রমে ক্রমে একটা বিপজ্জনক রূপ নিয়েছিল পুঁজিবাদের পক্ষে। সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজে সহজাত অমীমাংসেয় দ্বন্দ্বগুলি যত বেশি নির্ণয়যোগ্য হয়ে ওঠে, পশ্চিমে

তত বেশিসংখ্যক ভাববাদী দার্শনিক ধারা গজিয়ে ওঠে।

তাই, **বস্তুবাদী দর্শন সর্বদাই প্রকাশ করেছে অগ্রগামী সামাজিক শক্তিগুলির স্বার্থকে, এবং ভাববাদী দর্শন হল জনসমষ্টির সুবিধাভোগী অংশগুলির, তাদের অধিকারের, তাদের জীবনযাপন প্রণালীর ও তাদের 'স্বাধীনতাগুলির' প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রবক্তা।**

কিন্তু, প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, বস্তুবাদকে জনসাধারণ কি সর্বদা তাদের 'নিজেদের' দর্শন বলে গণ্য করেছে? বস্তুতপক্ষে জনগণ, ক্রীতদাস, কৃষক, কারুকর্মী ও ক্ষুদ্র কারবারিরা কখনও কখনও বস্তুবাদী দর্শনের, কিংবা বলতে কি যে কোনো ধরনের দর্শনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনই ছিল না বলা চলে। বস্তুতই, হাড়ভাঙা খাটুনিতে পরিশ্রান্ত এক ক্রীতদাস, দিন-রাত ক্ষেতে কাজ করা কৃষক, কিংবা একদিনেরও বিরতি না পাওয়া একজন মজুরের কী সম্পর্কই বা থাকতে পারত দর্শনের সঙ্গে। যে দর্শন তাদের মুক্তির পথ দেখাতে পারত তা ছিল শ্রমজীবী জনগণের নাগালের বাইরে। তবুও, নিজের পদদলিত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন একজন ক্রীতদাস ইতিমধ্যেই তার মুক্তির পথে রয়েছে।

সমসাময়িক পুঁজিবাদী সমাজে, শ্রমিকরা সংগঠিত হয় বড় বড় কর্ম-সংঘে; তারা কিছুটা জ্ঞান ভোগ করে, তাদের ব্যাপকতর আগ্রহ থাকে এবং বেশি অবসর সময় থাকে। সুতরাং, তাদের বস্তুবাদী দর্শন অধ্যয়ন করার সম্ভাবনা এখন অনেক বেশি। ১৯১৭-র অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের আগে, বহু শ্রমিক গোষ্ঠী সংগঠিত করা হয়েছিল বস্তুবাদী দর্শন সমেত সামাজিক

বিজ্ঞানগুলি অধ্যয়ন করার জন্য। এইভাবে, **সমসাময়িক সমাজে ব্যাপক জনসাধারণের পক্ষে বস্তুবাদী দর্শন আয়ত্ত করার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়।** অগ্রগামী সামাজিক শক্তিসমূহ আর অগ্রসর দর্শনের মধ্যে মিলন এই নিশ্চিতি দেয় যে ন্যায়বিচার ও মানবিকতার নীতি অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তিত হবে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারাই **সর্বপ্রথম** দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন, তার গঠনবিন্যাস প্রকাশ করেছিলেন, এবং এইভাবে বিভিন্ন দার্শনিক ধারা, প্রবণতা ও তত্ত্বের মূল্যায়নের এক মানদণ্ড যুগিয়েছিলেন। প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদীদের যেটা নমুনাসই ছিল, বস্তুর ব্যাখ্যানে সেই রকম কোনো পক্ষপাতপূর্ণ ঝোঁক, মার্কসবাদের কাছে পরক। বস্তুকে সংবেদনের মধ্য দিয়ে আমাদের দ্বারা পরিলক্ষিত এক বিষয়গত বাস্তব হিসেবে বর্ণনা করে, মার্কসবাদই **সর্বপ্রথম** বস্তুবাদী অবস্থান থেকে চেতন ও অচেতন প্রকৃতির ঐক্যের সমস্যা, এবং প্রকৃতি ও সমাজের ঐক্যের সমস্যা সমাধান করেছিল। চিন্তন ও সত্তার মধ্যেকার সম্পর্কের যে সরলীকৃত ব্যাখ্যায় মানুষের মনকে শুধু বস্তুগত প্রক্রিয়াসমূহে পর্যবসিত করা হয়েছিল, মার্কসবাদ তা বর্জন করেছে এবং প্রতিপাদন করেছে -- আবারও **সর্বপ্রথম** -- বস্তুর ক্রমবিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে চৈতন্যের আত্মপ্রকাশের ধারণা। এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে বিকাশের ধারণার সঙ্গে বস্তুবাদের অঙ্গাঙ্গী মিলনের ফলে।

৩। পৃথিবীর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দুটি মত

আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ পৃথিবী নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, চলছে ও বিকশিত হচ্ছে। তা দেখা যায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, বিজ্ঞান, মানবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে। এই পরিবর্তনগুলির কতকগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, পক্ষান্তরে অন্যগুলি জনগণ, রাষ্ট্র, মানবজাতি ও সামগ্রিকভাবে প্রকৃতির পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। অনন্ত মহাবিশ্ব রয়েছে নিয়ত গতির মধ্যে; গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, নক্ষত্ররাজি জন্মায় ও নির্বাপিত হয়। আমাদের ভূমণ্ডল, পৃথিবীও পরিবর্তমান: নানা দ্বীপ ও পাহাড় দেখা দেয়, আগ্নেয়গিরিগুলি অগ্ন্যুদ্গার করে, ভূমিকম্প হয়, সমুদ্রতট ও নদীতীরের

বহিঃরেখার অদলবদল হয়, উদ্ভিদ ও জীব জগতেরও রূপান্তর ঘটে। লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে মানুষ ও সমাজের মধ্যেও, আদিম যুথ থেকে সমাজতন্ত্রের তার ক্রমবিকাশে দীর্ঘ পথ সে অতিক্রম করেছে। পৃথিবীর মানচিত্রও বদলাচ্ছে: যে সমস্ত দেশের উপরে আগে স্প্যানিশ, ফরাসী, ব্রিটিশ ও পোর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা শাসন চালাত, সেগুলি মুক্তি অর্জন করে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, যেমন — ভারত, আফগানিস্তান, কিউবা, ইথিয়োপিয়া, আঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও আরও অনেক দেশ।

পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য, তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে নিজের লক্ষ্য ও প্রয়োজনগুলি অনুযায়ী তাকে পরিবর্তন করার জন্য, মানুষকে পৃথিবীর বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করতে হয়। এমন কি প্রাচীনকালেও, লোকে এই ধরনের সব প্রশ্নে আগ্রহী ছিল, যেমন: পৃথিবী কী, সেখানে কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটছে? বস্তুসমূহের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? পৃথিবী গতিশীল কেন, সেই গতির সংঘটক কী? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য বাবিলোনীয় পুরোহিতরা গ্রহগুলির গতি পর্যবেক্ষণে এবং সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ বর্ণনার কাজে বহু বছর কাটিয়েছিলেন। পর্যবেক্ষণ ও বর্ণন থেকে মানুষ এগিয়ে গিয়েছিল পৃথিবী সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞানের সন্ধানের দিকে — তারা চেষ্টা করেছিল তাকে ব্যাখ্যা করতে। প্রাচীন চিন্তকরা অনুভব করেছিলেন যে পৃথিবীতে গতির ভূমিকা বিবেচনা না করে পৃথিবীকে বোঝা অসম্ভব।

সুতরাং 'গতি কি আছে?' এই প্রশ্নটি সম্পূরিত হয়েছিল আরও একটি প্রশ্ন দিয়ে: এই গতির কারণ কী? এবং সেটা ছিল আরও একটি ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যা উপস্থিত করার সমান। দর্শনের বেলায় প্রায়ই যা ঘটে থাকে, বিভিন্ন মতামত ও উত্তর পাওয়া গিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আরিস্ততল মনে করতেন যে গতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার অবশ্যম্ভাবী ফল হল প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা। গতির সারমর্ম, তার কারণ ও উৎস ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করার দুটি ধরন। এর ফলে, পৃথিবীকে দেখার ব্যাপারে গড়ে উঠেছিল দুটি বিপরীত পদ্ধতি — ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যা। এই দুটি পদ্ধতির প্রত্যেকটির অন্তঃসার বিচার করার এবং এ দুটির কোনটি উপরোক্ত প্রশ্নগুলির সত্যিকার বিজ্ঞানসম্মত উত্তর যোগায় তা নির্ণয় করার চেষ্টা করা যাক।

ডায়ালেকটিকস কী?

'ডায়ালেকটিকস' শব্দটি দিয়ে গোড়ায় বোঝানো হত বিভিন্ন মতের বিরোধের মধ্য দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে কথোপকথন চালানোর বিদ্যা। প্লেটো একজন ডায়ালেকটিশিয়ানকে বর্ণনা করেছেন এমন একজন মানুষ বলে, যিনি প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে জানেন, যিনি একটি জিনিস বা ব্যাপারের একটি সংজ্ঞার্থ প্রস্তাব করেন সেটিকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার

আপত্তি দিয়ে আক্রমণ করার পর এবং এইভাবে সত্যে এসে পৌঁছন। কিন্তু এইসঙ্গে তাঁর পক্ষে ডায়ালেকটিকস হল সত্য বোঝার সহায়ক ধারণাগুলির সঠিক মিলন ও বিচ্ছিন্নতা। একজন মহান ডায়ালেকটিশিয়ান ছিলেন সক্রেটিস, যিনি তাঁর সারা জীবন অনুসন্ধানী কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সত্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। এই ধরনের কথোপকথন চলাকালে সক্রেটিস প্রশ্ন করতেন, উত্তরগুলি খণ্ডন করতেন, নানা রকম প্রকারভেদ উপস্থিত করতেন, সন্দেহ প্রকাশ করতেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের অভিমতে স্ববিরোধগুলি উদ্ঘাটন করতেন। এক কথোপকথন চালানোর, বিপরীত মতগুলি তুলনা করে, বিশ্লেষণ করে ও খণ্ডন করে সত্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টার এই পদ্ধতিকে বলা হত ডায়ালেকটিকস। পরবর্তীকালে, এই কথাটি দিয়ে একেবারে ভিন্ন একটা কিছুর অর্থ প্রকাশ পায়।

'সফিস্ট' শব্দটিতে গোড়ার দিকে বোঝাত 'বিজ্ঞ ব্যক্তি' বা 'ওস্তাদ'। সামান্য বেতন নিয়ে যাঁরা বিতর্ক-কলা শেখাতেন সেই বিজ্ঞ ও বাকপটু শিক্ষাদাতাদের বলা হত সফিস্ট। এঁরা, প্রথম বেতন-প্রাপ্ত শিক্ষকরা, তাঁদের শিক্ষার্থীদের শেখাতেন 'চিন্তা করতে, বলতে ও কাজ করতে'। কিন্তু তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কোনো কথোপকথনে যে কোনো উপায়ে অপর পক্ষের উপরে আধিপত্য লাভ করা। সব ধরনের কৌশল, এমন কি প্রতারণাও ব্যবহার করা চলত। সফিস্টরা মনে করতেন যে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে

কোনো উপায় ব্যবহার করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন সফিস্ট তাঁর কথাবার্তাকে মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ করে ফেলতে পারেন, কেননা তিনি জানেন যে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা ঠিকভাবে অনুসরণ করা কঠিন; তিনি খুব দ্রুত কথা বলতে পারেন অথবা তর্ক চালিয়ে যাওয়ার মতো সময়ের অভাবের অজুহাত দিতে পারেন। তাঁর প্রতিপক্ষকে তিনি উত্যক্ত করে খেপিয়ে দিতে পারেন, কেননা তিনি ভালোভাবেই জানেন যে একজন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি তর্কের যুক্তিগত পারম্পর্যের দিকে খেয়াল রাখতে পারে না।... একজন সফিস্ট জয়ী হতে চান, যে কোনো মূল্যে প্রমাণ করতে চান যে তিনিই ঠিক। সুতরাং তিনি কখনও কখনও প্রকৃত সম্পর্কের জায়গায় মেকি সম্পর্ককে বসান, নিজেকে পরিণত করেন এক ভোজবাজিবিশারদে, যিনি সফিজম্ বা কুতর্কের আশ্রয় নিয়ে যে কোনো মতকে রক্ষা করা বা তুলে ধরার দায়িত্ব নেন। জনৈক প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক, **মিলেটাসের ইউবুলিডিস** কতকগুলি কুতর্ক চিন্তা করে বার করেছিলেন। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল: তুমি যা হারাও নি তা তোমার কাছেই আছে। কিন্তু তুমি শিং হারাও নি, অতএব তোমার শিং আছে।

কিংবা আরেকটি দৃষ্টান্ত। ইলেকট্রা জানে অরেস্টাস তার আপন ভাই; কিন্তু এখন সে ইলেকট্রার সামনে দাঁড়িয়ে আছে 'আবৃত হয়ে', এবং যে আবৃত হয়ে আছে তাকে ইলেকট্রা ভাই বলে জানে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল — ইলেকট্রা যা জানে তা জানে না।

যুক্তির সারমর্মটা দাঁড়ায় এই: মানুষ কিছু জানুক বা না জানুক, সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া তার উচিত নয়। সে যদি জানে, তবে তার কোনো প্রয়োজন নেই; আর যদি সে না জানে, তা হলে সে জানে না সে কিসের সন্ধান করতে চলেছে।* এখানে আমরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের বৈপরীত্য দেখতে পাচ্ছি, যার ফলে একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আরও একটি দৃষ্টান্ত: প্রাচীন কালের এক বিজ্ঞ চৈনিক, গুন্‌সুন লু তার সাদা ঘোড়া নিয়ে একটা সীমান্ত অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। ঘোড়া নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করা নিষিদ্ধ ছিল বলে, সীমান্তরক্ষীর সঙ্গে তাঁর এই রকম যুক্তিতর্ক হল:

'একটা ঘোড়া চেসনাট ঘোড়া হতে পারে।

'কিন্তু একটা সাদা ঘোড়া চেসনাট ঘোড়া হতে পারে না।

'অতএব, একটা সাদা ঘোড়া ঘোড়াই নয়।'

এই কথার যুক্তিতে সীমান্তরক্ষী এত অভিভূত হয়ে পড়ল যে বিজ্ঞ ব্যক্তিটিকে সে ঘোড়ার চেপে সীমান্ত অতিক্রম করতে দিল।

একজন সফিস্ট বা কুতার্কিক জীবন সম্বন্ধে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে: বস্তুতপক্ষে, সে প্রবঞ্চনার পূজারী। উপযোগিতার নীতিকেই মানুষের

---

* ডায়োজেনিস লায়েরটিয়াস। গ্রীক দার্শনিকদের জীবন, মতবাদ ও উক্তি প্রসঙ্গে। মিস্‌ল প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯, পৃঃ ১৩৮ (রুশ ভাষায়)।

আচরণের মূল্যায়ন করার একমাত্র মানদণ্ড বলে মনে করা হয়; সুতরাং, সমস্ত কার্য অবশ্যই চালিত হবে তিনটি উদ্দেশ্যের দ্বারা: সুখভোগ, মুনাফা ও মর্যাদা। ন্যায়বিচার সম্বন্ধে সফিস্টের ধারণা: প্রবলের লাভ ছাড়া তা আর কিছুই নয়। আমরা দেখেছি, সফিস্ট্রি বাস্তবকে বিকৃত করে; তা ডায়ালেকটিকসের বিরোধী, যদিও তা ডায়ালেকটিকসের বাহ্যিক রূপটি ধারণ করার চেষ্টা করে।

একজন সফিস্টের চালানো কথোপকথনের অননুরূপভাবে, একজন ডায়ালেকটিশিয়ানের চালানো কথোপকথনের লক্ষ্য হল যুক্তির দার্শনিক কলার সাহায্য নিয়ে সত্য খুঁজে বার করা। দ্বান্দ্বিক চিন্তানায়ক সক্রেটিসের উক্তি বলে এই কথাটি উল্লেখ করা হয়: 'আমি শুধু জানি যে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু আমি জ্ঞানলাভের জন্যে প্রয়াস করছি।'

সব কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে

পৃথিবীতে সব কিছু যে পরিবর্তিত হচ্ছে এই বিষয়টা প্রাচীন দার্শনিকরা তখনই লক্ষ করেছিলেন। হেরাক্লিটাসের অভিমত অত্যন্ত ব্যাখ্যাকর। এই প্রাচীন বস্তুবাদীকে একজন বিরাট ডায়ালেকটিশিয়ান বলে মনে করা হয়; তিনি এই মত পোষণ করতেন যে এক অনন্ত মুখ্য কারণ ও চিরন্তন অগ্নির দরুন, এই বিশ্ব নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে। 'সমস্ত পদার্থই অগ্নির বদলে বিনিময়ে এবং অগ্নি বিনিময়ে সমস্ত পদার্থের বদলে,

ঠিক যেমন দ্রব্যসমূহ স্বর্ণের বদলে বিনিময় এবং স্বর্ণ বিনিময় দ্রব্যসমূহের বদলে।'* সব কিছুই রয়েছে গতির মধ্যে। প্রকৃতি চিরন্তন গতিতে পূর্ণ: 'অগ্নি জীবিত থাকে মৃত্তিকার মৃত্যু দিয়ে, এবং বায়ু বাঁচে অগ্নির মৃত্যু দিয়ে; জল বাঁচে বায়ুর মৃত্যু দিয়ে, ও মৃত্তিকা বাঁচে জলের মৃত্যু দিয়ে।'** হেরাক্লিটাসের ডায়ালেকটিকসে পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য হল বিপরীত নীতিসমূহের মিথষ্ক্রিয়া, তাদের ঐক্য ও সংগ্রাম। সত্যের অবধারণা জন্মায় বিপরীতসমূহের বিনিময়ের, তাদের সংগ্রামের অবধারণার মধ্যে। 'যা বৈরি তা ঐক্যবদ্ধ, যা ভিন্ন তা গঠন করে এক নিখুঁত সুসামঞ্জস্য, এবং সব কিছু ঘটে এক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে,'*** সব কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে কারণ 'সংগ্রাম হল সব কিছুর জনক'।**** হেরাক্লিটাসের ডায়ালেকটিকস এর মধ্যেই অর্জন করেছে এক ভিন্ন অর্থ। তাঁর কাছে, ডায়ালেকটিকস হল পৃথিবীর এক বিশেষ ব্যাখ্যা, দ্বন্দ্বগুলির মিথষ্ক্রিয়া হিসেবে তার গতি, তার ক্রমবিকাশ বিবেচনা।

প্রাচ্যের মহান চিন্তানায়ক **ইব্‌ন রুশদ (আভেরোস)**

---

* *The Fragments of the Work of Heraclitus of Ephesus on Nature,* Baltimore, 1889, p. 89.

** প্রাচীন গ্রীসের বস্তুবাদীরা। পলিতিজদাত, মস্কো, ১৯৫৫, পৃঃ ৪৮ (রুশ ভাষায়)।

*** ঐ, পৃঃ ৪৮।

**** বিশ্ব দর্শন সংকলন। চার খণ্ডে, খণ্ড ১, মিসল প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭০, পৃঃ ২৭৬ (রুশ ভাষায়)।

ও ইব্‌ন সিনাও (আভিৎসেন্না) অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন। প্রথমোক্তজন মনে করতেন যে গতি চিরন্তন ও অপরাজেয়। আত্মপ্রকাশ, পরিবর্তন ও বিনাশ সবই বস্তুতে রয়েছে এক সম্ভাবনা হিসেবে, কেননা বিনাশ পুনরুৎপাদনের মতোই একটি ক্রিয়া। গর্ভস্থ যে কোনো সত্তার মধ্যেই ক্ষয় থাকে এক সম্ভাবনা হিসেবে। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিরা যাঁকে 'দর্শনের যুবরাজ' নামে অভিহিত করতেন, সেই আভিৎসেন্নাও মনে করতেন যে গতি বিভবরূপে অনুস্যূত আছে বস্তুর মধ্যে এবং তা তার রূপান্তরিত হওয়ার সামর্থ্যের সমতুল। প্রাচীন চৈনিক দার্শনিক ঝ্যাঙ জাই বলেছিলেন যে গতির বস্তুগত ক্ষমতা (কি) আছে, গতি স্পন্দিত হয় চক্রাকারে, এবং পালাক্রমে ভেঙে যায়, পরম শূন্যে প্রত্যাবর্তন করে এবং তার পরে ঘনীভূত হয়ে সমগ্র দৃশ্যমান জগৎকে আকৃতি দেয়। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক গ্রন্থ 'উপনিষদে' বলা হয়েছিল যে সমস্ত বস্তুগত প্রক্রিয়াই পরিবর্তনীয় ও অস্থিতিশীল। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে গ্রীস, মধ্য প্রাচ্য, ভারত ও চীনের প্রাচীন দার্শনিকরা গতির অনন্ত পরিবর্তন ও পৃথিবীর ক্রমবিকাশ স্বীকার করেছিলেন।

ডায়ালেকটিকসের ইতিহাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমরা ডায়ালেকটিকসের সুসমঞ্জস তত্ত্বের স্রষ্টা হেগেলকে উপেক্ষা করতে পারি না। হেগেল এই মত পোষণ করতেন যে পৃথিবী বিকশিত হয় বিপরীত শক্তিগুলির মিথস্ক্রিয়ার দরুন, কিন্তু সেই বিকাশকে তিনি যুক্ত করেছিলেন কোনো এক পরম ভাব, 'বিশ্ব

পরমাত্মা', 'বিশ্ব বিচারবুদ্ধি'-র বিকাশের সঙ্গে। তাঁর দ্বান্দ্বিক মতবাদে পৃথিবী যেন উলটোভাবে দাঁড় করানো: প্রকৃতিতে ও মানবেতিহাসে যা কিছু বিকশিত হচ্ছে তার কারণ আরোপ করেন 'বিশ্ব বিচারবুদ্ধির' উপরে; ফলে তাঁর ডায়ালেকটিকস ভাববাদী। বাস্তব জগতের ডায়ালেকটিকসকে হেগেল যেন পূর্বজ্ঞান করেছিলেন ভাবের (চিন্তনের) জগতের ডায়ালেকটিকসের মধ্যে। তিনি বলেছিলেন, বিশ্ব ইতিহাস হল 'বিশ্ব পরমাত্মার' ক্রমবিকাশের ইতিহাস। প্রত্যেক বস্তু ও ব্যাপারে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলির দরুন সব কিছু বিকাশলাভ করে; সুতরাং, সব কিছুরই আছে নিজস্ব ইতিহাস। হেগেলের দর্শনের সঠিক, যুক্তিসহ অন্তঃসারটি হল বিকাশ সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্ব, যে বিকাশের চালিকা শক্তি বস্তু ও ব্যাপারসমূহে বিপরীতের মিথষ্ক্রিয়া বলে তিনি নির্ণয় করেছিলেন।

অন্য দিকে, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস হল প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষের অনন্ত পরিবর্তন ও গতি হিসেবে, তথা পৃথিবীকে অবধারণার যে পদ্ধতি সসীম ও চিরন্তন সত্যগুলি স্বীকার করে না, সেই পদ্ধতি হিসেবে ক্রমবিকাশ সম্পর্কে এক তত্ত্ব। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস পৃথিবী বিষয়ে জ্ঞান সম্বন্ধে এক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সহজতর করেছে।

লোকে তাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে ঘটমান বিভিন্ন ব্যাপার ও ঘটনার মধ্যে অদৃশ্য, নিঃশব্দ, অথচ প্রকৃতই বিদ্যমান যোগসূত্রগুলি সম্বন্ধে বহুকাল হল সচেতন। 'সব কিছুর সম্পর্ক', 'কারণমালা', প্রভৃতি

সম্পর্কে ধারণা প্রথম যখন প্রকাশ করা হয়েছিল, তার পর কেটে গেছে সহস্র সহস্র বছর। এই ধরনের ধ্যানধারণার ব্যাখ্যা ও বিকাশ অগ্রসর হয়েছিল বিচ্ছিন্ন ব্যাপারসমূহের সহাবস্থান অবলোকন করা থেকে ধারণা তৈরি করার দিকে, এবং তার পরে বস্তু ও ব্যাপারসমূহের বিশ্বজনীন পরস্পরনির্ভরশীলতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করার দিকে। পরস্পরসম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে নিমিত্তস্বরূপ সম্পর্ক বিষয়ক ধারণাটি প্রচার করার জন্য তত্ত্বগত যুক্তি ব্যবহার করে ডেমোক্রিটাস উত্তরপুরুষদের বিরাট উপকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে সব কিছুর পিছনে তার নিজস্ব কারণ আছে, একটা কারণ ছাড়া কোনো কিছুর উদ্ভব হতে পারে না। ডেমোক্রিটাসের মতে নিমিত্তস্বরূপ সম্পর্ক এক প্রাকৃতিক আবশ্যকীয়তা, সুতরাং কারণের অভাব একটা আপতন, নির্দিষ্ট ব্যাপারটির আসল কারণ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবের এক বিষয়ীমুখ অভিব্যক্তি বলে সেই আপতন এক বিষয়মুখ ঘটনা হিসেবে নাকচ হয়ে যায়।

প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের একমাত্র রূপ হিসেবে কার্য-কারণ সম্পর্ক দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান উভয়তেই দৃঢ়মূল হয়েছিল। নির্ভরশীলতার অন্যান্য রূপ, বিশেষত, আপতন, সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতার মূল্যায়ন করা হয়েছিল মনোগত সংবেদন হিসেবে, বিষয়ীমুখ ধারণা হিসেবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ্র্যান্সিস বেকন তাঁর *Novum Organum* রচনায় লিখেছিলেন: 'যথার্থই নির্ধারণ

করা হয়েছে যে সত্যকার জ্ঞান হল তাই, যা কারণ থেকে সিদ্ধান্তীকৃত।'*

১৭শ-১৯শ শতাব্দীর দর্শনে ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কারণগত সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল অবধারিত, আশু ও কঠোর আবশ্যকীয়তা বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বিলিয়ার্ড টেবিলের উপরে একটি বল যে দ্রুতিতে চলে তা নির্ধারিত হয় আঘাতের শক্তি ও বলটির ভর দিয়ে। আঘাতের শক্তি আর বলটির ভর যত যথার্থভাবে হিসাব করা যায়, তত যথার্থভাবে সেটির দ্রুতি এবং প্রতিটি বিশেষ মুহূর্তে চলমান বলটির অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র বিষয়গত পৃথিবীকে পরস্পরসম্পর্কের মালায় গ্রথিত বলে মনে হয়। দেখা যায় যে পৃথিবীতে সব কিছুই পূর্বনিয়ন্ত্রিত। এ হল একটি নিয়তিবাদী অভিমত, অর্থাৎ, নিয়তিতে বা অদৃষ্টে বিশ্বাস।

পরস্পরনির্ভরশীলতাকে যদি আমাদের ধারণাগুলির এক বিষয়গত সম্পর্ক হিসেবে না দেখিয়ে বিষয়ীগত সম্পর্ক হিসেবে উপস্থিত করা হয় **ডেভিড হিউমের** মতো, মানবমনে চিরন্তনভাবে সহজাত চিন্তনের এক আবশ্যকীয় রূপ বলে ঘোষণা করা হয়, তা হলে তার ফল দাঁড়াবে অজ্ঞাবাদ, এবং পরে ভাববাদ। তাই, কারণগত সম্পর্ককে কাণ্ট মনে করতেন চিন্তনের এক

---

* Lord Bacon, *Novum Organum,* New York, P. F. Collier & Son, 1902, p. 108.

প্রাক-অভিজ্ঞতামূলক (প্রকৃত অভিজ্ঞতা ছাড়াই শুধু মেনে-নেওয়া ধারণামূলক সিদ্ধান্ত) রূপ।

সুসংগত যে বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় এ কথা বলা হয় যে কারণগত আন্তঃসম্পর্কই সাধারণ (বিশ্বজনীন) যোগসূত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপ, সেই ব্যাখ্যাই তার বিষয়গত চরিত্র প্রকাশ করে। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের দৃষ্টিকোণ থেকে, সমগ্র পৃথিবী হল চলমান ও পরিবর্তমান বস্তুসমূহের এক সামগ্রিক সম্পর্ক। এই সার্বিক বিশ্ব সম্পর্কের বাইরে একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার, প্রক্রিয়া বা সাধারণভাবে গতি, কোনোটাই অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং, প্রতিটি বস্তুর, প্রতিটি জিনিসের বিজ্ঞানসম্মত, **বিষয়গত** পরীক্ষাকেই ডায়ালেকটিকস সেই বস্তুটির নতুন নতুন দিক, সম্পর্ক ও যোগসূত্রগুলিকে উন্মোচিত করার এক অনন্ত প্রক্রিয়া বলে মনে করে। আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যেমন, পদার্থবিদ্যা, সেই সমস্ত বুনিয়াদি মিথস্ক্রিয়াগুলিকে মূর্ত অভিব্যক্তি দেয়, যেগুলি মহাবিশ্বে ঘটমান বহুবিধ ব্যাপারকে বেষ্টন করে — জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আত্মপ্রকাশ থেকে প্রাথমিক কণিকাসমূহে চলমান ক্ষুদ্রতম প্রক্রিয়াগুলি পর্যন্ত। বিষয়গত পৃথিবীতে একটা সাধারণ আন্তঃসম্পর্ক প্রকাশ পায় সব ধরনের গতির মধ্যে: যান্ত্রিক স্থানচ্যুতিতে, বিভিন্ন পদার্থগত, রাসায়নিক ও জৈব প্রক্রিয়ায় ও সামাজিক ঘটনাবলীতে।

অবশ্য, ডায়ালেকটিকসের ইতিহাসে এমন সব অভিমতও ছিল, যাতে গতিতে পরিবর্তনের ভূমিকা অতিরঞ্জিত

করা (পরম করে তোলা) হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ও হেরাক্লিটাসের শিষ্য **ক্রাটিলাস** বলেছিলেন যে একই নদীতে দু-বার নামা অসম্ভব: আমরা যখন সেই নদীতে নামছি, তার মধ্যে নদীটি ও আমরা, উভয়েই পরিবর্তিত হয়েছি। এ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে জ্ঞান অনর্জনীয়। এই অবস্থানকে বলা হয় **ব্যতিষঙ্গবাদ** বা আপেক্ষিকতাবাদ; তা গতিময়তা, পরিবর্তনীয়তা ও গতির ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে এবং এই মত পোষণ করে যে সব কিছু যদি গতিশীল হয়, তা হলে বস্তুসমূহ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু বলা যেতে পারে না। এই অভিমত ডায়ালেকটিকসকে রূপান্তরিত করে তার বিপরীতে — অধিবিদ্যায়; এখন আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করব।

অধিবিদ্যা কী?

Metaphysics বা অধিবিদ্যা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'physics-এর পরে', এবং কথাটা এসেছে কৃত্রিমভাবে। আলেকজান্দ্রিয়ায় জনৈক গ্রন্থাগারিক, **রোডসের আন্দ্রোনিকাস** (যিনি আরিস্ততলের পাণ্ডুলিপিগুলি অধ্যয়ন করতেন), সেগুলি সাজিয়ে রাখার সময়ে, তথাকথিত প্রথম দর্শন, বা দার্শনিক বিজ্ঞতা বিষয়ক ক্ষেত্রটি সংক্রান্ত রচনাগুলি রেখেছিলেন প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মতবাদ 'Physics' রচনাটির পরে। সেই সময় থেকে সামগ্রিকভাবে দার্শনিক রচনাগুলিকেই

বলা হত 'মেটাফিজিক্স'। পরবর্তীকালে, শব্দটির অর্থ বদলে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হেগেল মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যাকে অভিহিত করেছিলেন গতি সম্বন্ধে এক অভিমত বলে, যা ডায়ালেকটিকসের বিপরীত। অধিবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বস্তুসমূহের অপরিবর্তনীয়তাকে ও এই সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে চিন্তনের যুক্তিগত রূপগুলিকে পরম করে দেখা। গতি, তার উৎস, ও তাতে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলিকে বস্তুনিচয়ের মধ্যে সারগত বলে মনে করা হত না, বস্তুসমূহকেই গণ্য করা হত অন্তফল হিসেবে। 'অধিবিদ্যাবিদের কাছে, বস্তুনিচয় ও সেগুলির মানসিক প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলি, ভাবগুলি, বিচ্ছিন্ন, একটির পরে আরেকটি ও পরস্পরের থেকে আলাদাভাবে বিবেচ্য, ধরাবাঁধা, কঠোর, চিরতরে নির্দিষ্ট অনুসন্ধানের লক্ষ্যবস্তু। সে চিন্তা করে পুরোপুরি অমীমাংসেয় বিরোধাভাসে। তার ভাব-বিনিময় হল 'হ্যাঁ, হ্যাঁ; না, না'; কেননা এর চেয়ে বেশি যা কিছু তা-ই আসে মন্দ থেকে।'*

তাই ডায়ালেকটিকস আর অধিবিদ্যা হল বিকাশ সম্বন্ধে দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ব্যাখ্যা করার দুটি ভিন্ন ধরন। কখনও কখনও বলা হয় যে ডায়ালেকটিকস বিকাশকে স্বীকার করে, অধিবিদ্যা তাকে বাতিল করে, কিন্তু আধুনিক অধিবিদ্যার ব্যাপারে এটা সত্যি নয়। যদিও এ কথা সত্যি যে অতীতে, যথা, ১৭শ শতাব্দীতে অধিবিদ্যা

---

* Frederick Engels, *Anti-Dühring*, p. 31.

বস্তুগত ব্যাপারসমূহ ও সেগুলির আন্তঃসম্পর্কের সারগত গুণ হিসেবে গতি থেকে নিজেকে বিমূর্ত করে নিয়েছিল, কিন্তু পরে, বিশেষত ২০শ শতাব্দীতে, বিকাশকে তা অস্বীকার করে নি বরং তাকে বিবেচনা করেছিল সরলীকৃত ভঙ্গীতে। ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যা দুই-ই গতি, বিকাশকে স্বীকার করে বটে, কিন্তু তা ব্যাখ্যা করে ভিন্নভাবে এবং তাই সারগতভাবে একটি অপরটির বিরোধিতা করে।

ডায়ালেকটিকস বিকাশকে ব্যাখ্যা করে বিপরীতের মিথস্ক্রিয়া হিসেবে, ঐক্য ও সংগ্রাম হিসেবে; বস্তুতপক্ষে তা হল আভ্যন্তরিক বিকাশের বা **আত্ম-বিকাশের** সমতুল। প্রতিতুলনায়, অধিবিদ্যা বিকাশকে পর্যবসিত করে সরল স্থানচ্যুতিতে, বৃদ্ধি বা হ্রাসে, কিংবা চক্রাকারে গতিতে, এবং তা আত্ম-বিকাশকে বাতিল করে।

পৃথিবী সম্বন্ধে আধিবিদ্যক অভিমত ও অবধারণার যাথার্থ্য ছিল নির্দিষ্ট একটা পর্যায়ে যখন তা যুক্ত ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এবং জ্ঞানে প্রগতির প্রয়োজনের সঙ্গে। বিচ্ছিন্ন সব বস্তু ও ব্যাপার সম্বন্ধে তথ্য সঞ্চয় ও সংগ্রহকে, তুলনা, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সেগুলির গুণ-ধর্ম আবিষ্কারকে তা সহজতর করেছিল। আবিষ্কার ঘটেছিল বিভিন্ন বিজ্ঞানে — গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতিতে।

ফরাসী জীববিজ্ঞানী ও চিন্তক **জাঁ লামার্ক** তথ্যগত উপকরণের এক বিশাল সংগ্রহের ভিত্তিতে জৈব প্রকৃতির ক্রমবিকাশের এক তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন।

তিনি তাঁর অভিমত উপস্থিত করেছিলেন 'জীববিদ্যার দর্শন' রচনায়, সেখানে তিনি ক্রমবিকাশকে বিচার করেছিলেন সরল থেকে জটিলের দিকে এক গতি হিসেবে এবং তাকে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক বিষয়গুলির প্রভাবে জীবসত্তার উন্নয়নের এক ফল বলে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু, আধিবিদ্যক চিন্তাপ্রণালীর আধিপত্যে, জ্ঞান সঞ্চয় ও তাকে প্রণালীবদ্ধকরণের ফলে শুধু এমন একটা পরিস্থিতিই দেখা দিতে পারত, যেখানে বস্তু ও ব্যাপারসমূহ অন্যান্য বস্তু ও ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে বিবেচিত হত না, হত শুধু বিচ্ছিন্নরূপে। সেগুলির পরিবর্তন ও বিকাশ থেকে বিজ্ঞানীরা বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়েছিলেন।

এই অভিমত প্রাধান্যবিস্তার করেছিল ১৯শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত, এবং বহু বিজ্ঞানীই পৃথিবীর অপরিবর্তনীয়তায় এবং যন্ত্রনির্মাণবিদ্যার নিয়মে পর্যবসিত পৃথিবীর বুনিয়াদি নিয়মগুলির স্থিতিশীলতায় বিশ্বাস করতেন। এই অভিমত অনুযায়ী, মহাবিশ্বে নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটতে পারে না। এইভাবে, জ্ঞানের এক ঐতিহাসিকভাবে সীমিত পদ্ধতি, আধিবিদ্যা, বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশকে ক্রমে ক্রমে বিঘ্নিত করতে শুরু করেছিল।

তিনটি বিরাট আবিষ্কার

বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতে থাকায়, পৃথিবী সম্বন্ধে আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তা প্রথমে ঘটেছিল বিশ্বতত্ত্বে। জার্মান প্রাকৃতিক

বিজ্ঞানী ও দার্শনিক কাণ্ট এবং ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ **পিয়ের লাপ্লাস** সৌরজগতের উদ্ভব সম্বন্ধে সদৃশ প্রকল্প উপস্থিত করেন; উভয়েই বলেন যে ধূলি-সদৃশ পদার্থ থেকে তা প্রাকৃতিকভাবে গঠিত হয়েছিল। তাঁদের তত্ত্ব ছিল গাগনিক গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে আধিবিদ্যক ধারণায় প্রথম বড় ধরনের সাফল্য-অর্জন।

বিশ্বজনীন পরিবর্তন ও বিকাশ সম্বন্ধে দ্বান্দ্বিক ধারণার জন্ম হয়েছিল খোদ বিজ্ঞানেরই প্রাণকেন্দ্রে। একমাত্র ক্রমবিকাশের তত্ত্বের উপরে নির্ভর করেই পরিবর্তমান পৃথিবীর বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব — এই চিন্তাটা বিজ্ঞানে দৃঢ়মূল হয়েছে, বিশেষত ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। পৃথিবী সম্বন্ধে দ্বান্দ্বিক অভিমত গঠনের পক্ষে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ১৯শ শতাব্দীর তিনটি বিরাট আবিষ্কার — জীবসত্তাসমূহের কোষময় গঠন আবিষ্কার, শক্তির সংরক্ষণ ও রূপান্তরের নিয়ম প্রতিপাদন, এবং ক্রমবিকাশের তত্ত্ব। পৃথিবীতে বস্তু ও ব্যাপারসমূহের বিশ্বজনীন পরস্পরসম্পর্ক প্রকাশ করতে তা সাহায্য করেছিল, এবং দেখিয়েছিল যে বিকাশ এগোয় সরল থেকে জটিলের দিকে নিম্নতর থেকে উচ্চতরের দিকে গতি হিসেবে। এর আগে বিজ্ঞানীরা এবং দার্শনিক-অধিবিদ্যাবিদরা উভয়েই বস্তুর বিভিন্ন রূপকে — ক্যালরিক, চৌম্বক, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক — পরস্পর থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান বলে গণ্য করতেন; কিন্তু এখন সেগুলির আভ্যন্তরিক সম্পর্ক প্রমাণিত হয়েছিল।

১৮৩০-এর দশকে, জার্মান জীববিজ্ঞানী **থিওডোর শোয়ান** এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানী **মাত্তিয়াস শ্লেইডেন** আবিষ্কার করেন কোষ, জীবসত্তাসমূহের বিকাশ অধ্যয়নের সময়ে, সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠনকাঠামোর যা ভিত্তিস্বরূপ। এই আবিষ্কার বিরাট দার্শনিক গুরুত্বসম্পন্ন ছিল, কেননা তা সমস্ত জীবন্ত পদার্থের ঐক্য ও সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করেছিল।

ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী **জেমস্ জাউল** ও রুশ পদার্থবিজ্ঞানী **এমিলি লেনত্‌স** কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত শক্তির সংরক্ষণ ও রূপান্তরের নিয়মটিতে বলা হয় যে কারণ ছাড়া কোনো কিছুই আবির্ভূত বা অদৃশ্য হয় না। বহু শতাব্দী আগে প্রাচীন দার্শনিকরাও অনুরূপ এক চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তা ছিল শুধু তাঁদের অনুমান: তাঁরা এই যুক্তিও দিয়েছিলেন যে কিছু-না থেকে কিছুই সৃষ্টি হয় না। এই উক্তি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিপাদিত হয় নি ১৯শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত; ১৯শ শতাব্দীতেই জোউল ও লেনত্‌স সব ধরনের শক্তির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্রমাণ করেন এবং নিরীক্ষার সাহায্যে প্রতিপন্ন করেন যে শক্তি অবিনাশী ও অসৃজনীয়, তা শুধু রূপান্তরিত হতে পারে এক দশা থেকে আরেক দশায়: যান্ত্রিক থেকে ক্যালরিক, ক্যালরিক থেকে বৈদ্যুতিক, ইত্যাদিতে।

ইংরেজ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী **চার্লস ডারউইনের** বিশদীকৃত ক্রমবিকাশ তত্ত্ব উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছিল। বিশাল

তথ্যগত উপকরণের উপরে নির্ভর করে ডারউইন প্রমাণ করেছিলেন যে সমগ্র প্রকৃতি, একটি উদ্ভিদ থেকে মানুষ পর্যন্ত, প্রবহণ ও বিবর্তনের এক নিরন্তর দশায় রয়েছে।

ক্রমবিকাশের ধারণাটা জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রতেও ছড়িয়েছে। মহাবিশ্ব কীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ও ক্রমবিকশিত হয়েছিল সে বিষয়ে নানা তত্ত্ব ২০শ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছিল পদার্থবিদ্যায় ও জ্যোতির্বিদ্যায়। ভূবিদ্যা ও ভূগোল এই ধারণাকে প্রতিপন্ন করেছিল যে পৃথিবী, তার মর্মস্থল ও উপরিস্তর নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। ভূবিদ্যা বস্তুর ক্রমবিকাশ অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিল। ইতিহাস মনোনিবেশ করেছিল ইতিহাসবাদের দিকে, অর্থাৎ এই ধারণাটা দিয়েছিল যে প্রগতি হল নিম্নতর থেকে উচ্চতরতে এক গতি। মনোবিদ্যা প্রকাশ করেছিল যে মানবমনও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। এইভাবে, ক্রমবিকাশের তত্ত্ব বিজ্ঞান ও দর্শনকে পরিব্যাপ্ত করেছে, এবং জগৎ পরিবর্তনাতীত, এই ধারণাকে খণ্ডন করেছে।

সমস্ত বাস্তবই আন্তঃসম্পর্কিত, এই ধারণাও প্রতিপাদিত হচ্ছে। জলবায়ুতে অদলবদল উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে পরিবর্তন ঘটায়। সূর্যে চৌম্বক ঝঞ্ঝা শুধু যে বেতার যোগাযোগকে ব্যাহত করে তাই নয়, আবহাওয়ার উপরেও তার একটা অভিঘাত পড়ে, আবার আবহাওয়াগত চাপ লোকের স্বাস্থ্যের উপরে প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞানীরা শুধু একাই তাঁদের

বৈজ্ঞানিক রচনাদিতে বস্তু ও ব্যাপারসমূহের বিশ্বজনীন সম্পর্কের কথা লেখেন না, লেখক ও কবিরাও তাঁদের রচনায় তা নিয়ে আলোচনা করেন। আমেরিকান কল্প-বিজ্ঞানী কাহিনী লেখক রে ব্র্যাডবেরি তাঁর *A Sound of Thunder* নামে ছোট উপন্যাসে বিভিন্ন যুগের মধ্যে বিদ্যমান যোগসূত্র সম্বন্ধে, এবং একটিমাত্র প্রজাপতি অথবা ইঁদুরের বিনাশের উপরে সমাজের সংস্কৃতির, এমন কি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ভরতা সম্বন্ধে বলেছেন। লেখক অবশ্য অতিকথনের আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু এই ভীতিপ্রদ কাহিনীটি পড়ার সময়ে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যে এ রকম একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। এবং জীবনও তা প্রতিপন্ন করে। বস্তুতই, প্রকৃতিতে মাত্র একটি যোগসূত্রেরই বিনাশ বা দুর্বলতাসাধন শুধু প্রকৃতিরই নয়, সমাজেরও পররর্তী বিকাশকে প্রভাবিত করে।

ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের মার্কসবাদী দার্শনিক রবার্ট স্টেইগেরভাল্ড বস্তু ও ব্যাপারসমূহের মধ্যে বিশ্বজনীন সম্পর্কের এক উদাহরণ দিয়েছেন। অত্যন্ত কার্যকর কীটনাশক ডি ডি টি-র আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। এর প্রয়োগ কীট নাশ সহজতর করেছিল বটে, কিন্তু তা পাখিদের খাদ্যও ধ্বংস করেছিল, ফলে বসন্তকালটা হয়ে উঠেছিল কূজনহীন। ডি ডি টি-র দরুন পাখি আর মৌমাছি মারা পড়েছিল, তাই পরাগিত হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম পুষ্পিকা, ফল আর বেরি ফলেছিল কম...

অধঃক্ষেপণের ফলে ডি ডি টি মিশেছিল ভূপৃষ্ঠের জলে, তার পরে নদী ও সাগরে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের খাদ্যে। তা সঞ্চিত হয়েছিল আমাদের পাকস্থলীতে। জীবদেহ থেকে ডি ডি টি অপসারণ করা অসম্ভব বলে, বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ডি ডি টি-র প্রয়োগ বন্ধ করা উচিত।

অবশ্য, ব্যাপারসমূহের মধ্যেকার সম্পর্ক সব সময়ে আপাতদৃশ্য নয়। কখনও কখনও আমরা তা দেখতেই পাই না। মহান চিন্তানায়ক, কবি ও গণিতবিদ ওমর খৈয়ম তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন:

চারদিকে যা দেখি সব মিথ্যা শুধু, আর কিছু নয়,
এ সব কিছুর তল পেতে তো অনেক পথই বাকি।
যা দেখ তাই এই পৃথিবীর সত্য বলে মেনো না কো,
রহস্য যা তাহার দেখা পায় না কভু আঁখি...*

পৃথিবী শুধু পরিবর্তমান ও গতিশীলই নয়; তা একটিমাত্র সমগ্র, এবং সেখানে সব কিছু অবিচ্ছেদ্যভাবে আন্তঃসম্পর্কিত। বিজ্ঞান প্রাচীন দার্শনিকদের এই অনুমানকে প্রমাণ করেছে যে কিছু-না থেকে সৃষ্টি হয় না কিছুই, এবং চিহ্ন না রেখে কিছুই অদৃশ্য হয় না। প্রাথমিক কণাসমূহ থেকে গঠিত হয় পরমাণু, তার পর সেগুলি থেকে তৈরি হয় অণু। বৃহত্তর অবয়বগুলিও একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত; উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল গঠন করে প্রজাতি, শ্রেণী ও পরিবার।

---

* ওমর খৈয়ম। রুবাইয়াত। মস্কো, ১৯৭২, পৃঃ ১৩ (রুশ ভাষায়)।

সূর্য পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিত, আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলী সম্পর্কিত অন্য নক্ষত্রমণ্ডলীর সঙ্গে, ইত্যাদি। তাই, বিশ্বকে অধ্যয়ন করার সময়ে আমরা তাকে দেখি তার আন্তঃসম্পর্ক, ঐক্য ও পরিবর্তনে।

ক্রমবিকাশ কীভাবে কাজ করে?

দার্শনিকরা বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট্যনির্ণয় করেছিলেন সেগুলির পরিমাণ ও গুণ দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন যে পরমাণুসমূহ আছে আর আছে এক মহাশূন্য। পরমাণুগুলি রূপ ও ওজনের (অর্থাৎ, পরিমাণের) দিক দিয়ে পৃথক, আর চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে এটাই একমাত্র পার্থক্য। তিনি বলেছিলেন, এমন কি আত্মাও গঠিত পরমাণু দিয়ে, সেগুলি গোলাকার ও হাল্কা। পিথাগরাস ছিলেন অন্যতম প্রথম দার্শনিক যিনি প্রকৃতিতে পরিমাণগত সম্পর্কের প্রশ্নটি উপস্থিত করেছিলেন; সংখ্যাকে তিনি অস্তিত্বশীল সমস্ত পদার্থের মূল নীতি বলে মনে করতেন।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য পরিমাণ ও গুণের মধ্যেকার সম্পর্ক বহুকাল আগে স্বীকার করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আরব অপরসায়নবিদদের তা জানা ছিল, তারা উপাদান রূপান্তরের তত্ত্ব বিশদ করেছিলেন। গুণের বর্গটিকে প্রথম ব্যাখ্যা করেছিলেন আরিস্ততল, তিনি তার সংজ্ঞানিরূপণ করেছিলেন অন্তঃসারের এক সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বলে।

প্রত্যেকেই জানে যে পরিমাণগত পরিবর্তনসমূহের ফলে একটি বিষয়ে বা ব্যাপারে এক নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে। আমরা বড় হয়ে উঠি, অর্থাৎ, শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধিকালে, তার পর পরিণত বয়স ও বার্ধক্যের দিকে যাই। এই প্রক্রিয়াটি (এক দশা থেকে আরেক দশায় যাওয়া) ঘটে আমাদের অলক্ষে, এবং শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকালের ভেদরেখাটা সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। পরিমাণগত পরিবর্তনগুলির ধারাবাহিকতা প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ চলাকালে নতুনের আবির্ভাবকে শুধু যে ব্যাখ্যা করে না তাই নয়, বরং তা বোঝা আরও দুরূহ করে তোলে। নতুন সম্বন্ধে ধারণাটি একটা লাফ-জাতীয় গুণগত পরিবর্তন হিসেবে বিকাশের সঙ্গে আবশ্যিকভাবেই যুক্ত।

প্রাচীন গ্রীকরা এটা আন্দাজ করেছিলেন; তাঁরা দিয়েছিলেন সুনির্দিষ্ট মানসিক যুক্তিতর্ক — সোরাইটিজ বা যুক্তিজাল; পরিমাণগত ধারাবাহিকতাকে যা ব্যাহত করে, প্রকৃতিতে ও মানবজীবনে সেই সমস্ত গুণগত লাফ-জাতীয় রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবিতা তাতে যুক্তিসংগতভাবে প্রতিপাদন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'স্তূপ' সংক্রান্ত সোরাইটিজে পৃথক পৃথক বালুকণা দিয়ে গঠিত গোটা একটি স্তূপ কীভাবে দেখা দেয় সেই প্রশ্নটি উপস্থিত করা হয়েছে। একটিমাত্র বালুকণা একটি স্তূপ নয়, দুটি, তিনটি, চারটি বা পাঁচটি ধূলিকণাও একটি স্তূপ নয়... একটি ধূলিকণাকে অন্যান্য ধূলিকণার সঙ্গে যোগ করলেও সেটা স্তূপ

হয় না। তা হলে সেটা কীভাবে দেখা দেয়? কোন বিশেষ মুহূর্তে? ‘বিরলকেশ’ সংক্রান্ত সোরাইটিজে উল্টো দিক দিয়ে একই ধরনের প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করা হয়: একজন লোক কীভাবে বিরলকেশ হয়, যদি একটি, দুটি, প্রভৃতি করে তার চুলের পরিমাণ হ্রাস একটা কেশহীন স্থানের আত্মপ্রকাশের সমতুল না হয়? অথচ প্রাচীনকালের মতো, আজও স্তূপগুলি তৈরি হচ্ছে এবং লোকের মাথায় টাক পড়ছে। এই সমস্ত ব্যাপার শুধু বোঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনসমূহের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই, একটা পরিমাণগত সঞ্চয়ন পরিবর্তিত হয় একটা গুণগত প্রভেদে। হেগেল আরও একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন, সেটি বেশ সরস: আপনি একটা গ্রশ বা একটা টেলার খরচ করতে পারেন, তার কোনোই তাৎপর্য নেই; কিন্তু এই ‘কোনোই তাৎপর্য নেই’ ব্যাপারটি আপনার টাকার থলিটাকে ফাঁকা করে, এবং সেটাই হল একটা আবশ্যিক গুণগত পার্থক্য।

পরিমাণগত পার্থক্য বিভিন্ন ধরনের: সেগুলি হতে পারে মন্থর ও অলক্ষিত (যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধিকালে পরিবর্তন), অথবা সেগুলি হতে পারে ত্বরিত। পরিমাণগত পরিবর্তনগুলি ক্রমবিকাশমূলক বিকাশ হিসেবে পরিচিত। **ক্রমবিকাশ** হল এক মসৃণ, ক্রমান্বিত, মন্থর ধরনের বিকাশ। গুণগত বিকাশ হল **বৈপ্লবিক,** তার সঙ্গে জড়িত থাকে অতীতের অবলুপ্তি, সামাজিক সম্পর্ক, সংস্কৃতি,

প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন। এই ধরনের বিকাশের দৃষ্টান্ত হল সামাজিক বিপ্লব আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি।

কিছু কিছু বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অবশ্য মনে করেন যে প্রকৃতি ও সমাজে একমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তনই আছে; এইভাবে তাঁরা বিকাশ সম্বন্ধে এক আধিবিদ্যক অভিমত প্রকাশ করেন, তাতে পরিমাণগত সম্পর্কগুলিকেই পরম করে তোলা হয়, সেগুলিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, **আনাক্সাগোরস** বলেছিলেন যে মনুষ্য-বীজের মধ্যে অদৃশ্য সূক্ষ্ম রূপে থাকে চুল, নখ, শিরা, কণ্ডরা ও হাড়, সেগুলি মিলিত হয়, বাড়ে ও দৃশ্যমান হয় বিকাশক্রমে। কিছুটা পরিবর্তিত রূপে হলেও, অনুরূপ অভিমত দেখা দিয়েছিল জীববিদ্যায় এবং পরে সমাজতত্ত্বেও। যেমন, সামাজিক-ডারউইনপন্থীরা জীব ক্রমবিকাশের তত্ত্ব আর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা সাদৃশ্য টানেন। সমাজের বিকাশকে তাঁরা পর্যবসিত করেন ক্রমবিকাশে, বাতিল করেন বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে, এবং এর একটা ব্যবহারিক পরিণতি দেখা দেয়। রাজনীতিতে ক্রমবিকাশবাদের তাৎপর্য হল সংস্কারবাদ আর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের পক্ষে প্রচার। এই তত্ত্বের অনুগামীরা পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে পরিবর্তনকে গণ্য করেন এক মসৃণ, ক্রমান্বিত প্রক্রিয়া বলে। তাই তাঁরা শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে সহযোগিতার ওকালতি করেন এবং সরকারি সংস্কারকর্ম ও সাংবিধানিক সংশোধনী,

প্রভৃতির গুরুত্ব বাড়িয়ে দেখান, যার ফলে তাঁরা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

আরেকটি চরম প্রান্ত হল গুণগত পরিবর্তনগুলিকেই পরম করে তোলা, যার দ্বারা বিকাশকে ব্যাখ্যা করা হয় একান্তভাবেই গুণগত পরিবর্তন হিসেবে। ফরাসী প্রকৃতিবাদী জর্জ **ক্যুভিয়ে-সৃষ্ট** মহাপ্রলয়ের তত্ত্বকে কোনো কোনো বিজ্ঞানী দর্শনের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করেন। ক্যুভিয়ে মনে করতেন যে ক্রমবিকাশ হল শান্ত দশা থেকে মহাপ্রলয়ের দিকে যাওয়া। ক্যুভিয়ের অভিমত পরবর্তীকালে অ-প্রমাণিত হলেও, সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য তা ব্যবহৃত হত এবং নৈরাজ্যবাদীদের ও সব ধরনের রাজনৈতিক হঠকারীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ভিত্তি হিসেবে তা কাজ করেছিল। উপরে পর্যালোচিত অভিমতগুলির অনুরূপ অভিমত হল আধিবিদ্যক, কেননা সেগুলির ভিত্তি হল বিকাশের শুধু গুণগত বা পরিমাণগত পরিবর্তনেরই স্বীকৃতি।

প্রকৃতপক্ষে, বিকাশ হল পরিমাণগত ও গুণগতের এক সম্মিলন, যেখানে পরিমাণগত পরিবর্তনগুলি লাফের পথ প্রশস্ত করে, এবং গুণগত পরিবর্তনগুলি প্রশস্ত করে নতুনের জন্মের পথ, ক্রমবিকাশে এক আমূল মোড়বদলের পথ। অসামান্য মার্কিন সাংবাদিক জন রিড তাঁর 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' গ্রন্থে এটা প্রত্যয়জনকভাবে দেখিয়েছেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব কীভাবে ঘটেছিল, এবং পৃথিবীকে স্তম্ভিত

করা ও অনেকের কাছেই সম্পূর্ণ বিস্ময়স্বরূপ ঘটনাবলী কীভাবে রুশ প্রলেতারিয়েতের চালানো শ্রেণী সংগ্রামের দীর্ঘ কালপর্বের ভিতর থেকে বাস্তবে গড়ে উঠেছিল তা তিনি বর্ণনা করেছেন।

উপসংহার টানার আগে এ কথা অবশ্যই বলা দরকার যে লাফগুলি ঘটে বিভিন্নভাবে, সেগুলি এক রকম নয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেগুলি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি তরল পদার্থের একটি ধাতুতে রূপান্তর, বা জলের বাষ্পে রূপান্তর হতে পারে, অথবা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবও হতে পারে। লাফগুলি ঘটতে বহু সহস্রাব্দ লেগে যেতে পারে — একটি দৃষ্টান্ত হল ভূতাত্ত্বিক যুগগুলির পর্যায়ক্রম; অথবা সেগুলি ঘটতে পারে ঐতিহাসিকভাবে সংক্ষিপ্ত এক কালপর্বে — তার দৃষ্টান্ত হল সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণ, যা সম্পন্ন হয়েছিল দুই ডজন বছরের মধ্যে। ইউরোপ, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশেও সম্প্রতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটেছে।

পরিমাণ থেকে গুণে উত্তরণের তত্ত্ব বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসকে এক সবিশেষ **বৈপ্লবিক চরিত্র** দান করে। সমাজপ্রগতির বুনিয়াদি সারমর্মকে তা ব্যাখ্যা করে এবং ক্রমবিকাশমূলক পরিবর্তনগুলি কীভাবে স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লব সংঘটিত করে সে বিষয়ে উপলব্ধি সহজতর করে; আর এই বিপ্লব হল এক নির্দিষ্ট স্তরে একটি সমাজ বা দেশের ক্রমবিকাশমূলক পরিবর্তনের তুঙ্গশীর্ষ।

এখন যখন আমরা দেখেছি যে গতি ঘটে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণের মধ্য দিয়ে, তখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি : গতির উৎস কী ?

গতির কি শুরু আছে ?

অতি প্রাচীনকালে এমন কিছু দার্শনিক ছিলেন যাঁরা মনে করতেন যে বিপরীত যে সমস্ত নীতি, বা শক্তি, আত্ম-গতি, আভ্যন্তরিক গতি ও এক অবস্থার দ্বারা আরেক অবস্থার প্রতিস্থাপন ঘটায়, সেই সমস্ত বিপরীত নীতি, বা শক্তি পৃথিবীতে ক্রিয়া করে। তাঁরা বলতেন, প্রতিটি বিষয় বিপরীত দিকগুলি দিয়ে তৈরি, এই দিকগুলি একটি অপরটিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না, কেননা সেগুলি একটি অপরটিকে পূর্বানুমান করে, আবার একই সময়ে একটি অপরটিকে বাদ দেয় অর্থাৎ একেবারে বিপরীত দিকে থাকে : এই রকমই হল জীবন ও মৃত্যু, প্রেম ও ঘৃণা, ভালো ও মন্দ, অগ্নি ও তুষার, দিন ও রাত্রি, পুরুষ ও নারী, ইত্যাদি। বিপরীত দিকগুলির মিথষ্ক্রিয়া, এই দ্বন্দ্বগুলি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা আনে, পরিবর্তন ঘটায়, এবং তাই সেগুলি বিকাশের এক উৎস। পৃথিবীতে বিপরীতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমিতি প্রকাশ করেছিলেন প্রাচীন চীন, ভারত, গ্রীস, ও মধ্য প্রাচ্যের দার্শনিকরা।

প্রাচীন চৈনিক দার্শনিকবৃন্দ, যেমন **লাও-জি,** বলেছিলেন বিশ্বজনীন মুখ্য নীতির গতির কথা, তাকে

অভিহিত করেছিলেন ‘তাও’ বলে। ‘তাও’-য়ের দ্বান্দ্বিকতা স্বপ্রকাশ এইখানে যে তার বহু পরস্পরবিরোধী গুণ-ধর্ম আছে: ‘তাও’ শূন্য ও অনন্ত, তা নিঃসঙ্গ ও অপরিবর্তনীয়। মহান ‘তাও’ সর্বত্র বিরাজমান, সর্বত্র তা কাজ করে, কোনো সীমা নেই তার। ‘দাও দে জিঙ’ গ্রন্থে ‘তাও’-এর তার বিপরীতে উত্তরণ, রূপান্তরণ সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে: যা কুৎসিত তা ত্রুটিহীনকে সংরক্ষিত হতে সাহায্য করে, যা বঙ্কিম তা পরিণত হয় ঋজুতে, শূন্য হয় পূর্ণ এবং পুরনো প্রতিস্থাপিত হয় নতুনের দ্বারা। সামান্য কিছুর জন্য প্রয়াস চালাতে গিয়ে, আপনি অর্জন করতে পারেন অনেক কিছু এবং অনেক কিছুর জন্য প্রয়াস চালাতে গিয়ে আপনি ব্যর্থ হতে পারেন। সুখের মধ্যে আছে দুর্ভাগ্য এবং এর উল্টো। অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন হেরাক্লিটাসও: ‘আমাদের মধ্যে সব কিছুই এক — জীবিত ও মৃত, সজাগ ও নিদ্রিত, তরুণ ও বৃদ্ধ। কেননা প্রথমোক্ত অদৃশ্য হয় শেষোক্তের মধ্যে, এবং শেষোক্ত — প্রথমোক্তের মধ্যে।’* প্রাচ্যের মহাজ্ঞানীরা বলেছিলেন দুটি নীতির মধ্যে সংগ্রামের কথা: এক দিকে, আলো ও শুভ (অর্মাজ্দ), অন্য দিকে, মন্দ ও অন্ধকারের শক্তি (আরিমান)।

এই অভিমতগুলি পরবর্তীকালে বিকশিত করা হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইতালীয় দার্শনিক জর্ডানো

---

* বিশ্ব দর্শন সংগ্রহ। মিস্ল প্রকাশন, মস্কো, ৪ খণ্ডে, ১ খণ্ড, ১৯৬৯, পৃঃ ২৭৬, (রুশ ভাষায়)।

ব্রুনো এই মত পোষণ করতেন যে একটি বিরোধিতা আরেকটি বিরোধিতার শুরু, বিনাশ হল অভ্যুদয় ও অভ্যুদয় — বিনাশ, এবং প্রেম হল ঘৃণা আর ঘৃণা — প্রেম। তাই তিনি এই সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন: প্রকৃতির অন্তরতম রহস্যগুলি যে ভেদ করতে চায়, তারই উচিত ন্যূনতম ও সর্বাধিকতম দ্বন্দ্ব ও বিরোধগুলি পর্যবেক্ষণ করা। যাঁর কবিতাগুলিকে যথার্থভাবেই দার্শনিক রচনা বলে অভিহিত করা হয়, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন যে জীবন তার সমস্ত রূপেই সুন্দর, কেননা একটি জিনিস উৎসারিত হয় আরেকটি জিনিস থেকে, এবং আরেকটি জিনিসের তাকে দরকার হয়। জীবনের দ্বন্দ্ববিরোধ থেকে পশ্চাদ-পসরণ করে অক্রিয়তায় নিমগ্ন হওয়াকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বস্তু ও ব্যাপারসমূহের বিপুল বৈচিত্র্যের রসাস্বাদন করেছিলেন।

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
　　গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
　　ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
　　রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
　　সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি একার যুক্তি,
　　ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
　　মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

প্রাত্যাহিক জীবন, বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক সংগ্রাম, সবই এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে যে বাস্তব দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ; কিন্তু এই ঘটনাটা স্বীকার করাই বাস্তবের তল পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়: প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিপরীতগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের মূল পর্যন্ত যেতে হবে। শুধু দার্শনিকরাই নন, লেখক ও কবিরাও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ১৭শ শতাব্দীর আফগান কবি **আবদুল কাদির খাঁ** লিখেছিলেন:

মন্দ ভোগে ভালোয় আর দয়া ভোগে মন্দে,
দয়া যাহার যাথার্থ্য দয়, মন্দ ক্রোধে নিন্দে।

বিপরীতসমূহ আন্তঃসম্পর্কিত। হেরাক্লিটাস বলেছিলেন: 'সব কিছু এক — বিভাজ্য ও অবিভাজ্য. জাত ও অজাত, নিখিল বিশ্বে বিদ্যমান নিয়ন্ত্রক শক্তি ও চিরন্তনতা, পিতা ও পুত্র...'* বিপরীতসমূহের মধ্যেকার যোগসূত্রটি ঘনিষ্ঠ ও অটুট, এবং সেগুলি তার বহিঃস্থ নয়। দৃষ্টান্ত হল, যন্ত্রনির্মাণবিদ্যায় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, গণিতে যোগ ও বিয়োগ, কিংবা রসায়নশাস্ত্র ও জীববিদ্যায় যোজন ও বিষঙ্গ, অবধারণায় বুদ্ধিগত ও ইন্দ্রিয়গত।

দ্বন্দ্ব অবশ্য শুধুই বিপরীতের ঐক্য নয়। বিপরীতসমূহের মধ্যে সংঘাত হল সংগ্রাম; এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিকাশ ঘটে, সংগ্রাম হল বিপরীতসমূহের

---

* প্রাচিন গ্রীসের বস্তুবাদীরা। পলিতিজদাত প্রকাশন, মস্কো, ১৯৫৫, পৃঃ ৪৫, (রুশ ভাষায়)।

মধ্যেকার সম্পর্কের সারমর্ম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সমাজে বিপরীতসমূহের সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামের রূপ ধারণ করে,আর প্রকৃতিতে — মিথষ্ক্রিয়ার (অর্থাৎ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, ইত্যাদির)। মহান জার্মান কবি ও দার্শনিক ইয়োহান ভলফ্‌গাঙ গ্যেটে এই মত পোষণ করতেন যে খোদ জীবনই দ্বন্দ্বময়, তা হল ভালো ও মন্দের মধ্যে, প্রেম ও ঘৃণার মধ্যে, আনন্দ ও কষ্টভোগের মধ্যে এক সংগ্রাম।

প্রত্যেক দ্বন্দ্বের আছে নিজস্ব ইতিহাস: তা দেখা দেয়, বৃদ্ধি পায় (জটিল হয়), তার পর মীমাংসিত হয়। সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি অমীমাংসেয় হতে পারে; সেরূপ ক্ষেত্রে সেগুলিকে বলা হয় বৈরমূলক। দাসেরা ও দাস-মালিক, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত, মজুরি-শ্রম ও পুঁজি এই ধরনের।

আধিবিদ্যাবাদীরা বিপরীতের ঐক্যকে অস্বীকার করেন, তাঁরা মনে করেন যে প্রত্যেকটি থাকে স্বকীয়ভাবে। এই অভিমত অবৈজ্ঞানিক, কেননা একটির বিনাশের ফলে অপরটির বিনাশ হয়। যাঁরা বিপরীতের ঐক্যকে স্বীকার করেন অথচ সেগুলির মধ্যে সংগ্রামকে অস্বীকার করেন, তাঁরাও আধিবিদ্যক অবস্থানের অধিকারী। রাজনীতিতে, এর ফল হয় প্রকৃতই বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলির কঠোরতা লঘুকরণ, এবং আপোস। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুঁজিবাদের সাফাই-গাইয়েরা প্রায়শই জানান যে তার 'ভালো' ও 'মন্দ' দিক আছে, এবং তার 'ভালো' দিকগুলির বিকাশ ঘটিয়ে 'মন্দ' দিকগুলি দূর করলে 'সর্বজনের কল্যাণের' এক

সমাজ অর্জন করা যেতে পারে। কখনও কখনও তাঁরা জোর দিয়ে বলতে শুরু করেন যে শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত হচ্ছে, কেননা একচেটিয়া মুনাফা 'ফোঁটায় ফোঁটায় নিচের দিকে পড়ছে'। কিন্তু, শ্রমজীবী জনগণ এ বিষয়ে ভালোভাবেই সচেতন যে, এখন যা কিছু তাদের আছে সেটা অর্জিত হয়েছে শোষকদের সঙ্গে তিক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, পুঁজিপতিদের কাছ থেকে তা 'ছিনিয়ে নেওয়া' হয়েছে, কোনোমতেই তা একচেটিয়া সংস্থাগুলির দেওয়া 'উপহার' নয়। একচেটিয়া সংস্থাগুলি যখন শোষণ করে এবং একজন মানুষ যখন আরেকজনের দ্বারা শোষিত হয়, তখন কোনো আপোস-মিলন হতে পারে না।

উপসংহারে বলা যায় যে জীবনে, বাস্তবে, আমরা নিয়তই **দ্বন্দ্বের সম্মুখীন** হই। দ্বন্দ্বগুলিই **বিকাশের** মুখ্য সারবস্তু ও **উৎস**। সেগুলিকে জানার গুরুত্ব এখানেই, কেননা এই জ্ঞান মানুষের ক্রিয়াকলাপকে কার্যকর করে। তাই প্রশ্ন ওঠে: দ্বন্দ্বগুলি চিন্তনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়?

ডায়ালেকটিকস ও একলেকটিকস

এই প্রশ্নটা পুরোপুরি বোঝার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়টি আমাদের অবশ্যই গণ্য করতে হবে: আমাদের চিন্তন যদি পরস্পরবিরোধী না হয়, তা হলেই তা সঠিক। বস্তুতপক্ষে, একই জিনিসের ব্যাপারে একই সময়ে বিপরীত মতামত ব্যক্ত করা উচিত নয়। চিন্তনে

পরস্পরবিরোধিতা ঘটতে দিয়ে আমরা সঠিক চিন্তনের নিয়ম লঙ্ঘন করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একই ব্যক্তি সম্পর্কে এই কথা বলা অসম্ভব যে সে যুগপৎ জীবিত ও মৃত। লোকে অবশ্য মারা যায়, কিন্তু একজন ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে, তা হলে তার উপরে আমরা শুধু সেই গুণটাই আরোপ করি, এই ঘটনা সত্ত্বেও যে কয়েক বছর পরে সে মারা যাবে। তখন আমরা বলব: সেই লোকটি মারা গেছে।

যাই হোক, আমরা এটা দেখিয়েছি যে পৃথিবীতে ব্যাপারসমূহ পরস্পরবিরোধী। ১৭শ শতাব্দীর শুরুতে আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে এক বিতর্ক চলেছিল আলোকবিদ্যার ক্ষেত্রে: তা কি ছেদহীন ও তরঙ্গসদৃশ এবং তাই তরঙ্গের নিয়মাধীন, না কি তা ছেদযুক্ত, সূক্ষ্ম কণিকাকার, এবং তাই কণিকার নিয়মাধীন? আলোর দুটি বিপরীত তত্ত্ব সৃষ্ট হয়েছিল: তরঙ্গ ও কণিকাকার। দুটি তত্ত্বের মধ্যে কোনটি ঠিক তাই নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক চলেছিল; যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছিল উভয় তত্ত্বেরই সমর্থনে। ইংরেজ বিজ্ঞানী **আইজাক নিউটন** বহু পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে আলোকের এক ছেদযুক্ত, অসম্বদ্ধ প্রকৃতি আছে এবং তা হল কণার, সূক্ষ্ম কণিকার এক প্রবাহ। পক্ষান্তরে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী **ক্রিস্টিয়ান হ্যুইগেন্স** আলোকগত বিচ্ছুরণ ও ব্যাহতি বিষয়ক আবিষ্কারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে আলোক হল এক ছেদহীন মাধ্যমের তরঙ্গসদৃশ গতি। মনে হতে পারে যে এই সিদ্ধান্তদুটির মধ্যে মাত্র একটিই

সত্য হতে পারত; কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ এই ঘটনাটাকে জোরালোভাবে তুলে ধরেছে যে এই 'অদ্ভুত' ব্যাপারটি এক পরস্পরবিরোধী, দ্বান্দ্বিক প্রকৃতির। পরে প্রতিপন্ন হয়েছে যে আলোক যুগপৎ তরঙ্গ ও কণিকাসমূহের গতি। ১৯শ শতাব্দীতে প্রমাণিত হয়েছিল যে তরঙ্গ শুধু দৃশ্যমান আলোকেরই চারিত্রবৈশিষ্ট্য নয়, বিদ্যুৎ চুম্বকত্ব ও অন্য অনেকগুলির প্রক্রিয়ারও বৈশিষ্ট্য। প্রমাণিত হয়েছিল যে আলোক, বিদ্যুৎ ও চুম্বকতা হল একটিমাত্র চৌম্বক ক্ষেত্রের স্পন্দন। সেই শতাব্দীর শেষ দিকে ও ২০শ শতাব্দীর শুরুতে বিপুল পরিমাণ আবিষ্কার ঘটেছিল, এবং সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছিল যে একটি ছেদহীন চৌম্বক ক্ষেত্র একই সঙ্গে এক ছেদযুক্ত, অসম্বদ্ধ ও কণিকাকার ব্যাপারও বটে।

এইভাবে, দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য বেতার তরঙ্গ, রঞ্জনরশ্মি, বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব, তাপ বিকিরণ ও বিশোষণ, সাধারণভাবে শক্তি, ফটোএফেক্ট, ইত্যাদি সম্বন্ধে আরও বেশি জানা গিয়েছিল, প্রথমত, সেগুলির স্বকীয় পরস্পরবিরোধী প্রকৃতির অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যার দরুন, এবং দ্বিতীয়ত, অসম্বদ্ধ ও ছেদহীন, পদার্থের হ্রস্বতম অখণ্ড পরিমাণ ও তরঙ্গ — এই বিপরীতের ঐক্য হিসেবে সেগুলি অধ্যয়নের দরুন।

অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল পারমাণবিক পদার্থবিদ্যায়, বিদ্যুতিন ও অন্যান্য প্রাথমিক কণিকা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে। প্রমাণিত হয়েছিল যে সেগুলির প্রকৃতিও একই সঙ্গে পরস্পরবিরোধী, অসম্বদ্ধ ও

তরঙ্গসদৃশ, তাই কোয়াণ্টাম ও তরঙ্গ বলবিদ্যা আত্মপ্রকাশ করেছিল ও তার পরে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, এই ঘটনা সত্ত্বেও যে একটি কণিকা ও একটি তরঙ্গ হিসেবে বিদ্যুতিন সম্বন্ধে ধারণাকে খাপ খাওয়ানো মূলগতভাবে অসাধ্য।

অতএব, একটি বস্তু বা ব্যাপার যদি পরস্পরবিরোধী হয়, তবে আমাদের চিন্তনেও তা নিশ্চয় সেইভাবেই প্রতিফলিত হবে। জীবনও পরস্পরবিরোধী, তাই বাস্তবকে বোঝার জন্য খোলা মন থাকা দরকার। জীবনের দ্বান্দ্বিকতা অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে আমাদের চিন্তনের দ্বান্দ্বিকতায়, ধ্যানধারণার দ্বান্দ্বিকতায়।

কিন্তু কিছু কিছু দার্শনিক যে সমস্ত অভিমত ও তত্ত্ব একটির সঙ্গে অপরটি মেলে না, সেগুলিকে যথেচ্ছভাবে মিলিয়ে মনের উন্মুক্ততাকে ভ্রান্তভাবে বিবেচনা করেছেন। এই ধরনের দার্শনিকদের বলা হয় **একলেকটিক** বা সারগ্রাহী। একলেকটিসিজম বা সারগ্রাহিতা হল বিভিন্ন ধারার ধ্যানধারণার এক সংগতিহীন ও নীতিহীন মিলন। তা খ্যাত এই ঘটনার জন্য যে যাকে মেলানো যায় না তাকে মেলাতে চেষ্টা করে, এবং একটি বস্তুকে যা এক ঐক্য প্রদান করে সেই বাস্তব যোগসূত্রগুলি তা দেখতে অপারগ।

আমরা যদি প্রথমে বলি, 'বস্তু মনের জন্ম দেয়', এবং তার পর বলি, 'মন থাকে স্বকীয়ভাবে, তা প্রকৃতি-নিরপেক্ষ', এবং তার পর যদি জোর দিয়ে বলি যে এই দুটি প্রতিজ্ঞা মিলনসাধ্য, তা হলে আমাদের বলা

হবে একলেকটিক। আলোচ্য ক্ষেত্রে, একলেকটিসিজম প্রকাশ পায় মূলগতভাবে পৃথক অভিমতগুলির, যেগুলিকে সমান মূল্যের বলে ধরে নেওয়া হয় সেই অভিমতগুলির, অর্থাৎ বস্তুবাদ ও ভাববাদের এক যান্ত্রিক মিলনের মধ্যে।

আধুনিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদরা একলেকটিসিজমকে ডায়ালেকটিকসের প্রতিকল্প হিসেবে স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। তা পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সমকেন্দ্রাভিমুখতার' সারগ্রাহী তত্ত্বে, যে তত্ত্ব অনুযায়ী বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মিলিয়ে একটি ব্যবস্থায় পরিণত করা যায়। কিছু কিছু রাজনীতিক শুধু তত্ত্বেই নয়, রাজনীতিতেও একলেকটিসিজম বা সারগ্রাহিতা ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন। যথানির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী কিছু কিছু ধারণার জায়গায় সুকৌশলে অন্য কিছু ধারণা প্রতিস্থাপিত করার কাজে বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদ ও রাজনীতিকরা বিজ্ঞাপনে, প্রচারে, গণ-প্রচারবাহনে — রেডিও, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, সিনেমায় — সারগ্রাহিতার দ্বারা লাভবান হন এবং নির্ভর করতে চেষ্টা করেন ফ্যাশন, আচার-প্রথা, পরম্পরা, ও মানুষের মনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণের উপরে।

ডায়ালেকটিকসের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বিবেচনা করা যাক। আমরা সবাই জানি যে ডায়ালেকটিকস কোনো কিছুকেই চিরতরে নির্দিষ্ট বলে স্বীকার করে না, কোনো কিছুকে সসীম বা অনন্ত

বলে গণ্য করে না। সব কিছুই নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, নিরন্তর চলছে ও পুনর্নবায়িত হচ্ছে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা কিছু কিছু বস্তু ও ব্যাপার একটি অপরটিকে প্রতিস্থাপিত করে, তার কোনো শেষ নেই। কিন্তু সেই গতির, খোদ বিকাশের গতিমুখটি কী?

নিরাকরণের নিরাকরণ

প্রকৃতির ইতিহাস ও সমাজের ইতিহাস উভয়েই এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে যে বিকাশ পুরাতনের মৃত্যুবরণ ও নতুনের আবির্ভাবের সঙ্গে যুক্ত। ভূত্বকে গঠিত হয় নতুন নতুন ভূতাত্ত্বিক কাঠামো, এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে পুরনো রূপগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে নতুন নতুন, আরও ত্রুটিহীন সব রূপ। জীবন্ত জীবসত্তায় কোষগুলি পুনর্নবায়িত হয়: পুরনোগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আসে নতুন কোষগুলি। আদিম যূথবদ্ধ জীবন থেকে, ক্রীতদাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা ও মজুরি-শ্রমের মধ্য দিয়ে এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মানবজাতি এমন এক সমাজে এসে পেণছেছে যেখানে সব মানুষই সমান। শুধু প্রকৃতি আর সমাজই নয়, মানুষের, মনও পরিবর্তিত হয়: বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, আকাঙ্ক্ষা-প্রয়াস ও ভাবাবেগও পরিবর্তিত হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জাতিগুলি আজ নতুন জীবনে জেগে উঠছে।

নতুনের দ্বারা পুরাতনের প্রতিস্থাপন, অর্থাৎ নতুনের অজেয়তা প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তনের ক্রমবিকাশের এক

গ্রুত্বপূর্ণ লক্ষণ। ডায়ালেকটিকস সমস্ত বস্তু ও ব্যাপারের মধ্যে দেখতে পায় অবশ্যম্ভাবী বিনাশের (নিরাকরণের) চিহ্নকে; নিম্নতর থেকে ঊর্ধ্বতরের দিকে এক অন্তহীন গতি, আবির্ভাব ও বিনাশের খোদ প্রক্রিয়াটি ছাড়া তার হাত থেকে কিছুই রেহাই পায় না। **নিরাকরণ**, অর্থাৎ নতুনের দ্বারা পুরাতনের প্রতিস্থাপন, ঘটে সর্বত্রই। এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে: সব কিছুই যদি বার্ধক্যগ্রস্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তা হলে পৃথিবী কি তার সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলে? না, চলে না, কেননা জায়মান নতুনের মধ্যে সাধারণত থাকে পরবর্তী বিকাশের অধিকতর সুযোগ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের সঙ্গে যা যুক্ত, সেই সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব উৎপাদন ও খোদ মানুষের বিকাশের বিস্তৃততর দিগন্ত উন্মুক্ত করে। আর এই জন্যই নতুন অজেয়।

কিন্তু পুরনোকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, তার নিরাকরণের মধ্য দিয়ে যদি নতুন আবির্ভূত হয়, তা হলে তার অন্তঃসার আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। কখনও কখনও নিরাকরণ বলতে কোনো একটি ব্যাপারের নিছক বিনাশ বোঝা হয়, যে বিনাশের ফলে তার মৃত্যু ঘটে ও সেটির বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি উদ্ভিদের বীজকে যদি চূর্ণ করা হয়, তা হলে তাতে অঙ্কুরোদগম হবে না, তাই তা থেকে কোনো নতুন উদ্ভিদ জন্মাতে পারবে না। ফুল যদি পদদলিত করা হয়, কিংবা অরণ্য ও বাগিচা কেটে ফেলা হয়, তবে তা বিনাশের সমতুল। আমরা এমন

বেশ কিছু উদাহরণ জানি যেখানে নিরাকরণ বস্তুতপক্ষে সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। দরিদ্র ও নিপীড়িতদের অধিকারের জন্য যিনি লড়াই করেছিলেন সেই মার্টিন লুথার কিং-কে হত্যা করা হয়, আর চিলির দেশপ্রেমিকদের জীবন্ত কবর দেওয়া হয় ও হত্যা করা হয় জেলখানায়, আর দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে কৃষ্ণাঙ্গ-পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামীদের গুলি করে মারা হয়। গোটা এক একটা সভ্যতা ও জাতির পতন ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্পেনীয় দেশজয়ীরা ইংকা ও আজতেক রাষ্ট্রগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিল এবং তাদের সংস্কৃতিকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়েছিল। ফাশিস্তরা গ্যোর্নিকা আর লিদিসকে ভস্মস্তূপে পরিণত করেছিল। পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বলি হয়েছিল ৫ কোটি জীবন। আমাদের মনে আছে কম্পুচিয়ার ট্রাজেডির কথাও, যেখানে শহর ও মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল এবং নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল ত্রিশ লক্ষের বেশি মানুষকে।

কিন্তু নিরাকরণকে শুধুই সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনে পর্যবসিত করাটা অধিবিদ্যাবিদদের বিশিষ্ট লক্ষণসূচক। অবশ্য, এই ধরনের নিরাকরণও আছে। কিন্তু এমন নিরাকরণও আছে যা ক্রমবিকাশের বিরোধী নয়, বরং তাকে শর্তাবদ্ধ করে। ডায়ালেকটিকস নিরাকরণের বিষয়টি এইভাবেই বিচার করে। নিরাকরণ যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে সেটি বর্ণনা করলে

ক্রমবিকাশের চরিত্র, নিয়ম ও গতিমুখ সম্বন্ধে এক সঠিক উপলব্ধি আমরা লাভ করতে পারব।

বৃত্ত, সরল রেখা, না ঊর্ধ্বমুখী সর্পিলতা?

পৃথিবীতে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি ঘটে এক নির্দিষ্ট দিকে — এই ধারণা প্রাচীন কালে দেখা দিয়েছিল। বহু চিন্তক ইতিহাসকে মনে করতেন সমান একটা স্তরে ঘটমান ঘটনা-পরম্পরা বলে। তাঁরা মনে করতেন যে বিকাশ অগ্রসর হয় এক রৈখিক পথে, জন্ম থেকে সাবালকত্ব, বার্ধক্য ও মৃত্যু তার পরে আবার সব কিছুর পুনরাবৃত্তি হয়। কখনও কখনও গতিকে গণ্য করা হত একটা বদ্ধ চক্রের ভিতরে এক পরিবর্তন বলে, এক অন্তহীন প্রদক্ষিণ বলে, যেখানে সব কিছু বার বার তার যাত্রাবিন্দুতে ফিরে আসে। প্রাচীন গ্রীক গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক পিথাগরাস ও তাঁর শিষ্যরা একটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতি ৭৬,০০,০০০ বছর অন্তর সব কিছু তাদের নিজেদের অতীত দশায় প্রত্যাবর্তন করে। প্লেটো ও আরিস্ততলও মনে করতেন যে সমাজের বিকাশ ঘটে এক বৃত্তাকার পথে, পৌনঃপুনিক পর্যায়সমূহের মধ্য দিয়ে যায়। প্রাচীন চৈনিক দার্শনিক দুঙ জুঙ শু মনে করতেন যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় চক্রবৎ, কেননা নভঃলোক ও 'তাও' দুইই অপরিবর্তনীয়। ১৭শ শতাব্দীর ইতালীয় চিন্তানায়ক **জিওভান্নি বাতিস্তা ভিকো** বৃত্তাকার পথের এক বিশেষ তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন,

সেই তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজ বিকাশলাভ করে চক্রবৎ, প্রতিটি চক্র শেষ হয় সমাজের সংকট ও অবক্ষয়ে এবং এক নতুন চক্র আবার শুরু হয় আদিমতম রূপগুলি নিয়ে।

সমাজবিকাশ সম্পর্কে অন্যান্য অভিমতও প্রচলিত ছিল; দৃষ্টান্তস্বরূপ, দাবি করা হয়েছিল যে প্রাচীন 'স্বর্ণযুগের' পর থেকে সমাজ ছিল পশ্চাদ্‌গতির এক নিয়ত দশায়। এই অভিমতের অংশীদারদের মধ্যে ছিলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক **হেসিয়দ ও সেনেকা**; গতিকে তাঁরা পশ্চাদ্‌গতি বলে মনে করতেন। গতিকে উচ্চতর থেকে নিম্নতরতে যাওয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় এমন সব তত্ত্ব আজও উপস্থিত করা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেমস হপউড জিনস তাঁর *The Universe Around Us* গ্রন্থে লিখেছেন যে সমস্ত জীবন, সমাজ, এমন কি মহাবিশ্বও বিনাশের দিকে যাচ্ছে। অবশ্য, ইতিহাসে এমন সব কালপর্ব থাকে, যখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রাধান্য অর্জন করে এবং পশ্চাদ্‌গতি পরিলক্ষিত হয়, যেমন অতীতে জার্মান ফাশিবাদ ও আমাদের কালে ফাশিস্তপন্থী শাসনব্যবস্থাগুলি, যারা ইতিহাসের গতিধারাকে উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং এখন চেষ্টা করছে। কিন্তু সেগুলি মুমূর্ষু বা ক্ষীয়মান সামাজিক রূপের চেয়ে বেশি কিছু নয়, এবং সেগুলির সাফল্য সাময়িক মাত্র। শেষাবধি, নতুন পুরাতনকে প্রতিস্থাপিত করবে অমোঘভাবেই।

দ্বান্দ্বিক নিরাকরণ, বা নিরাকরণের নিরাকরণ, নিতান্ত পুরাতনের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন নয়, পশ্চাদ্‌গতি নয় বা চক্রাকারে গতি নয়। এটা হল পুরাতনের সেই ধরনের ধ্বংসসাধন যা নতুনের আবির্ভাবের সহায়ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জমির মালিকানার সম্প্রদায়গত রূপটি সমাজবিকাশের গোড়ার পর্যায়গুলিতে সকল জাতিরই বিশিষ্ট লক্ষণসূচক। শোষণমূলক কালপর্বে, শ্রেণী-বৈরমূলক সমাজব্যবস্থার অস্তিত্বের সময়ে তার নিরাকরণ হয় উৎপাদনের উপায় হিসেবে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বারা। প্রলেতারীয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আবার জমি ফিরিয়ে দেয় সমাজকে, শ্রমজীবী জনগণকে। এই সার্বজনিক সম্পত্তি-মালিকানায় জমির সেই ধরনের মালিকানা-হস্তান্তরের সম্ভাবনা রহিত হয় যার দ্বারা তা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়; এই সার্বজনিক সম্পত্তি- মালিকানার কাজ হল শ্রম উৎপাদনশীলতার সর্বোচ্চ স্তর, প্রকৃতি সংরক্ষণ ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সংস্থান করা। নিরাকরণের নিরাকরণ বলতে বোঝায় বিরাট সমাজপ্রগতি। নতুন পুরাতনকে শুধু পরিত্যাগ করে না। তার বুনিয়াদের উপরে আত্মপ্রকাশ করে পুরাতনের ইতিবাচক দিকগুলিকে তা বজায় রাখে এবং বিকাশ চালিয়ে যায় এক উচ্চতর স্তরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উচ্চতর জীবসত্তাগুলি নিম্নতর জীবসত্তাগুলির নিরাকরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির কোষিক গঠনকাঠামো বজায় রাখে; এক নতুন সমাজব্যবস্থা, পুরনো সমাজব্যবস্থার নিরাকরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার উৎপাদিকা শক্তিসমূহকে এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে

কৃতিত্বগ‍ুলিকে বজায় রাখে। কবি ও মধ্য এশীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা র‍ুদাগি লিখেছিলেন:

এমনই চিরকাল: নতুন সে অচিরেই হয় প‍ুরাতন,
নবতম নেয় তার স্থান প‍ুনরায়।*

যিনি মনে করতেন যে প‍ুরাতনের নিরাকরণ করে প‍ুরাতন থেকে নতুন বিকাশলাভ করে, সেই হেগেলের অভিমত দ্বান্দ্বিক নিরাকরণ (নিরাকরণের নিরাকরণ) বোঝার পক্ষে সবচেয়ে গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ; দ্বান্দ্বিক নিরাকরণ হল নতুনের বিকাশে একটি উপাদান, তারই মধ্যে থাকে নতুনের বীজ, ইত্যাদি। নতুন হল সেটাই যেটা আরও বেশি ত্র‍ুটিহীন ও প্রাণবন্ত। তা প্রথমে দ‍ুর্বল হতে পারে, কিন্তু বিকাশলাভ করতে-করতে তা প‍ুরনোকে বর্জন করে। প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যেই অন‍ুস্যূত থাকে নতুনের অংকুর, কিংবা বর্তমানকে যা প্রতিস্থাপিত করবে সেই জিনিসটি। এ কথা সত্য যে হেগেল ভাবকে (অন্তরাত্মা, বা বিচারব‍ুদ্ধি) বিকাশের হেতু বলে নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর তত্ত্ব ভাববাদী ছিল, তব‍ুও তার মধ্যে ছিল 'য‍ুক্তিসহের কণা' অর্থাৎ অনেক কিছ‍ু যা সঠিক। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা হেগেলের ভাববাদের মধ্যে এই 'য‍ুক্তিসহের কণাগ‍ুলি' লক্ষ করেছিলেন এবং তাঁর দ্বান্দ্বিক মতবাদ থেকে এমন একটা সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন যা তিনি পারেন নি: 'যা কিছ‍ু বিদ্যমান সে সবই বিনাশযোগ্য।'

---

* র‍ুদাগি। কবিতা। স্তালিনাবাদ, ১৯৪৯, প‍ৃঃ ১০৩, (র‍ুশ ভাষায়)।

দ্বান্দ্বিক নিরাকরণ (নিরাকরণের নিরাকরণ) হিসেবে যে বিকাশ ঘটে তা সামনের দিকে এগোয় অর্থাৎ **এগিয়ে চলে**: তা যায় নিম্নতর থেকে উচ্চতরর দিকে, সরল থেকে জটিলে। প্রকৃতিতে লক্ষ করা যায় অজৈব জগৎ থেকে জৈব জগতে এক উত্তরণ: এ ক্ষেত্রে প্রগতি হল সেই গঠনকাঠামোগত রূপগুলির জটিলভবন, যার ফলে পৃথিবীতে জীবনের আত্মপ্রকাশ ঘটে; তা সম্ভব হয়েছে আমাদের ভূমণ্ডলে — মঙ্গলগ্রহ বা শুক্রগ্রহে নয় — তাপমাত্রা ও আবহমণ্ডলগত অবস্থার অনুকূলতম মিলনের দরুন। প্রগতির ধারণা জীব জগতের তত্ত্বে প্রবেশ করেছে তুলনামূলকভাবে সম্প্রতি; সঞ্চিত অভিজ্ঞতা-জ্ঞাত তথ্যাদি বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্ত টানতে সক্ষম করেছে যে চেতন প্রকৃতির ক্রমবিকাশ অগ্রসর হয় সরল থেকে জটিলে। জাঁ লামার্ক কর্তৃক বিশদীকৃত তত্ত্ব, তথা চার্লস ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব এ ব্যাপারে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বান্দ্বিক প্রগতিশীল বিকাশ কী? একে বর্ণনা করা যেতে পারে **ঊর্ধ্বমুখী সর্পিলতায়** গতি হিসেবে। তা উপরের দিকে যায়, সরল রেখায় নয়, বরং এক চক্র রেখায়, যেন বারংবার তা পুনঃসংঘটিত হচ্ছে। এক জটিল বক্ররেখায় অগ্রসর হয় এমন বিকাশের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে অচেতন প্রকৃতি থেকে, জীববিদ্যা ও মানবেতিহাস থেকে। 'তবুও আমি পছন্দ করি অবাধে হাতে-আঁকা সর্পিল রেখা, যার বাঁকগুলি খুব যথাযথভাবে আঁকা নয়। ইতিহাস তার গতি শুরু করে ধীরে ধীরে এক অদৃশ্য বিন্দু থেকে, সেটির চার

দিকে মোড় নেয় ঢিলেঢালাভাবে, কিন্তু তার বৃত্তগুলি আরও বড় হয়ে ওঠে, আরোহণটা হয়ে ওঠে আরও দ্রুত ও আরও বেশি প্রাণবন্ত, অবশেষে ইতিহাস এক জ্বলন্ত ধূমকেতুর মতো তীরবেগে ছুটে যায় নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে, কখনও পুরনো পথগুলি আলতোভাবে স্পর্শ করে, কখনও সেগুলিকে কাটাকুটি করে, এবং প্রতিটি মোড়ের সঙ্গে সঙ্গে তা অনন্তের কাছাকাছি আসে'* সর্পিল রূপটি এই ঘটনাকে স্পষ্ট করে যে প্রত্যেকটি পাক যেন নিম্নতর পাকটির পুনরাবৃত্তি করে, আর সর্পিল রেখার ব্যাসার্ধে এক বৃদ্ধি ও পাকটির বিস্তৃতি বিকাশ-হারের পরিমাণ ও ত্বরণের সম্প্রসারণের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে, এই ঘটনাটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে যে তা আরও বেশি জটিল হয়ে উঠছে।

আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল কয়েক ডজন সহস্রাব্দ ধরে। তাকে প্রতিস্থাপনকারী দাস-মালিক ব্যবস্থা ছিল মাত্র কয়েক সহস্রাব্দ। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল আরও তাড়াতাড়ি: দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইউরোপে তার অস্তিত্ব ছিল প্রায় দেড় সহস্রাব্দ। এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকবে আরও সংক্ষিপ্তকাল। ২০শ শতাব্দীতে ইতিমধ্যেই মানবজাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে

---

* Frederick Engels, *Retrograde Signs of the Times,* in: Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Vol. 2, 1975, p. 48.

দেখা গেছে। এক নতুন সমাজব্যবস্থায়, উচ্চতম সমাজব্যবস্থায় — শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজে — উত্তরণের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব। আমরা বাস করছি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের যুগে, যখন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং নতুন নতুন জাতি সমাজতন্ত্রের পথ অবলম্বন করছে।

তাই, দ্বান্দ্বিক নিরাকরণ হল পুরনো থেকে নতুনে বিকাশ, যখন পুরনোকে স্রেফ বাতিল করে দেওয়া হয় না, বরং নতুনের মধ্যে বজায় রাখা হয় তার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে। নতুন আবার বিকাশলাভ করার পর পুরনো হয়ে যায়, তাই খোদ নিরাকরণেরই নিরাকরণ হয় এক জায়মান ব্যাপারের দ্বারা। এবং এইভাবেই চলে অনন্তকাল পর্যন্ত। পুরনোর সঙ্গে নতুনের নিয়ত সংগ্রাম হল বিকাশের একটি নিয়ম; নতুনের অজেয়তা হল আরেকটি নিয়ম।

এই জায়গায় একটি প্রশ্ন উঠতে পারে: 'নতুন' বলতে কী বোঝা উচিত? বহুকাল ধরেই এ কথা সুবিদিত যে ধরাধামে কিছুই নতুন নয়, নতুন হল একটা সম্পূর্ণ বিস্মৃত পুরাতন, সব কিছু পুরো চক্র ঘুরে আসে, ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণত এই ধরনের কথাবার্তা প্রচার করে রক্ষণশীলরা, বিদ্যমান ব্যবস্থাকে যারা প্রহরা দেয় তারা, অথবা অধিবিদ্যা-মনস্ক চিন্তক ও মতান্ধরা। অধিবিদ্যার প্রতিতুলনায় ডায়ালেকটিকস সর্বপ্রথমে জোর দেয় বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটির উপরে — নতুনের গুণগত প্রভেদমূলক বৈশিষ্ট্য আর

পুরাতনের প্রতি তার দ্বান্দ্বিক বিরোধিতাকে। মনে রাখা উচিত যে পুরনো (রক্ষণশীল, এমন কি প্রতিক্রিয়াশীলও) প্রায়শই নিজেকে নতুন হিসেবে চালাতে চেষ্টা করে, যদিও সারগতভাবে তা নয়। কিন্তু নতুন বলে বিঘোষিত সব কিছুই নতুন নয়। কখনও কখনও দর্শনের একটা ধারা গজিয়ে ওঠে, নিজেকে নতুন বলে জাহির করে, কিন্তু আসলে তা পুরনো নীতিগুলিই আবার আওড়ায়, 'নতুন' পরিভাষার পিছনে তা লুকনো থাকে মাত্র। পশ্চিমে, সমাজতন্ত্রের কোনো 'নতুন' পথের কথা প্রায়শই বলা হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাব করা হয় সংস্কারকর্মের এমন একটা পথের, যে পথ সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে পারে না।

অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানকে যুক্ত করে এবং পুরনোর মধ্যে নতুনের অংকুর আবিষ্কার করে ডায়ালেকটিকস বিকাশে ধারাবাহিকতার সাক্ষ্য দেয়। তা হলেও ডায়ালেকটিকসকে প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশের সর্বজনীন নিয়মে পর্যবসিত করা যায় না; তা জ্ঞানের একটা পদ্ধতিও বটে, যা সত্যের সন্ধানে সাহায্য করে। অবধারণার পদ্ধতি হিসেবে ডায়ালেকটিকসকে সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করার জন্য 'পদ্ধতির' ধারণাটা বিবেচনা করা যাক।

পদ্ধতিতত্ত্ব — বিজ্ঞানের আত্মা

মানুষের ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসরণ করে চলে। স্বভাবতই, প্রত্যেকে তার নিজের ক্রিয়াকলাপের

সন্দূর ফলাফল, নিয়ত বা মাঝে মাঝে, কোনোভাবেই কল্পনা করতে পারে না, কিন্তু নিকটতম লক্ষ্যগুলি, যেগুলি মানুষের মূর্ত ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি, সেগুলি স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। অবধারণার প্রক্রিয়ায় মানুষ মেনে চলে সেই নিয়মগুলি, যেগুলি বাস্তবকে বুঝতে এবং তার প্রতি জীবনের দেওয়া কর্তব্যকর্মের সমাধান আবিষ্কার করতে তাকে সক্ষম করে। এই নিয়মগুলি সারগতভাবেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিজ্ঞানে এই নিয়মগুলি হল নতুন জ্ঞান লাভের উপায়, অর্থনীতিতে সেগুলি হল উৎপাদনের কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের জন্য উদ্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলির এক সাকল্য, শিক্ষায় — শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ক্রিয়াকলাপকে যা যুক্ত করে, ইত্যাদি। মানুষ তার ক্রিয়ায় নির্দিষ্ট কিছুটা জ্ঞান থেকে আহরণ করে; সেই সঙ্গে, তার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সময়ে সেই এই জ্ঞানকে সংশোধন ও বিকশিত করে এবং নতুন জ্ঞানও অর্জন করে। জ্ঞান ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এক আভ্যন্তরিক সম্পর্ক আছে, যা কার্যকর হয় নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়মের সাহায্যে। **পদ্ধতিতত্ত্ব** হল অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান-ভিত্তিক এক প্রস্থ প্রতিষ্ঠিত নিয়ম; গবেষকের কাছে তার নির্দিষ্ট কিছু দাবি থাকে, যাকে প্রকাশ করা যায় নির্দিষ্ট পদ্ধতি, নিয়ম-কানুনের এক প্রণালীর মধ্যে।

গোড়ার দিকে, জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যবহৃত আদিম পদ্ধতিগুলি ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে প্রযুক্ত হত স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কিন্তু সেই প্রাচীন কালেই

অবধারণাগত পদ্ধতিগুলির প্রয়োগে অর্জিত অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করার প্রচেষ্টা হয়েছিল ডেমোক্রিটাস ও প্লেটোর রচনায়। আরিস্ততল বিশদ করেছিলেন অবরোহী প্রথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, যার দ্বারা নতুন জ্ঞান অর্জন করা যায় যুক্তিকে তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যা আগে জ্ঞাত হয়েছিল। অবধারণাগত পদ্ধতির বিশদীকরণে বড় অবদান রেখেছিলেন আরোহী প্রথায় বিচারের পদ্ধতির স্রষ্টা ফ্র্যান্সিস বেকন; এই পদ্ধতি অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে লব্ধ বিশেষ জ্ঞান থেকে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব করে তুলেছিল। বৈজ্ঞানিক অবধারণায় পদ্ধতিতত্ত্ব যে ভূমিকা পালন করে তার চারিত্র্যনির্ণয় করতে গিয়ে বেকন একটা উপমা টেনেছিলেন লণ্ঠনের সঙ্গে, অন্ধকার পথকে যা একজন পথিকের জন্য আলোকিত করে। অবধারণার পদ্ধতিসমূহ সম্বন্ধে রেনে দেকার্ত এক ভিন্ন মত পোষণ করতেন, তিনি বলতেন যে সকল জ্ঞানেরই ভিত্তি হওয়া উচিত যথাযথ প্রমাণ এবং তা আসা উচিত একটিমাত্র অকৃত্রিম নীতি থেকে। দর্শনকে গণিতশাস্ত্রের চেয়ে কম যথাযথ বিজ্ঞান হলে চলবে না, এবং জ্ঞানের স্বচ্ছতা ও স্পষ্ট প্রতীয়মানতা তার প্রামাণ্যতার মানদণ্ড হতে হবে। অবধারণাগত পদ্ধতিসমূহের উপরোক্ত তত্ত্বগুলির সব কটিরই একটি অভিন্ন ত্রুটি আছে: সেগুলি যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন সেই দার্শনিকরা মূর্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জনের জন্য সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত এক নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে একটা সামূহিক, সর্বজনীন পদ্ধতিতত্ত্বে

পারণত করতে চেষ্টা করেছিলেন। ইমান্‌য়েলা কাণ্ট এই ন্‌টি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিলেন এক নতুন সর্বজনীন দার্শনিক পদ্ধতির প্রস্তাব দিয়ে, যেখানে নিয়ামক ভূমিকা হল চিন্তার। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা অসফল হয়েছিল, কেননা তার ভিত্তি ছিল ভাববাদ। কিছ্‌কাল পরে এই কাজটা হাসিল করেন হেগেল।

ভাববাদ পদ্ধতিকে পর্যবসিত করে যথেচ্ছভাবে প্রতিষ্ঠিত কতকগ্‌লি নিয়মে (কল্পনায় নির্মিত বস্তুতে), যা কতকগ্‌লি প্রয়োজন মেটায়। একটি দ্‌ষ্টান্ত হিসেবে উপযোগিতার নীতিটি উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু উপযোগিতা তো একটা অনাপেক্ষিক গ্‌ণ নয়, তা নির্দিষ্ট কিছ্‌ লোক, সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। স্‌তরাং, একজনের পক্ষে যা উপযোগী, অন্য আরেকজনের পক্ষে তা ক্ষতিকর হতে পারে। একজন প্‌ঁজিপতি, ব্যাংকার ও ভূস্বামীর পক্ষে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা ও মজ্‌রি-শ্রম শোষণ উপযোগী, পক্ষান্তরে কৃষক ও শ্রমিক শোষণের কৃষক বির্‌দ্ধে লড়াই করে। প্‌ঁজিপতিদের পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয় করাটা উপযোগী, কেননা তা থেকে বিপ্‌ল ম্‌নাফা আসে, পক্ষান্তরে শ্রমজীবী জনগণ অস্ত্র প্রতিযোগিতার বির্‌দ্ধে ও উত্তেজনা প্রশমনের জন্য লড়াই করে এবং শান্তি দাবি করে।

পদ্ধতিতত্ত্বের সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত রচনাগ্‌লিতে; তাতে দেখানো হয়েছিল যে অবধারণার পদ্ধতিগ্‌লি অন্‌ধ্যানে, বস্তুগত ক্রিয়াকলাপ থেকে, বিষয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে

দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের বিশদীকৃত এক প্রস্ত যথেচ্ছ রীতিপ্রণালী ও নিয়ম নয়। জ্ঞানের পথ সঠিক, বা খাঁটি শুধু তখনই, যখন প্রযুক্ত পদ্ধতিতত্ত্ব অন্তর্বস্তুতে **বিষয়মুখ**, অর্থাৎ বাস্তব জগৎ ও মানবিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বস্তুবাদী পদ্ধতির ভিত্তি হল কর্মপ্রয়োগ। মানুষ কাজ করতে শুরু করার আগে, কোন কোন পদ্ধতি ব্যবহার করবে, তার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে কী কী ফল লাভ করবে সে সম্পর্কে চিন্তা করেছিল। ব্যবহারিক ক্রিয়ার এই ধরনগুলি মানুষের চৈতন্যে ঐতিহাসিকভাবে সঞ্চিত (স্মৃতিধৃত) ছিল। সঠিকভাবে বিশদীকৃত পদ্ধতিতত্ত্ব-ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপ একটি নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। সেই জন্যই, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, রাজনীতি ও উৎপাদনে এত বিরাট মনোযোগ দেওয়া হয় নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিগুলির বিশদীকরণ, প্রতিপাদন ও বাছাইয়ের উপরে। চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার পদ্ধতিসমূহ রয়েছে; গণিতশাস্ত্রে রয়েছে গণনার অসংখ্য পদ্ধতি; শিক্ষাবিজ্ঞানে — শিক্ষাদান ও লালনের পদ্ধতি; ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের — ইমারত ও সেতু নির্মাণের পদ্ধতি, যন্ত্র ডিজাইনিংয়ের পদ্ধতি, ইত্যাদি। সামাজিক ব্যাপারসমূহ অধ্যয়নে প্রযুক্ত পদ্ধতিগুলি সমাজজীবনের ও তার নিয়মগুলির সুনির্দিষ্টতা দিয়ে নির্ধারিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন সমাজবিজ্ঞানী ব্যবহার করেন সুনির্দিষ্ট সমাজতত্ত্বগত গবেষণার পদ্ধতিগুলি, যেমন সমীক্ষা, প্রশ্নাবলী ও পরীক্ষা; তিনি প্রয়োগ করেন তুলনামূলক বিশ্লেষণ,

বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী করা কম্পিউটারের হিসাব, ইত্যাদি।

ক্রিয়াকলাপ ও অবধারণার পদ্ধতিগুলির দার্শনিক মতবাদকে বলা হয় **পদ্ধতিতত্ত্ব**।

বিভিন্ন বিজ্ঞানে প্রযুক্ত পদ্ধতিগুলি একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত, এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এটা একটা বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ। অবশ্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভূতত্ত্ব, ভূগোলবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্বে ব্যবহৃত হয় এমন বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিও আছে, যেগুলি কেবল এই সমস্ত বিজ্ঞানেই ব্যবহৃত হয়। অন্য দিকে রাসায়নিক, পদার্থবিদ্যাগত ও গাণিতিক পদ্ধতিগুলি প্রযুক্ত হয় অন্যান্য বিজ্ঞানেও — জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাবিদ্যা ও শিল্পকলা তত্ত্বে। বিজ্ঞানে, জ্ঞানের একটি ক্ষেত্রকে আরেকটি ক্ষেত্র থেকে পৃথক করার, জ্ঞানকে প্রভেদীকৃত করার একটা প্রবণতা যে শুধু আছে তাই নয়, বিজ্ঞানগুলিকে সংবদ্ধ করারও একটা প্রবণতা আছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সংবদ্ধতাসাধনের সাক্ষ্যবহ পদ্ধতিগুলির বিনিময় পৃথিবীর একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক চিত্র, তার এক অভিন্ন দৃশ্য সৃষ্টি করার জন্য বিজ্ঞানীদের দৃঢ়পণকে প্রতিফলিত করে।

সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পাশাপাশি, বোধগম্যভাবেই, আছে সাধারণ পদ্ধতিগুলি, কারণ মানুষকে তাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শুধু যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক সমস্যারই মোকাবিলা করতে হয় তাই নয়, আরও সাধারণ, বিশ্বব্যাপী ধরনের সিদ্ধান্তও তাদের নিতে হয়। এই সমস্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ

সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার হয় বিশেষ সব পদ্ধতি, এক বিশেষ পদ্ধতিতত্ত্ব। বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বনিয়াদ হিসেবে যা কাজ করে এবং যা পৃথিবীর প্রতি মানুষের মনোভাব নির্ধারণ করে, সেই দর্শন মানুষকে সেই সমস্ত সাধারণ নিয়মও যোগায়, যে নিয়মগুলির দ্বারা মানুষ তার জীবনে এবং নিজের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ক্রিয়াকলাপে চালিত হবে। দর্শন সাধারণ নিয়মও সৃষ্টি করে, এই নিয়ম মানুষ তার জীবন ও কার্যকলাপে ব্যবহার করে।

বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ থেকে দার্শনিক পদ্ধতিসমূহ কীভাবে আলাদা হয় এবং অবধারণায় সেগুলি কী ভূমিকা পালন করে? দার্শনিক পদ্ধতিসমূহ **সর্বজনীন**, অর্থাৎ সেগুলি প্রয়োগ করা যায় জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে। সেগুলি মূর্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির প্রতিকল্প নয়, বরং সেগুলির মধ্য দিয়ে ক্রিয়া করে এবং জ্ঞানের যে কোনো ক্ষেত্রে সত্যের দিকে মানুষকে পথনির্দেশ দেয়। সেগুলি বিষয় ও বস্তুসমূহ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উপায় হিসেবে কাজ করে, কেননা সেগুলি বিষয়সমূহের মধ্যে প্রকাশ করে বিকাশের বিশ্বজনীন নিয়মের অভিব্যক্তিকে। সুতরাং, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডায়ালেকটিকসের নীতিসমূহ, ক্রমবিকাশের নীতি (ইতিহাসবাদ) কাজ করে জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে, যেমন — জীববিদ্যায় ক্রমবিকাশের মতবাদ, নক্ষত্রমণ্ডলীর উদ্ভব ও বিকাশের বিভিন্ন তত্ত্ব, ইতিহাসে মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী তত্ত্ব। ডায়ালেকটিকসের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার

উৎস হিসেবে দ্বন্দ্বের তত্ত্ব, বিকাশে ধারাবাহিকতার নীতি হিসেবে নিরাকরণের নিরাকরণ বিষয়ক তত্ত্ব, নতুনের অজেয়তার তত্ত্ব, ইত্যাদি। সমসাময়িক বিজ্ঞান -- পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, প্রভৃতি -- সর্বজনীন দার্শনিক ধারণাগুলিকে কাজে লাগায়, যেমন -- হেতুবাদ, নিয়মবদ্ধতা, স্থান, কাল, আপতন, আবশ্যিকতা, ইত্যাদি।

পৃথিবীতে ব্যাপারসমূহের বিষয়গত বাস্তবতাকে প্রতিপাদন করে এক দার্শনিক পদ্ধতিতত্ত্ব হিসেবে বস্তুবাদ যে ভূমিকা পালন করে, তাও বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুবাদ ব্যাপারসমূহের অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক যোগসূত্র ও প্রকৃত কারণগুলি প্রকাশ করার দিকে বিজ্ঞানকে চালিত করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে মনোবিদ্যার কথা ধরা যাক। আত্মা সম্বন্ধে ভ্রান্তিপূর্ণ অভিমত সর্বদাই ছিল; এখন পর্যন্ত তা আছে, এবং জ্ঞানের বিকাশের উপরে তার ক্ষতিকর প্রভাব না পড়ে পারে না। মনোগত ক্রিয়াকলাপকে আত্মার এক অভিব্যক্তি হিসেবে দেখা, এবং আত্মার বাসস্থল হল মানুষের হৃদ্‌যন্ত্র, রক্ত বা ফুসফুস, ইত্যাদি — এটা প্রমাণ করার চেষ্টার ফলে আত্মার সম্বন্ধে অনুসন্ধান থেকে গিয়েছিল এক প্রাক-বৈজ্ঞানিক স্তরে। প্রতিতুলনায় বস্তুবাদ — যা মনকে মস্তিষ্কের এক ক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করতে গবেষকদের সাহায্য করেছে।

জ্ঞানের মূল ও সেই মূলগুলির যথার্থতার মানদণ্ড অনুধাবনের ক্ষেত্রেও বস্তুবাদ এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বপ্রথম বস্তুবাদই সমাজের ইতিহাসকে

সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং দেখিয়েছে যে তা একটা নিয়মশাসিত প্রক্রিয়া, বিশৃঙ্খল প্রক্রিয়া নয়।

বস্তুবাদ এক সুসংগত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতত্ত্ব হিসেবে তার ভূমিকা সম্পাদন করতে পারে, যদি তা নির্ভর করে ডায়ালেকটিকসের উপরে। দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী পদ্ধতি পৃথিবীতে সমস্ত ব্যাপারকে বিবেচনা করে সেগুলির আন্তঃসম্পর্ক ও নিয়ত বিকাশের দিক থেকে। গতিশীল অবস্থায় সমস্ত ব্যাপারকে অধ্যয়ন করলেই মানুষ পৃথিবীকে ও নিজেকে জানতে পারে। দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী পদ্ধতিতত্ত্ব আত্মবিকাশকে ক্রমবিকাশের এক আভ্যন্তরিক উৎস হিসেবে, দ্বন্দ্বগুলির সংগ্রাম হিসেবে দেখে। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের তাৎপর্য এই যে তত্ত্বগত চিন্তনকে আকৃতি দিয়ে তা পৃথিবীর অবধারণা ও রূপান্তরের এক হাতিয়ার যোগায়।

ডায়ালেকটিকস — বিপ্লবের বীজগণিত

লোকে চিরকালই জীবনকে উন্নত করার, দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট, অবিচার ও যথেচ্ছ শাসন দূর করায় স্বপ্ন দেখেছে। তারা তাদের অবস্থাগত মর্যাদা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে: ক্রীতদাসরা তাঁদের মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে (কিংবদন্তির নায়ক স্পার্টাকাসের অভ্যুত্থান ছাড়াও ক্রীতদাসদের বহু অভ্যুত্থানের কথা ইতিহাসে আছে), ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকরা সংগ্রাম করেছে, কল-কারখানায় শ্রমিকরা যন্ত্র ধ্বংস করেছে। মানুষের ইতিহাস হল দরিদ্র ও ধনীর মধ্যে, নিপীড়িত

ও নিপীড়নকারীর মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস। বহু যুগ কেটে গেছে, কিন্তু সব কিছু অনেক দিক দিয়েই থেকে গেছে একই রকম: সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের উপরে শাসন চালিয়েছে। সমাজব্যবস্থাগুলি একটি অপরটিকে প্রতিস্থাপিত করেছে, অথচ শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র্য ও অধিকারহীনতা, এবং মানুষের উপরে মানুষের শোষণ থেকেই গেছে। সমাজের গঠনকাঠামোতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটানোর প্রথম সুযোগ এসেছে শুধু আমাদের যুগে, শোষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিক শ্রেণী সেই ১৯শ শতাব্দীতেই তার অধিকার দাবি করতে শুরু করেছিল, কিন্তু তার তৎপরতাগুলি প্রথমে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ধরনের।

অতীতের দার্শনিকরা সামাজিক অসাম্যের কারণগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে জনগণের অভিমত সমাজজীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং, তাঁরা মনে করতেন, মানুষের চৈতন্য, তার চিন্তা ও অভিমতকে পরিবর্তিত করেই শুধু এক অন্যায় ব্যবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। ডাক্তার যেভাবে একজন রোগীর চিকিৎসা করে, সেইভাবেই সমাজকে 'রোগমুক্ত' ও উন্নত করা যায় জ্ঞানালোকের মধ্য দিয়ে। দার্শনিক-জ্ঞানালোকদাতারা ধনীদের বুঝিয়ে নিজেদের সম্পদ দরিদ্রদের দিয়ে দিতে রাজী করানোর চেষ্টা করেছিলেন এই কথা বিশ্বাস করে যে সামাজিক

অন্যায়কে এইভাবে লাঘব করা যাবে। তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা স্বভাবতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

মার্কস ও এঙ্গেলস দার্শনিক চিন্তা ও বিজ্ঞানের কৃতিত্বসমূহ এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় উপরে নির্ভর করে এমন এক দর্শন সৃষ্টি করেছিলেন, যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ। মার্কসীয় দর্শন বিশ্ব দর্শনের প্রান্তসীমায় আত্মপ্রকাশ করে নি; তা ছিল অতীতের সবচেয়ে প্রগতিশীল দর্শনগুলির অনুবর্তন। মার্কস ও এঙ্গেলস মনে করতেন যে দর্শনের প্রধান কাজ হল পৃথিবীকে ঢেলে সাজানোর সম্ভাব্য উপায়গুলি প্রতিপাদন করা, পৃথিবীকে শুধু ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে বরং ব্যবহারিক বিপ্লবী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া। তাঁদের মতে, দর্শনের দায়িত্ব হল পৃথিবীকে রূপান্তরিত করার কাজে এক অস্ত্র হিসেবে কাজ করা। মার্কসীয় দর্শনের এটাই একটা চারিত্র্যগত বৈশিষ্ট্য: এটাই তার বৈপ্লবিক চরিত্রের সারমর্ম। রুশ বিপ্লবী-গণতন্ত্রী **আলেক্সান্দর গের্ৎসেন** একথা অকারণে বলেন নি যে ডায়ালেকটিকস হল বিপ্লবের বীজ-গণিত।

মার্কসীয় দর্শন তার **শ্রেণী চরিত্র** লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে না। দৈনন্দিন জীবনে, এমন কি রাজনীতিতেও বিভিন্ন অভিমত পোষণকারী লোকেরা অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো কোনো প্রশ্নে একমত হতে পারে, যেমন — যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহাকাশ, বিশ্ব মহাসাগর, পৃথিবীর খনিজ সম্পদ

প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্নগুলি আজ গোটা মানবজাতির পক্ষেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ঐকমত্য আছে। ভাবাদর্শ ও দার্শনিক অভিমতের ক্ষেত্রে কোনো মতৈক্য হতে পারে না: কোনো আপোস সম্ভব নয়। দর্শন তার জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট কতকগুলি সামাজিক শক্তির স্বার্থকে প্রতিফলিত করেছে এবং করে চলেছে। একথা সত্যি যে নানান দার্শনিক অভিমতের স্রষ্টারা তাঁদের অভিমতকে সামূহিক মানব-স্বার্থের প্রতিফলন হিসেবে চালানোর চেষ্টা করেছেন প্রায়শই; কিন্তু সেটা ছিল ছদ্মবেশ। সমস্ত পূর্ববর্তী মতবাদের অননুরূপভাবে, মার্কসীয় দর্শন হল এমন এক তত্ত্ব, যা প্রতিপাদন করে **শ্রমিক শ্রেণীর** ও তার নেতৃত্বাধীন শ্রমজীবী জনসাধারণের **বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শ**। তা স্বীকার করে, এমন কি খোলাখুলি ঘোষণা করে যে দর্শন শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। মার্কস লিখেছেন, 'দর্শন যেমন তার বস্তুগত অস্ত্র খুঁজে পায় প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, তেমনি প্রলেতারিয়েত তার আত্মিক অস্ত্র খুঁজে পায় দর্শনের মধ্যে।'*

---

* Karl Marx, *Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law. Introduction,* in: Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 187.

৪। মানুষ কীভাবে পৃথিবীকে জানতে পারে?

জ্ঞানের সমীপবর্তী হওয়ার দুটি পথ

মানুষ তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তার চারপাশের পৃথিবী সম্বন্ধে নতুন কিছু জানার, তার রহস্যের তল পাওয়ার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে।

পারসিক ও তাজিক সাহিত্যের মহান লেখক ফিরদৌসি লিখেছিলেন:

ঝুঁকি নিতে হবে বোঝার জন্য
পৃথিবীর সব ধাঁধা
আরোহণ করো — আগুয়ান হও
পরোয়া না করে বাধা।*

একটি বিশেষ বিষয় আছে — **জ্ঞানতত্ত্ব** (gnosiology বা epistemology) — যা

---

* তাজিক কবিতার সংকলন। মস্কো, ১৯৫১, পৃঃ ১১৮, (রুশ ভাষায়)।

অধ্যয়ন করে পৃথিবী সম্বন্ধে অবধারণা সংক্রান্ত বিষয়গুলি, সত্য প্রকাশ করার পদ্ধতিগুলি এবং মানুষের জ্ঞান ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যেকার সম্পর্ক। এই বিষয়টি দর্শনের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

মানুষের অবধারণামূলক ক্রিয়াকলাপের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করার জন্য, আমাদের আবার দৃষ্টিপাত করতে হবে দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের দিকে, তার দ্বিতীয় দিকটিতে, যা মানব জ্ঞান ও পারিপার্শ্বিক জগতের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও মানুষ এই পৃথিবীকে অবধারণা করতে পারে কি না তাই নিয়ে বিচার করে। এঙ্গেলস এই প্রশ্নটি সূত্রবদ্ধ করেছিলেন এইভাবে: '...আমাদের চারপাশের পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাগুলি খোদ এই পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত? আমাদের চিন্তন কি বাস্তব জগত অবধারণায় সক্ষম? বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণায় আমরা কি বাস্তবের এক সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম?'* ভাষান্তরে, এটা হল মানুষের ধ্যানধারণার অন্তর্বস্তু সংক্রান্ত এক প্রশ্ন — এটা কি বাস্তব জগৎ, না কি অন্য কিছু? দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের এই দিকগুলি আন্তঃসম্পর্কিত। বস্তুবাদীরা মনে করে যে চৈতন্য হল বস্তুর এক স্বাভাবিক গুণ, তার

---

* Frederick Engels, *Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy*, in: Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works in three volumes, Vol. 3, p. 346.

স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতি। তাই, চৈতন্য মানুষকে বেঁচে থাকতে ও তার অস্তিত্বের অবস্থাগুলির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতেই শুধু যে সাহায্য করে তাই নয়, পারিপার্শ্বিক জগৎকে অবধারণা করতেও সাহায্য করে। এটা অবধারণাগত (জ্ঞানতত্ত্বগত) আশাবাদ বলে পরিচিত। প্রাচীন দার্শনিকরা, যেমন, হেরাক্লিটাস, ডেমোক্রিটাস ও **এপিকিউরাস** মনে করতেন যে মানুষ পৃথিবীকে অনুধাবন করতে সক্ষম। পরে এই অভিমত পোষণ করতেন রেনেসাঁস যুগের ও আধুনিক কালের দার্শনিকরা। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষ শুধু পৃথিবীকে অবধারণাই করে না, তার প্রয়োজন ও লক্ষ্য অনুযায়ী তার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে অদলবদল বা রূপান্তরিতও করে। লোকে পৃথিবীর গুণ-ধর্ম ও নিয়মগুলি জানতে পারছে বলেই পৃথিবীর রূপান্তর ঘটছে। আজ তা বিশেষভাবেই স্পষ্ট, কেননা মানুষের যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকত তা হলে সূক্ষ্ম-পরিশীলিত প্রযুক্তি সৃষ্টি করা বা প্রকৃতিকে বদলানো অসম্ভব হত।

মানুষ পৃথিবীকে অবধারণা করতে সক্ষম হতে পারে কি না, এই প্রশ্নটি ভাববাদীরা ভিন্নভাবে দেখেন। পৃথিবীকে অবধারণা করা যায় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকরাও, তাঁদের বলা হত 'স্কেপটিক' বা সংশয়বাদী।

'স্কেপটিক' শব্দটির দুটি অর্থ আছে। চলতি প্রয়োগে তা ব্যবহার করা হয় এমন একজন লোকের ক্ষেত্রে যে বিশেষ কোনো কিছুতে বিশ্বাস করে না এবং

সাধারণভাবে সব কিছু সম্বন্ধেই সংশয় পোষণ করে। দর্শনে **সংশয়বাদ** (স্কেপ্টিসিজম) বলতে বোঝায় পৃথিবীকে অবধারণা করার সামর্থ্য সম্বন্ধে সংশয় এবং তা এটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে পৃথিবী সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। তার জন্য কী ধরনের যুক্তি সংশয়বাদীরা দেন? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, সংশয়বাদীরা তাঁদের যুক্তির ভিত্তি করেছিলেন এই ঘটনাটিকে যে মানুষের ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিগুলি নির্ভর করে তার দশার উপরে — তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির দশার উপরে এবং তার মেজাজের উপরে। তাঁরা এই মত পোষণ করতেন যে সংবেদনগুলি প্রবঞ্চনাকর, মানুষকে তা যথার্থভাবে কিছু জানতে দেয় না, বস্তুসমূহ মানুষের কাছে যেমন বোধ হয়, মানুষ সেগুলিকে শুধু সেইভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। প্রাচীন চিন্তকরা বলেছিলেন যে একই জিনিস বিভিন্ন জীবসত্তা ও মানুষের কাছে রীতিমত ভিন্ন বলে দেখা দেবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সমুদ্রের জল, পরিষ্কারই হোক বা কর্দমাক্তই হোক, মাছের পক্ষে পুষ্টিদায়ক ও রোগা-রোগ্যকর, পক্ষান্তরে শেষোক্ত ক্ষেত্রে (তা যদি কর্দমাক্ত হয়) মানুষের পক্ষে তা কোনো কাজেরই নয়, এমন কি ক্ষতিকরও হতে পারে। ঘোড়া, কুকুর আর মানুষ একেবারে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসে আনন্দ পায়। সংশয়বাদীর মত এই যে লোকে বস্তুনিচয়ের মূল্যায়ন করে নিজেদের মেজাজ, স্বাস্থ্যের অবস্থা ও অভ্যাস-সাপেক্ষে; সুতরাং যত লোক আছে ততই মত আছে: মানুষ নিজেই সব কিছুর পরিমাপ। একজন সংশয়বাদীর কথা: 'আমি

মনে করি, যা অস্তিত্বশীল ও যা অস্তিত্বহীন উভয়েরই এক পরিমাপ আমরা প্রত্যেকেই।'

অধিকন্তু, শুধু মানুষের সংবেদনই নয়, তার মনও প্রবঞ্চনাকর; যে কোনো ভাবই খণ্ডন করা যায়। আমরা বলি যে লোকেরা ভালো; তবুও আমরা যদি বলি যে তারা মন্দ তা হলে আমরা ভুল করব না। তাই, সংশয়বাদীর সিদ্ধান্ত: আমরা সমান আস্থার সঙ্গে বস্তুসমূহ সম্বন্ধে বিপরীত মতামত প্রকাশ করতে পারি; সুতরাং, আমাদের সেগুলি বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ তা করলে আমরা আমাদের আত্মিক ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটাতে পারি।

মন নিষ্ফল, এই যুক্তি দিয়ে সংশয়বাদীরা মানুষকে তার জ্ঞানান্বেষণে অতীন্দ্রিয়বাদ আর ধর্মের দিকে চালিত করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আরব দার্শনিক **আল গাজালি** জোর দিয়ে বলেন যে চিন্তার মধ্য দিয়ে সত্যোপলব্ধি করা অসম্ভব। একমাত্র অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞা, উপর থেকে আসা আলোকদ্যুতিই মানুষকে খাঁটি জ্ঞান দিতে পারে তার অন্তরাত্মকে ঈশ্বরে বিলীন করে।

কিন্তু, জ্ঞানের ইতিহাসে সংশয়বাদ কিছুটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে, কারণ সংশয় আর পুরনো ধরন-ধারনের সমালোচনাত্মক বিচার নতুনের সন্ধানকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সংশয় হল চিন্তা করার জন্য, সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রেরণা। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মহান প্রতিষ্ঠাতা, যিনি তাঁর আগেকার সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব সমালোচনাত্মকভাবে পুনর্মূল্যায়ন করেছিলেন সেই কার্ল মার্কসের প্রিয় মূলমন্ত্র ছিল: 'De Omnibus

dubitandum', অর্থাৎ 'সব কিছু সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করো'।*

সংশয়বাদ রীতিমত যুক্তিসংগতভাবেই সৃষ্টি করেছিল তার চরম রূপ, **অজ্ঞাবাদ**, যা বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রামে এক মধ্যবর্তী অবস্থান লাভ করতে চেষ্টা করেছিল। বিশ্ব-প্রকৃতি উন্মোচন করার কোনো প্রচেষ্টা তাতে নেই, কেননা তাকে মনে করা হয় এক অমীমাংসেয় প্রশ্ন বলে। তার পরিবর্তে, সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয় অবধারণার উপরে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক **গার্গিয়াস** সুসংগত অজ্ঞাবাদী অভিমত পোষণ করতেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে '১) কোনো কিছুই অস্তিত্বশীল নয়। কিছুই নেই। ২) সত্তা আছে, এটা ধরে নিয়ে বলা যায়, তা জ্ঞেয় নয়। ৩) তা যদি জ্ঞেয় হয় তা হলেও, যা জ্ঞেয় সে বিষয়ে কোনো ভাব-বিনিময় সম্ভব নয়।'**

আরও বেশি ঘন ঘন অবশ্য আমরা এমন এক অজ্ঞাবাদের সম্মুখীন হই যা ততটা সুসংগত নয়। কিছু কিছু অজ্ঞাবাদী এই মত পোষণ করেন যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়ে যা শেখে তার চেয়ে বেশি জানতে পারে না, অন্যরা অবধারণাকে পর্যবসিত

---

* *Marx and Engels Through the Eyes of Their Contemporaries,* Progress Publishers, Moscow, 1972, p. 179.

** V. I. Lenin, *Conspectus of Hegel's Book Lectures on the History of Philosophy,* Collected Works, Vol. 38, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 271.

করেন এমন একটা জিনিসে যা মানুষ ইন্দ্রিয়গতভাবে উপলব্ধি করে, আবার অন্যরা বলেন যে একটা ব্যাপারকে জানা সম্ভব, কিন্তু তার অন্তঃসারকে নয়। এরূপ অভিমত সম্বন্ধে ওমর খৈয়ম ব্যঙ্গভরে লিখেছিলেন:

জ্ঞানীগুণীজন হয়েছে মগন দীর্ঘ যুক্তিজালে —
কোন পথ যায় সত্যের দিকে আরও বেশি তাড়াতাড়ি।
কিন্তু আমার ভয় হয়, তারা শুনবেই কোনো কালে:
'তাহার জন্য, মূর্খ রে তোরা, নিতান্ত যে আনাড়ি!'*

ইংরেজ অজ্ঞাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম এই মত পোষণ করতেন যে মানুষের কাছে আছে শুধু ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতি, সেগুলি কোথা থেকে আসে তা সে জানে না ও জানতে পারে না। এমন হতে পারে যে সেগুলির পিছনে আছে, বস্তুবাদীরা যেমন বলে, বস্তুনিচয়, অথবা, ভাববাদীরা যেমন দাবি করে, ঈশ্বর। হিউমের মতে, মানুষ তার স্বভাবের দরুনই, তার ইন্দিয়ানুভূতিগুলিকে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে পৃথিবী রয়েছে বিষয়গতভাবে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতির (ভাবরূপ) বাইরে মানবমনের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। বস্তুতই, অভিজ্ঞতা যদি জ্ঞানের একমাত্র উৎস হয়, তা হলে এমন কোনো নিশ্চিতি থাকতে পারে না যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান প্রামাণ্য। সুতরাং, হিউমের মতে, একজন বিজ্ঞানী একমাত্র সঠিক যে অবস্থানটি গ্রহণ করতে পারে, তা

---

* ওমর খৈয়ম। কবিতা। দুশানবে, ইরফন প্রকাশন, ১৯৭০, পৃঃ ৮৪, (রুশ ভাষায়)।

হল একেবারে সব কিছুকেই সন্দেহ করা। তিনি লিখেছেন, 'তাই মানুষের অন্ধত্ব ও দুর্বলতা পর্যবেক্ষণই সকল দর্শনের ফল।'* ইমানুয়েল কাণ্ট মন্তব্য করেছিলেন যে হিউম তাঁর জ্ঞানের জাহাজটিকে সংশয়বাদের মগ্ন চড়ায় ভিড়িয়েছিলেন, এবং সেখানেই সেটিকে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে দিয়েছেন।

অথচ কাণ্ট নিজেই অজ্ঞাবাদী ধারাটি বহন করে চলেছিলেন। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে পৃথিবী আছে আমাদের চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে, আমাদের বাইরে, এক 'স্বয়ংসম্পূর্ণ পদার্থ' হিসেবে, এবং মানুষকে তা প্রভাবিত করে তার মধ্যে ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে: সব কিছু আমাদের 'দেওয়া হয়' আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলিতে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতি, বা চিন্তন, কোনোটাই স্বয়ং বস্তুনিচয় সম্বন্ধে জ্ঞানদান করে না, কেননা একটি জিনিসের প্রতিরূপ (অথবা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়ে সেটি সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি) আর খোদ জিনিসটির মধ্যে একটা ব্যবধান থাকে, এবং এই ব্যবধান কাটিয়ে উঠতে মানবমন অক্ষম। কাণ্ট যুক্তিসংগতভাবেই বিজ্ঞানের ভূমিকা হ্রাস করেছিলেন এই কথা বলে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বস্তুনিচয়ের অন্তর্বস্তু কখনোই উন্মোচন করতে সক্ষম হবে না। তাই তার অপর ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত: একটি প্রতিরূপ থেকে একটি জিনিসে যাওয়া সম্ভব,

* David Hume, *An Enquiry Concerning Human Understanding,* Gateway Editions, Inc., Chicago, 1956, p. 30.

মনের পক্ষে নয়, বিশ্বাসের পক্ষে। বিশ্বাসকে স্থান করে দেওয়ার জন্য কাণ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রটিকে সীমাবদ্ধ করেছিলেন। বস্তুনিচয়ের শুধু বাহ্যিক দিকটিই মানুষের অধিগম্য, কাণ্টের এই অভিমতের সমালোচনা করেছিলেন হেগেল; তিনি বলেছিলেন যে কাণ্ট সেই ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িয়ে দেন, যিনি সাঁতার শেখার আগে পর্যন্ত জলে পা দিতে চান না। কাণ্টের দার্শনিক অবস্থান পরস্পরবিরোধী: পৃথিবীর বাস্তব অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে এসে পৌঁছন ভাববাদে, অর্থাৎ তার বিষয়গত চরিত্রের নিরাকরণে। অজ্ঞাবাদ ও ভাববাদকে পরস্পর-সম্পর্কিত করা হয়েছে।

অজ্ঞাবাদ আজও জীবিত আছে, তার সবচেয়ে চরম ও পরিষ্কার অভিব্যক্তি হল **অযৌক্তিকতাবাদ** (irrationalism), মানুষের জ্ঞানকে বিশ্বাস ও স্বজ্ঞার বিপ্রতীপে স্থাপন করে তাতে মানুষের জ্ঞানের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। আধুনিক কালের অযৌক্তিকতাবাদীরা মানবমনের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না। পৃথিবীকে তাঁরা অযৌক্তিক হিসেবে দেখেন দুঃখবাদীর দৃষ্টিতে, এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজপ্রগতিকে নাকচ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'জীবনের দর্শন' ও 'অস্তিত্বের দর্শনের' অনুগামীদের বিশিষ্ট লক্ষণসূচক হতাশা ও ভয়, তাদের মতে, পৃথিবীতে মানুষের নৈরাশ্যজনক অবস্থানের ফল। কোনো কোনো অযৌক্তিকতাবাদী দার্শনিক অবশ্য বল ও ইচ্ছাশক্তির ধারণা প্রচার করেন। এই সমস্ত অভিমত স্বভাবতই কাজ

করেছিল ফাশিবাদের ভাবাদর্শ ও কর্মপ্রয়োগ সূত্রবদ্ধ করার অন্যতম উৎস হিসেবে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে: যে সমস্ত দার্শনিক মতবাদ অস্বীকার করে যে পৃথিবীকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব, সেগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এই যুগেও কীভাবে টিকে আছে? অজ্ঞাবাদ ও অযৌক্তিকতাবাদের মূলগুলি, সর্বপ্রথমত, দেখতে পাওয়া যায় সামাজিক অবস্থার মধ্যে এবং সেই শ্রেণীগুলির মধ্যে, যাদের স্বার্থের প্রকাশ করে এই সমস্ত দার্শনিক ধারা। এ কথা সুবিদিত যে বুর্জোয়া শ্রেণী আজ একটা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী, প্রগতি ও মানুষের বিচারবুদ্ধিতে তা বিশ্বাস হারিয়েছে। বুর্জোয়া ভাবাদর্শবাদীরা বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলিকে ব্যবহার করছেন নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে। ইতিমধ্যে, সেই ভাবাদর্শবাদীরাই পৃথিবী অবধারণার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে চলেছেন। বিজ্ঞান প্রগতির সেবা করে, সেই বিজ্ঞানই কমিউনিজমের জয় ও পুঁজিবাদের পতনের পূর্বাভাস দেয়। এই সম্ভাবনা স্বভাবতই একচেটিয়াপতিদের পছন্দ নয়। তাই কিছু কিছু দার্শনিক নানা ধরনের সব তত্ত্ব উপস্থিত করছেন যেগুলি মানুষের অবধারণামূলক সামর্থ্যকে এবং জ্ঞানের ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের সর্বশক্তিমত্তাকে আক্রমণ করে। এই সমস্ত অভিমত মূর্তরূপ পায় অজ্ঞাবাদ আর অযৌক্তিকতাবাদে।

অজ্ঞাবাদকে শুধু সামাজিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত করার চেষ্টা আমরা আদৌ করছি না; অবধারণার সঙ্গে

জড়িত বিষয়গত অসুবিধাগুলির মধ্যেও এর উৎস ও মূল দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতই, সত্যের সন্ধানের পথে অসাধারণ সব অসুবিধা দেখা দেয়। মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে লিখেছেন: 'বিজ্ঞানে উপনীত হওয়ার কোনো রাজপথ নেই, এবং তার খাড়া পথে শ্রান্তিকর আরোহণে যারা ভীত নয়, একমাত্র তাদেরই সম্ভাবনা আছে তার উজ্জ্বল শিখরগুলি অর্জন করার।'* এই আরোহণের সময়ে বিজ্ঞানী সব ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন, সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু অলঙ্ঘনীয়ও মনে হতে পারে। সামনের অসুবিধা-গুলিকে বাড়িয়ে দেখলে, বিজ্ঞানী নিজে শুধু যে পশ্চাদপসরণ করেন তাই নয়, যুক্তিসহ জ্ঞানকে হ্রাসও করেন, কিংবা এমন কি পরিহার করেন।

বস্তুবাদীরা এক ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বাস্তব অস্তিত্ব ও চৈতন্যের গৌণ চরিত্রকে তাঁরা স্বীকার করেন সেই পৃথিবীকে প্রতিফলনকারী অত্যন্ত সংগঠিত বস্তুর এক গুণ হিসেবে। পৃথিবী যে অবধারণাযোগ্য, এই দ্ধিান্তের ভিত্তি হিসেবে এই প্রতিপাদ্যটি কাজ করে। কীভাবে তা প্রমাণ করা যায়? বস্তুবাদীরা এই মত পোষণ করেন যে অবধারণা শুরু হয় মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির (দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়) উপরে ক্রিয়াশীল বাহ্যিক বস্তুসমূহ দিয়ে, যার ফলে মানুষের মধ্যে দেখা দেয় সংবেদনগুলি (দৃষ্টিগত,

---

* Karl Marx, *Capital,* Vol. I, Progress Publishers, Moscow, 1984, p. 30.

শ্রবণগত, স্পর্শগত, ইত্যাদি), সেগুলি হল বস্তুসমূহেরই প্রতিফলন বা প্রতিরূপ। সেগুলিই চিন্তন-প্রক্রিয়ার ভিত্তি, ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা আশু উপলব্ধির অনধিগম্য আভ্যন্তরিক গুণ ও সম্পর্কগুলি অবধারণা করতে মানুষকে সেই চিন্তন-প্রক্রিয়া সক্ষম করে তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়নের যুগের অসামান্য ইংরেজ বস্তুবাদী দার্শনিক ফ্র্যান্সিস বেকন সংবেদন ও ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতিগুলি, আর বাহ্যিক প্রভাবগুলির মধ্যে অনুরূপতা প্রকাশ করার চেষ্টায় চোখকে তুলনা করেছেন একটি আয়নার সঙ্গে। অধিকন্তু, শুধু মানুষের চোখই নয়, মনও একটি আয়নার মতো। সেই জন্যই শুধু সংবেদনগুলি নয়, মানুষের ভাবধারণাও বাহ্যিক বস্তুসমূহের অনুরূপ এবং ফলত উপলব্ধ হতে সক্ষম। আরেকজন ইংরেজ বস্তুবাদী দার্শনিক, **জন লক** তাঁর *Essay Concerning Human Understanding* রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন এই ঘটনা থেকে যে আমরা একটি জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারি শুধু আমাদের সংবেদনগুলির মধ্য দিয়েই, তাঁর মতে, সেগুলিই হল সেই জানালা যার মধ্যে দিয়ে বাস্তবতার আলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। অসামান্য ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিক **দেনি দিদরো** চমৎকারভাবে প্রতিপাদন করেছিলেন এই বক্তব্যকে যে পৃথিবীকে অবধারণা করা যায়। তিনি বলেছিলেন যে মানুষ হল সেই পিয়ানোর মতো, যা তার চাবিগুলির উপরে এক বাহ্যিক ক্রিয়ার ফলে ধ্বনি সৃষ্টি করে।

পৃথিবীকে জানা যায় কি না এই প্রশ্ন সম্বন্ধে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। আমরা এও প্রতিপাদন করেছি যে বহু দার্শনিক এই প্রশ্নের নেতি-বাচক উত্তর দেন।

অজ্ঞাবাদকে কীভাবে খন্ডন করা যায়?

জানা মানে কাজ করা

অজ্ঞাবাদকে খন্ডন করার জন্য অবশ্যই আবিষ্কার করতে হবে সেই ভিত্তিটি কী, যার উপরে বিষয়গত বাস্তবের সঙ্গে জ্ঞানের সমাপতন ঘটে? দৈনন্দিন জীবনই অজ্ঞাবাদকে, এবং সামগ্রিকভাবে ভাববাদকে সবচেয়ে নিয়ামকভাবে খন্ডন করে। বস্তুতই, লোকে যদি তাদের চারপাশের বস্তু ও ব্যাপারগুলি বুঝতেই না পারত, তা হলে তারা সেগুলি কাজে লাগাতে, অদলবদল করতে ও পুনরুৎপাদন করতে পারত না। সর্বপ্রকার অজ্ঞাবাদের অকার্যকরতা জ্ঞানের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বের দ্বারাও প্রমাণিত হয়, সেই তত্ত্বের প্রস্থান-বিন্দু হল প্রতিফলন তত্ত্ব। এই বিষয়ে লেনিন বলেছেন এই কথা: '... বস্তুসমূহ আছে আমাদের বাইরে। আমাদের উপলব্ধি ও ভাবধারণাগুলি হল সেগুলির প্রতিরূপ। এই প্রতিরূপগুলির যাচাই, আসল ও নকল প্রতিরূপগুলির মধ্যে প্রভেদন হয় কর্মপ্রয়োগের দ্বারা।'* এবং আরও পরে: 'জীবনের, কর্মপ্রয়োগের অবস্থানই

* V. I. Lenin, *Materialism and Empirio-Criticism*, Collected Works, Vol. 14, p. 110.

হওয়া উচিত জ্ঞানের তত্ত্বে, প্রথম ও বুনিয়াদী।'*

কর্মপ্রয়োগ ছাড়া অবধারণা অসম্ভব।

অবশ্য লোকের বস্তুগত, মূর্ত-নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপেই বাস্তব সংশোধিত-পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বলতে আমরা বোঝাই, প্রথমত, শ্রমের সেই রূপগুলি, যেগুলি উৎপাদন করে খাদ্য ও আবাসন, তথা কাজের উপকরণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে যন্ত্র তৈরি করে সেই শ্রমিকের শ্রম, যে বাড়ি তৈরি করে সেই মিস্ত্রির শ্রম, যে গম ফলায় সেই কৃষকের শ্রম। মানুষ তার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে বস্তুসমূহকেই শুধু পরিবর্তিত করে না, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করে নিজেও রূপান্তরিত হয়। উৎপাদনী অভিজ্ঞতার ফলে জন্ম নেয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি। উপরে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে জাহাজ চলাচলের ব্যবহারিক প্রয়োজনই জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব ঘটিয়েছিল, এবং জ্যামিতি আত্মপ্রকাশ করেছিল চাষ-আবাদের প্রয়োজনের দরুন। পাটীগণিত মিশরীয় ও বাবিলোনীয়দের সাহায্য করেছিল আয়তন ও পরিমাণ হিসাব করতে, এবং মিশরীয় কেরানিদের সাহায্য করেছিল মজুরি, রুটি আর বিয়ারের হিসাব রাখতে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ শুধু প্রকৃতিকে সংশোধন-পরিবর্তন করতেই সাহায্য করে না, সমাজজীবনেও সংঘটিত করে পরিবর্তন, যেগুলির মধ্যে আছে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লব, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, প্রভৃতি। তাই

---

* ঐ, পৃঃ ১৪২।

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম ছিল মার্কসীয় তত্ত্বের আত্মপ্রকাশের এক পূর্বশর্ত।

অবধারণা একটি মানসিক ক্রিয়া, ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ থেকে তা বিশিষ্টভাবেই আলাদা, যদিও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তা সম্পর্কিত। মানুষ তার শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে তার প্রয়োজন অনুযায়ী: সে তেল ও কয়লা নিষ্কাশন করে, অরণ্য রোপণ করে, জমি চাষ করে, ইত্যাদি। এই সব কিছু করার জন্য, প্রাসঙ্গিক বস্তু ও ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে তার অবশ্যই জ্ঞান থাকা দরকার। অবধারণা হল জ্ঞানের রূপে বাস্তবকে মানসিকভাবে আয়ত্ত করা। শেখা ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জন করে ও সংস্কৃতি অর্জন করে মানুষ পরিণত হয় এক স্রষ্টায়, যে শুধু বাস্তবকেই নয়, নিজেকেও রূপান্তরিত করে। সে হয়ে ওঠে **জ্ঞানের এক বিষয়বস্তু**, সামাজিক, ব্যাপক জ্ঞানের বাহক। প্রাথমিক জ্ঞান যদি কর্মপ্রয়োগ থেকে পৃথক না-হয়ে তার সঙ্গে মিলেমিশে যায়, তা হলে কালক্রমে জ্ঞানের সঞ্চয় জ্ঞানকে আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন করে তোলে এবং ইতিপূর্বে অর্জিত জ্ঞান থেকে তা উৎসারিত হতে শুরু করে।

জ্ঞানের লক্ষ্যবস্তু এখন সমগ্র পৃথিবী, প্রকৃতি ও সমাজ নয়, বরং ইতিহাসের চলতি পর্যায়ে যা মানুষের অবধারণার অধিগম্য, শুধু সেটাই। অবধারণার লক্ষ্যবস্তু নির্ভর করে বৈষয়িক সম্ভাবনার উপরে তথা সঞ্চিত জ্ঞানের স্তর ও সামাজিক প্রয়োজনের উপরে। বোধগম্য কারণেই, প্রাচীন দার্শনিকরা পরমাণুর গঠনকাঠামো

বুঝতে পারেন নি; নিউটনের আমলে, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিশদ করা অসম্ভব ছিল, এবং জীবন প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত কাজগুলি একমাত্র আজই সমাধা করা যায়। বিজ্ঞান কীভাবে মানবেতিহাসের প্রয়োজন মেটায়, মার্কসবাদের আত্মপ্রকাশ তার একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। কিন্তু, মানুষ প্রকৃতিকে তার আদিম দশায় নেহাৎ অধ্যয়নই করে না। জ্ঞানের বহু লক্ষ্যবস্তু সৃষ্ট হচ্ছে মানুষের ক্রিয়াকলাপ চলার মধ্য দিয়ে: যেমন, নির্বাচনমূলক প্রজননের সাহায্যে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন নতুন জাতের খাদ্যশস্য ও পশু।

ফলত, অবধারণা হল সেই জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া, যার আশু লক্ষ্য সত্যে উপনীত হওয়া এবং যার চূড়ান্ত লক্ষ্য সফল ব্যবহারিক ক্রিয়া।

'অলিখিত ফলক' ও 'জন্মগত ভাবধারণার' তত্ত্ব

অবধারণার বেশ কিছু তত্ত্ব মানুষের গোটা ইতিহাস জুড়ে উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, এই অবধারণ প্রক্রিয়া ঘটে পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে মানুষের মিথষ্ক্রিয়া চলার সময়ে। কিন্তু, শুধু এই নীতিটি স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়। অবধারণা হল বিভিন্ন রূপ, স্তর ও পর্যায়ের এক প্রক্রিয়া, যেখানে ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতির এবং চিন্তনের একটা ভিন্ন ভূমিকা আছে। সেগুলির ক্রিয়া আবিষ্কার করা আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানের ইতিহাসে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গত ও যুক্তিগতের ভূমিকা সম্পর্কে কোনো

সর্বসম্মত মত নেই। নানান সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করা হয়েছে, যার একটি অভিজ্ঞতাবাদের (empiricism) সঙ্গে ও অন্যটি যুক্তিবাদের (rationalism) সঙ্গে যুক্ত।

বহুকাল আগেই পরিলক্ষিত হয়েছিল যে অবধারণার সঙ্গে জড়িত থাকে ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতি (প্রতিরূপ) — সংবেদন, উপলব্ধি ও ধারণা, এবং চিন্তন (যুক্তিসহ জ্ঞান) — ধারণা ও বিচার। বিজ্ঞানীরা ও দার্শনিকরা কোনটাকে প্রধান বলে, অবধারণার ভিত্তি বলে মনে করেন, সে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বস্তুবাদী ফ্র্যান্সিস বেকন ও জন লক, এবং ভাববাদী জর্জ বার্কলি ও ডেভিড হিউম সমেত কেউ কেউ এই মত পোষণ করতেন যে ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাগুলিই সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান, বিশেষত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এই জিনিসগুলির উপরেই পুরোপুরি নির্ভর করে। এই অভিমত **অভিজ্ঞতাবাদ** নামে পরিচিত। অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন যে ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতিগুলিই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। 'আমি উপলব্ধি করি সুতরাং আমি জানি,' এই ছিল তাঁদের মূলমান্ত্র। অবধারণায় মনের (চিন্তনের) ভূমিকাকে তাঁরা অস্বীকার করেন নি, কিন্তু মনে করেছিলেন যে জ্ঞানের সঙ্গে তা নীতিগতভাবে নতুন কিছু যোগ করতে পারে না। জন লকের অবস্থানটা ছিল সবচেয়ে নমুনাসই; তিনি বলেছিলেন যে মানুষের আত্মা এক 'অলিখিত ফলকের' মতো। জন্মের মুহূর্তে তাতে কোনো ভাবধারণা থাকে না এবং শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির উপরে বাহ্যিক বস্তুগুলি

যেমন-যেমন ক্রিয়া করে সেইভাবে ক্রমে ক্রমে তা ভর্তি হয়ে ওঠে। প্রথমে দেখা দেয় সরল ভাবধারণাগুলি (যেমন — উত্তাপ, ঠাণ্ডা, আলো, অন্ধকার, রূপ ও রূপরেখা, গতি ও বিরামের ইন্দ্রিয়ানুভূতি) এবং পরে দেখা দেয় আরও জটিল ভাবধারণাগুলি। কিন্তু, জটিল ভাবধারণাগুলি ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতিগুলির মন-ঘটিত সম্মিলনের চেয়ে বেশি কিছু নয়, তাই সারগতভাবে সেগুলির মধ্যে নতুন কিছু থাকে না। লক-কর্তৃক সূত্রায়িত অভিজ্ঞতাবাদের মূল বক্তব্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিতে এমন কিছু নেই যা সংবেদনে নেই। আরও অনেক আগে, ডেমোক্রিটাস ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতির উপরে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনের উপরে ইন্দ্রিয়সমূহের অগ্রাধিকার স্বীকার করেছিলেন, বলেছিলেন: দরদি মন, আমাদের প্রমাণগুলো কেড়ে নিয়ে তুমি এখন আমাদের খণ্ডন করতে চেষ্টা করছ সেগুলি থেকেই শক্তি আহরণ করে। তোমার জয় তাই একই সঙ্গে তোমার পরাজয়ও।

বিপরীতপক্ষে, অন্যান্য দার্শনিক বলেছিলেন যে মন, বা চিন্তন, জ্ঞানের উৎস, আর ইন্দ্রিয়গুলি যা দেয় তা প্রামাণ্য নয়। দর্শনে এই ধারাটি **যুক্তিবাদ** (rationalism) বলে পরিচিত। এর বেশি উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিবৃন্দ হলেন বস্তুবাদী বারুখ স্পিনোজা এবং ভাববাদী **গটফ্রিড লেইবনিৎস**, ইমানুয়েল কাণ্ট ও গিওর্গ হেগেল। এ'রা সকলে এই মত পোষণ করতেন যে অবধারণা সম্ভব মানুষের বিচারবুদ্ধির ক্রিয়ার দরুন; এই বিচারবুদ্ধিই বস্তুসমূহের অন্তঃসারে প্রবেশ করতে

সক্ষম, পক্ষান্তরে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি পৃথিবীর একটা ভ্রান্ত চিত্র উপস্থিত করে। ইন্দ্রিয়জ অবধারণার প্রতারণাকর চরিত্র সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হয়ে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক জেনো বলেছিলেন যে আমরা যদি একটা শস্যের দানা মাটির উপরে ফেলি তা হলে আমরা কোনো আওয়াজ শুনতে পাব না, কিন্তু এক বস্তা শস্যের দানা যদি ছুঁড়ে ফেলা হয় তা হলে তাতে একটা জোরালো আওয়াজ শোনা যেতে বাধ্য; আমাদের বিচারবুদ্ধি আমাদের বলে যে, এর হয় একটা, না হয় আরেকটা: হয় একটি পড়ন্ত শস্যের দানাও একটা জোর আওয়াজ সৃষ্টি করে, না হয় শস্যের বস্তাটা সেই আওয়াজ সৃষ্টি করে না। তাই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হওয়া উচিত বিচারবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়। যুক্তিবাদীরা নতুন নতুন ভাবের আত্মপ্রকাশকে ব্যাখ্যা করেছিলেন মানুষের মধ্যে 'সহজাত ভাবধারণার' অস্তিত্ব দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাচীন চৈনিক দার্শনিক মেন জি বলেছিলেন যে সব কিছু বোঝার সামর্থ্য মানুষের মধ্যে সহজাত, আর উপলব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হল সব কিছুর একটা নিয়ম। 'উপনিষদে' প্রতিফলিত প্রাচীন হিন্দু দর্শনে জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল: নিম্নতর ও উচ্চতর। প্রথমোক্তটিকে মনে করা হত খণ্ডিত ও আপতিক, তাই প্রামাণিক নয়। শেষোক্তটির উৎস বিচারবুদ্ধি, অথবা যে মন অতীন্দ্রিয় সজ্ঞার সাহায্যে সেই বিচারবুদ্ধিতে এসে পৌঁছেছে।

আরব দার্শনিক, চিকিৎসক ও রাজনীতিক **ইবন তুফাইলও** (আব্বাসের) একই রকম অভিমত পোষণ

করতেন; তিনি বলেছিলেন যে বিচারবুদ্ধির পথ একমাত্র বাছাই লোকেদেরই অধিগম্য। উচ্চ জ্ঞানকে যিনি মানের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, সেই আরব চিন্তক **ইবন বাজ্জাও** একই অভিমত পোষণ করতেন। অনেক পরে, জার্মান যুক্তিবাদী দার্শনিক গটফ্রিড লেইবনিৎস অভিজ্ঞতাবাদ-কথিত tabula rasa বা অলিখিত ফলকের ভাবরূপে বিপ্রতীপে স্থাপন করেছিলেন মর্মরের একটি খণ্ডকে, যার শিরাগুলিতে ভবিষ্যতের একটি মূর্তির রূপরেখা লক্ষ করা যায়। অভিজ্ঞতাবাদের যে প্রতিপাদ্যে বলা হয় যে বুদ্ধিবৃত্তিতে এমন কিছু নেই যা ইন্দ্রিয়গুলিতে নেই, সেই প্রতিপাদ্যকেও তিনি অনুপূরিত করেছিলেন এই শব্দগুলি দিয়ে: 'খোদ বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া'। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে বোঝা হয় শুধু 'সহজাত ভাবধারণার' প্রেরণা হিসেবে, কেননা কখনও কখনও, অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা ছাড়াই, শুধু মনের (চিন্তনের) ভিত্তিতেই নতুন জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এইভাবেই রেনে দেকার্ত আবিষ্কার করেছিলেন গতিবেগ সংরক্ষণের নিয়ম, যা পদার্থবিদ্যার অধিকতর ক্রমবিকাশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো কোনো আধুনিক ভাববাদী দার্শনিকও যুক্তিবাদের ধ্যানধারণা পোষণ করেন; তাঁরা বলেন যে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়েই তত্ত্ব সূত্রবদ্ধ করতে হবে। ইংরেজ দার্শনিক **কার্ল পপ্পার** বলেছিলেন যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয় তত্ত্বই, পর্যবেক্ষণ নয় বরং ভাবধারণাই সর্বদা নতুন জ্ঞানের

পথ তৈরি করেছে। যুক্তিবাদীরা যখন মানবমনের ক্ষমতার বড়াই করেন, তখন তাঁরা সঠিক, কিন্তু তার ভূমিকাকে যখন তাঁরা পরম করে তোলেন এবং চিন্তনকে ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক করেন তখন তাঁরা ভুল।

মানুষের কী বিশ্বাস করা উচিত — তার ইন্দ্রিয়, না মন?

এই বিতর্কে সঠিক কারা — অভিজ্ঞতাবাদীরা না যুক্তিবাদীরা? ইন্দ্রিয়গুলি মানুষকে প্রায়শই প্রবঞ্চিত করেছে, দৈনন্দিন জীবনে ও অবধারণায়, উভয়তই। আকাশে সূর্যের গতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে লোকে স্থির করেছিল সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তাই. নিকোলাস কোপারনিকাস যখন প্রমাণ করেন যে ঘটনাটা তার উল্টো, তখন তারা স্তম্ভিত হয়েছিল। কিন্তু মনও মানুষকে প্রবঞ্চিত করেছে, তাকে নিয়ে গেছে দৃশ্যমানকে বাস্তবের সঙ্গে একাত্ম করার দিকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, গিওর্গ হেগেল নিজের তত্ত্বকেই নিজের বনিয়াদ হিসেবে ব্যবহার করে দাবি করেছিলেন যে মঙ্গলগ্রহ আর বৃহস্পতিগ্রহের মাঝখানে আর কোনো গ্রহ থাকতে পারে না। অথচ তিনি এই মর্মে তাঁর রচনাটি প্রকাশ করার অনতিকাল পরেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী জুসেপ্পে পিয়াৎসি সেই জায়গায় একটি গ্রহ আবিষ্কার করেন, যাকে তিনি অভিহিত করেন সিয়ারিজ বলে।

তা হলে প্রশ্নটার মীমাংসা করা যায় কীভাবে?

সেদিকে যাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। একটি এই: দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারকে একদিন একটি জট পাকানো গিঁট কীভাবে দেখানো হয়েছিল সে কাহিনী বলেছেন প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা প্লুটার্ক। কিংবদন্তীতে আছে, এই গিঁটটি বেঁধেছিলেন ফ্রিগিয়ার রাজা গর্ডিয়াস। এই গিঁটটি যে খুলতে পারবে, সে সারা এশিয়ার রাজা হবে। গিঁটটি খোলার কায়দা আলেকজান্ডার জানতেন না, কিন্তু কাজটা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর তরোয়াল দিয়ে সেটি কেটে। অবধারণার ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য: সংবেদন আর মনের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নটি গর্ডীয় গিঁটের মতোই একটা কিছু। এবং এর মীমাংসার সঙ্গে জড়িত আছে এটা স্বীকার করা যে অবধারণা শুরু হয় সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতি দিয়ে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: একটি শিশু কিছু কিছু রঙ বুঝতে পারে; শব্দ ও গতিতে সে প্রতিক্রিয়া দেখায়; পরে সেই শিশু জিনিসগুলির রূপ, আকৃতি ও পরিমাণ উপলব্ধি করতে শুরু করে, যদিও কখনও পর্যন্ত তার কোনো চিন্তা নেই, এমন কি আদিমতম চিন্তাও নয়। এটা দেখায় যে ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতিই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জ্ঞানের বনিয়াদ ও উৎস। কিন্তু, মানুষের ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা এই প্রক্রিয়ায় নিজে থেকে কাজ করে না, কাজ করে একমাত্র সমষ্টিগত সামাজিক-অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে। শ্রমে অথবা অবধারণায়, কোথাও মানুষ বিচ্ছিন্ন নয়। রবিনসন ক্রুসোর সঙ্গে তার সাদৃশ্য টানা যায় না। কিন্তু, যথাযথভাবে বলতে গেলে,

এমন কি ক্রুসোও সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না, কেননা মানুষজনের মধ্যে বাস করার সময়ে সে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করেছিল তা থেকেই সে আহরণ করেছিল। তা ছাড়া, জাহাজডুবির পরে যে সমস্ত জিনিস আর কাজের হাতিয়ারপত্র সে তুলে আনতে পেরেছিল সেগুলিকেই সে ব্যবহার করেছিল এবং তার আদিম অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজে সেগুলিকেই প্রয়োগ করেছিল।

ইন্দ্রিয়গুলি হল জগৎকে দেখার জানালা

অবধারণার প্রক্রিয়া কীভাবে ঘটে আলোচনা করা যাক। তা সাক্ষাৎভাবে আরম্ভ হয় অনুধ্যান থেকে, ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতি (প্রতিরূপ) থেকে, আমরা যা দেখি তাই থেকে। আমরা দেখতে, শুনতে ও অনুভব করতে পারি বস্তুসমূহ স্পর্শ করে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করে। প্রাচীন চীনের দার্শনিক **সিউন** জি বলেছিলেন যে, মানুষের চোখ, কান, নাক, মুখ ও চামড়া মানুষকে বস্তুসমূহের সংস্পর্শে আসতে সক্ষম করে তোলে। আমরা রঙ (লাল বা নীল), রূপ ও আকৃতির (বৃত্ত, ত্রিকোণ বা গাছ) প্রভেদ বুঝতে পারি, শব্দ (পাতার মর্মর, পাখির গান) শুনি, অনুভব করি (শক্ত, মসৃণ বা কর্কশ), তাপমাত্রা (উত্তপ্ত বা শীতল), এবং স্বাদ পাই (তেতো, মিষ্টি, বা টক)।

সংবেদনগুলি হল আমাদের জ্ঞানের উৎস, বস্তুসমূহের নির্দিষ্ট কিছু কিছু গুণ-ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে

আমাদের সেগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য জানায়। কিন্তু বাস্তবে আমরা বস্তু ও ব্যাপারসমূহের পৃথক পৃথক দিকের সংস্পর্শে আসি না, গোটা বস্তুগুলির সংস্পর্শে আসি। আমরা দেখি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সবুজ ক্ষেত, নীল আকাশ, লম্বা গাছ সুদূর ও উজ্জ্বল নক্ষত্র, ঘরবাড়ি... আমরা শুনি বৃষ্টিপাতের মুখর শব্দ আর বজ্রপাতের নির্ঘোষ। **উপলব্ধি** হল সামগ্রিকভাবে একটি বস্তুর ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতি (প্রতিরূপ) যা প্রতিফলিত করে তার রূপ ও আকৃতিকে, স্থানে তার অবস্থান প্রভৃতিকে। ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত প্রখর, তবুও সেগুলির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে এবং বস্তুসমূহের সমস্ত গুণ-ধর্ম সেগুলি আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে না। অবলোহিত ও অতিবেগনি আলোকরশ্মিতে আমরা কিছু দেখতে পাই না, অথবা পরমাণু ও অণুও দেখতে পাই না; আলট্রা-ধ্বনিও আমরা শুনতে পাই না (যদিও 'মথ' পতঙ্গ অবলোহিত আলোকে দেখতে পায়; বাদুড় আলট্রা-ধ্বনি শুনতে পায় ও তাকে ব্যবহার করে স্থানে দিকস্থিতির কাজে, আর উইপোকা এমন কি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রও টের পায়)। আরিস্ততলের সময় থেকে এ কথা জানা যে পৃথিবীর সঙ্গে ইন্দ্রিয়গত সংস্পর্শের পাঁচটি প্রণালী, পাঁচটি পথ মানুষের আছে: দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও স্বাদ। হেগেল লক্ষ করেছিলেন যে ঠিক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই মানুষের পক্ষে যুক্তিসংগতভাবে প্রয়োজনীয়। দর্শন চালিত আলোকের দিকে, অর্থাৎ হেগেলের মতে, যে স্থান পদার্থগত হয়ে উঠেছে সেই দিকে এবং শ্রবণ

চালিত ধ্বনির দিকে, অর্থাৎ যে কাল পদার্থগত হয়ে উঠেছে সেই দিকে, ইত্যাদি। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ আরও সুনির্দিষ্ট, আরও প্রভেদীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণা, তাপ, শৈত্য, ভারসাম্য, স্থানে পরিবর্তন প্রভৃতির সংবেদনগুলিকে আলাদা করে। তা হলেও, আরিস্ততল যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলিই মূল থেকে গেছে। বিজ্ঞান এই মত পোষণ করে যে একটি জীবন্ত জীবসত্তা যে মাধ্যমটির মধ্যে বিদ্যমান থাকে তার সঙ্গে নিয়ত ইন্দ্রিয়গত সংস্পর্শে তাকে অবশ্যই থাকতে হবে। আলোক, ধ্বনি ও অন্যান্য সংকেতের প্রবাহে যে কোনো ছেদের বিপজ্জনক ফল হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দর্শন ও শ্রবণের উপলব্ধি থেকে যে লোক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, তার মধ্যে মানসিক বৈকল্যের লক্ষণ দেখা দেয়। এটা পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করে দেখা হয়েছে এবং তত্ত্বগত ভাষায় সহজেই এর ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষ হল প্রকৃতির এক উৎপাদ ও অংশ, তাই পারিপার্শ্বিক জগৎ ও অবধারণাগত ক্রিয়াকলাপের অটুট যোগসূত্রের বাইরে সে থাকতে পারে না। আর সংবেদনগুলি হল ঠিক তাই যা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করে।

আমরা প্রশ্ন করতে পারি: ইন্দ্রিয়গুলির সীমাবদ্ধ, কিংবা বরং নির্বাচনধর্মী চরিত্রের কারণ কী? তা নির্ভর করে জীবন্ত জীবসত্তার অস্তিত্বের প্রকৃতি ও ধরনের উপরে। আলোচ্য জীবসত্তাটির পক্ষে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, পৃথিবীতে নিজের দিকস্থিতি ঠিক করার

জন্য তার পক্ষে যা দরকার, সেটাই ইন্দ্রিয়গুলি উপলব্ধি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে আকারগুলি ফুলের মতো, একটি মৌমাছি তা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করে, এবং ত্রিকোণ, বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রের মতো জ্যামিতিক আকৃতিগুলির প্রভেদ নির্ণয় করতে পারে কদাচিৎ। মানুষের ইন্দ্রিয়-প্রণালী গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিকভাবে। বস্তুবাদী লুডভিগ ফয়েরবাখ একদা বলেছিলেন যে মানুষের ঠিক তত সংখ্যক ইন্দ্রিয়ই আছে, যা পৃথিবীকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য তার প্রয়োজন।* ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতিগুলি মানুষকে প্রারম্ভিক জ্ঞান যোগায় সেই পৃথিবী সম্বন্ধে, যা তার বাঁচার জন্য ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য তার পক্ষে অপরিহার্য। সেই সঙ্গে, সেগুলি পৃথিবীর প্রতি মানুষের মনোভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করে। একটি রঙ, ঘ্রাণ, স্বাদ বা ধ্বনির উপলব্ধি মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলি অনুভূতি ঘটায় যেগুলি পশুদের পক্ষে পরক, অর্থাৎ ভাবাবেগ। দর্শনগত ছাপগুলি, যেগুলি মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও পৃথিবীতে তার দিকস্থিতির ভিত্তি, সেগুলি একটি সুন্দর নিসর্গের, অথবা একটি শিল্পবস্তুর — চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতির নান্দনিক রসাস্বাদনের সঙ্গেও সম্পর্কিত হতে পারে।

ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানে স্পর্শগত সংবেদনগুলির এক বিশেষ

---

* V. I. Lenin, 'Conspectus of Feuerbach's Book *Lectures on the Essence of Religion*', Collected *Works*. Vol. 38, p. 71.

ভূমিকা আছে। এটা সর্বপ্রথমে লক্ষ করেছিলেন ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিক **এতিয়েন বোন্নো দ কঁদিলাক**, তিনি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিসম্পন্ন একটি মূর্তির প্রতিরূপ সৃষ্টি করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে সরলতম, ঘ্রাণবোধ, মনোযোগ গড়ে তোলে, সুখ ও কষ্ট দেয়; পরে বিকাশলাভ করে স্বাদ, শ্রবণ ও দর্শন। আর প্রধান বোধটি, কঁদিলাকের মতে অন্য সমস্ত বোধের 'শিক্ষক', হল স্পর্শবোধ, কারণ তা অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজকর্মের মধ্যস্থতা করে এবং ছাপ ও অনুভূতিগুলির মধ্যে সঞ্চারিত করে এক কল্পনামূলক চরিত্র, এইভাবে পৃথিবী সম্বন্ধে একটা জ্ঞান দেয় মানুষকে। এই চিন্তাটি পরীক্ষামূলকভাবে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। যে লোক একটি অস্ত্রোপচারের পর তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, যথাযথ পদার্থগুলিকে সে দেখতে পায় না — সে উপলব্ধি করতে পারে শুধু রঙের ছটা। একমাত্র স্পর্শগত অনুভূতিগুলির সঙ্গে মিলিয়েই, হাত যখন চোখকে 'শিখিয়েছে' তার পরেই সে পদার্থসমূহ দেখার সামর্থ্য লাভ করে।

আমাদের ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতিগুলি (সংবেদন ও উপলব্ধিগুলি) চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত, সেগুলি সচেতন চরিত্রের। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাচীন দার্শনিকরা কল্পনা করেছিলেন যে পৃথিবী পরমাণু দিয়ে গঠিত, যেগুলিকে কেউই ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে না। পরমাণুগুলিকে চিত্রিত করা হয়েছিল নানাভাবে: সেগুলিকে একত্রে জুড়ে থাকতে সক্ষম হওয়ার মতো কাঁটা আর আঙটাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,

বহুবিচিত্র আকৃতি হিসেবে, এক ধরনের বিলিয়ার্ড বল হিসেবে, অথবা সৌরজগতের অনুরূপ কিছু একটা হিসেবে, ইত্যাদি। পরমাণুর দর্শনগত প্রতিরূপ তার সম্বন্ধে জ্ঞানের স্তরের উপরে নির্ভরশীল ছিল। তাই, তার যে মডেলটি গ্রহজগতের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত, সেটি হল আধুনিক পদার্থবিদ্যার বিকাশের ফল। নক্ষত্রখচিত আকাশ পর্যবেক্ষণ করার সময়ে লোকে আকাশের এপাশ থেকে ওপাশে ধাবমান আলোকবিন্দু দেখতে পেত। তারা মনে করত যে পৃথিবী মহাসাগরে সন্তরণশীল আর নক্ষত্রগুলি নভোমণ্ডলে মুক্ত স্থান। লোকে তাদের ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পৃথিবীর একটি ছবি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল।

ধারণা, বা ভাব হল ইন্দ্রিয়গত অবধারণার এক জটিলতর রূপ। তা হল এমন একটি পদার্থ সম্বন্ধে ছাপ ও অনুভূতি, যেটি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে সব লোকের সঙ্গে একদা আমাদের পরিচয় ছিল তাদের প্রতিরূপ, অথবা যে সব শহরে আমরা গেছি বা আগে বাস করেছি সেগুলির প্রতিরূপ আমাদের মনে আছে। এগুলি হল ধারণা, ভাব; আমাদের স্মৃতির ক্রিয়ার দরুন সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতপক্ষে, একই পদার্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের মধ্যে খুবই বিভিন্ন ভাব থাকতে পারে। ভাবগুলি প্রভাবিত হয় মানুষের জ্ঞান, তার জীবনের অভিজ্ঞতা, ক্রিয়াকলাপের ধরন, চাহিদা ও অনুভূতির দ্বারা, সেগুলি সুনির্দিষ্ট পদার্থ ও ব্যাপারসমূহের গুণ-ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতব্য তথ্য জানায়। এই

ধারণাগুলির মধ্যে সেগুলির সমস্ত দিক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য থাকে না: মানুষ তার অনেকগুলি থেকে নিজেকে বিমূর্ত করে নেয়। সংবেদন ও উপলব্ধি পৃথিবীর যে চিত্র যোগায়, তার চেয়ে আরও গভীর ও আরও সাধারণ চিত্র যোগায় এগুলি, এবং এগুলি চিন্তনের আরও কাছাকাছি। শেষোক্তটি বৈজ্ঞানিক ধারণা সমেত কাল্পনিক ধারণাগুলি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এই ধরনের ধারণাগুলি শিল্পকলাতেও ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়। তার মধ্যে কতকগুলি নিতান্তই কাল্পনিক — দৃষ্টান্তস্বরূপ, মৎস্যনারী, ঊর্ধ্বাঙ্গ মানুষের মতো ও নিম্নাংশ ঘোড়ার মতো সেন্ট্যর, স্ফিংস, ইত্যাদি।

আগে আমরা বলেছি যে ভাবাবেগগুলি হল পৃথিবীকে দেখার জানালা। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতিগুলি কি সব সময়ে পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের সঠিক তথ্য যোগায়? না কি সেগুলি প্রবঞ্চনাকর? এই সমস্যাটি এমন কি প্রাচীনকালেও দার্শনিকদের কৌতূহলী করেছিল। তাঁদের কেউ কেউ মনে করতেন যে সংবেদনগুলি আমাদের সঠিক তথ্য ও প্রামাণ্য জ্ঞান দেয়, আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে আমরা যেমন উপলব্ধি করি, সেটি বাস্তবিক তেমনই। অন্যান্য দার্শনিকরা এবিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন। বস্তুতপক্ষে, কখনও কখনও মনে হয় যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পৃথিবীর একটা ভুল চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করে। আমাদের মেজাজ ও স্বাস্থ্যের অবস্থা-সাপেক্ষে আমরা একই পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখি। তবুও, একটি ইন্দ্রিয়গত প্রতিরূপের অন্তর্বস্তু অপরি-

বর্তনীয়। অধ্যাসগুলিও সেই সমস্ত অবস্থার উপরে নির্ভরশীল, যে অবস্থায় একটি উপলব্ধ ব্যাপার বিদ্যমান থাকে। যেমন, একটি পদার্থের আয়তন পরিবর্তিত না হলেও, সেটি বড় বা ছোট দেখায় যেখান থেকে আমরা সেটিকে দেখছি তার দূরত্ব অনুযায়ী। কিন্তু অধ্যাসগুলির শুধু নেতিবাচক দিকটি দেখা ভুল হবে। কখনও কখনও সেগুলি পৃথিবীর নির্দিষ্ট কিছু গুণ-ধর্ম সম্বন্ধে আরও বেশি জানতে আমাদের সাহায্য করে। যেমন, জলে ডোবানো একটি লাঠিকে মনে হয় ভাঙা, এবং এই আরোপিত প্রভাবটি আমাদের দেখায় যে জলে ও বায়ুতে আলোকের প্রতিসরণ হয় ভিন্নভাবে। গুণ-ধর্মের এই পার্থক্য আমাদের উপলব্ধিগুলিতে বিধৃত থাকে। উপলব্ধিগুলির কিছুটা সীমাবদ্ধতার একটা ইতিবাচক দিকও আছে।

লোকে সাধারণভাবে দেখতে, শুনতে ও বোধ করতে পারে নির্দিষ্ট একটা পরিধির মধ্যে, যা পৃথিবীতে নিজের অবস্থান খুঁজে পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ইন্দ্রিয়গুলির সীমিত চরিত্র যখন একটা প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে, তখন কিছু কিছু 'বিবর্ধক' ব্যবহৃত হয়। মানুষ বিভিন্ন যন্ত্রকৌশল সৃষ্টি করে এবং সেগুলিকে প্রয়োগ করে তার ক্রিয়াকলাপে: সে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে একটি টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে, যেটি গ্রহগুলিকে তার 'কাছাকাছি' নিয়ে আসে; একটি ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে সে অদৃশ্যকেও দেখতে পায়; একটি লেসার রশ্মি তাকে সূক্ষ্মতম অস্ত্রোপচার করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন যন্ত্রকৌশলের সহায়তায় মানুষ

উপলব্ধি করতে পারে ধ্বনিহীন ও অদৃশ্যকেও, অর্থাৎ আলট্রা-ধ্বনি, এবং অবলোহিত ও অতিবেগনি রশ্মিকেও। সংবেদনগুলির পরিধি বিস্তৃত করার পক্ষে মানুষের ক্রিয়াকলাপও বিরাট গুরুত্বপূর্ণ: যেমন, একজন অংকনশিল্পী বর্ণাভার বিরাট পরিসরের মধ্যে পার্থক্যনির্ণয় করে, একজন সাংগীতিকের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর, এবং একজন খাদ্য ও মদ্য-রসিকের স্বাদ-গন্ধবোধ অসাধারণ তীক্ষ্ন। ইন্দ্রিয়গুলির উপলব্ধিক্ষমতার বিকাশের সুযোগ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্ততপক্ষে ক্রিয়াকলাপের এক ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট পর্যায়ে। তবুও, পৃথিবী অবধারণায় তা একটা বেড়া খাড়া করে না, কিন্তু মানুষের আছে তার ইন্দ্রিয়াভূতি ছাড়াও মন ও বিচারবুদ্ধি, যা প্রকৃতির দীর্ঘ ক্রমবিকাশ ও মানুষের ক্রিয়াকলাপের ঐতিহাসিকভাবে গঠিত ফল।

মানুষের ইন্দ্রিয়গত প্রতিরূপগুলিই (সংবেদন, উপলব্ধি, ধারণা বা ভাব) শেষ বিচারে জ্ঞানের উৎস। এগুলির সঙ্গেই পৃথিবীর অবধারণা শুরু হয়, এবং এগুলি নিয়েই গঠিত হয় পৃথিবীর জ্ঞানের এক উচ্চতর রূপ, চিন্তনের সূত্রপাতের ভিত্তি।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে মন

মানুষের ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও বহুবিচিত্র, তবুও তা জ্ঞাতব্য তথ্য যোগায় শুধু বিচ্ছিন্ন কতকগুলি পদার্থ ও ব্যাপার সম্বন্ধে, কেননা সামান্যীকরণগুলি ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতিতে সীমিত। ইন্দ্রিয়গত

ছাপ ও অনুভূতিগুলি প্রতিফলিত করে পদার্থ ও ব্যাপারসমূহের শুধু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে, সেগুলির গভীরে প্রবেশ করে না; সুতরাং সেগুলি সম্বন্ধে এক সত্যিকার জ্ঞান তা দিতে পারে না। পদার্থগুলির আভ্যন্তরিক বৈশিষ্ট্যগুলি, সেগুলির অন্তঃসার ইন্দ্রিয়গত অবধারণায় আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয় না। আর অবধারণার মুখ্য লক্ষ্য হল পদার্থ ও ব্যাপারসমূহের আন্তর প্রকৃতি (অন্তঃসার) আবিষ্কার করা: অন্তঃসার সম্বন্ধে জ্ঞানই শুধু মানুষকে তার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে পথনির্দেশ করতে পারে।

তাই, সংবেদনগুলি হল একমাত্র উৎস, যা বাহ্যিক পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতব্য তথ্য দেয়, আর মন, অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি বা চিন্তন, যা আভ্যন্তরিক গুণ-ধর্ম ও সেগুলির সংযোগ অবধারণা করতে সাহায্য করে, তা সেগুলির ভিত্তিতে মিলে যায়। এর সঙ্গে যোগ করা উচিত যে ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিন্তনের গঠন মানুষের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা, বিশেষত শ্রমের দ্বারা, নির্ধারিত হয়। চিন্তনের চারিত্র্যনির্ণয় করার চেষ্টা করা যাক।

মানুষের বিচারবুদ্ধির রহস্যের তল খুঁজতে গিয়ে আমরা এসে পড়ি বিমূর্তনের অথবা সামান্যীকৃত চিন্তার জগতে। ইন্দ্রিয়গত ছাপ ও অনুভূতিগুলির সীমিত, অসম্পূর্ণ চরিত্র থাকে সেগুলির দৃষ্টিগোচরতার মধ্যে, তা আমরা আগেই দেখেছি। উপলব্ধি আমাদের জ্ঞাতব্য তথ্য যোগায় **সেই সমস্ত** পদার্থ ও ব্যাপার সম্বন্ধে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে, সরাসরি আমাদের উপরে

ক্রিয়া করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা বিশেষ একটা গাছ দেখি — পাম, পাইন বা বার্চ গাছ, অর্থাৎ সাধারণভাবে একটি গাছকে আমরা মনশ্চক্ষে দেখি না, দেখি শুধু নির্দিষ্ট, বিশেষ গাছটিকে। ভাবগুলিও পদার্থসমূহের ইন্দ্রিয়গত-দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে পুনরুৎপাদন করে: একজন লোক যে হ্রদটি কিছুকাল আগে দেখেছে অথবা যেটির বিষয়ে শুনেছে সেই হ্রদটি সে কল্পনা (স্মরণ) করতে পারে। তাই ভাবগুলি নিজেরাই এক ইন্দ্রিয়গত-দৃশ্যগত চরিত্রের। সেগুলির মধ্যেকার অনেক বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা নিজেদের বিমূর্ত করে নিই, তবুও সেগুলি যে দৃশ্যগত থাকে না তা নয়। আমরা যখন একটি আপেল কল্পনা করি, তখন রঙ, গন্ধ, স্বাদ, প্রভৃতির মতো তার কিছু কিছু গুণ-ধর্মকে 'বর্জন' করে, বস্তুটির শুধু দেহরেখাটিকে রেখে দিতে পারি। তখনও তা একটা দৃশ্যগত প্রতিরূপ থাকে। পদার্থ ও ব্যাপারসমূহে সহজাত সব কিছুই দেখা, শোনা ও অনুভব করা যায় না এবং ইন্দ্রিয়গত প্রতিরূপে প্রকাশ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা বৈদ্যুতিক আলো দেখতে পারি, কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহকে চলমান ইলেকট্রনগুলির এক প্রবাহ বলে কল্পনা করতে পারি না; আমরা বস্তুসমূহকে পড়তে দেখি, কিন্তু অভিকর্ষের নিয়মটা দেখতে পাই না: তা অবধারণা করার জন্য আমাদের দরকার চিন্তন, মন, বা বিচারবুদ্ধি।

চিন্তন আমাদের জ্ঞান যোগায় পদার্থসমূহের প্রধান, মূল (আবশ্যিক) গুণ-ধর্ম সম্বন্ধে। চিন্তনে, মানুষ

ইন্দ্রিয়গত-দৃশ্যগত গুণ-ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে নিজেকে বিমূর্ত করে নেয় এবং গঠন করে বিমূর্তন— 'গাছ', 'বাড়ি', 'গতি'। বিমূর্তনের প্রক্রিয়াটা রয়েছে ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে বাহ্যিক বা অনাবশ্যককে বর্জন করার মধ্যে; তা হল চিন্তার মধ্য দিয়ে অবধারণা। চিন্তন আমাদের সাহায্য করে নিয়মগুলি বুঝতে — অর্থাৎ প্রকৃতি ও সমাজে সারমূলক, প্রয়োজনীয় ও পুনঃঘটমান যোগসূত্র ও সম্পর্কগুলি বুঝতে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অভিকর্ষের নিয়ম, গ্যাসের গতির নিয়ম, মূল্যের নিয়ম, ইত্যাদি। মানুষ নিয়মগুলি সম্বন্ধে তার জ্ঞানকে ব্যবহার করে তার ক্রিয়াকলাপে। বাস্তবের নিয়মগুলি অনুধাবন করে মানুষ নির্মাণ করতে শিখেছিল সেতু ও বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, বিমান ও মহাকাশ রকেট।

ভাবগুলি কীভাবে দেখা দেয়?

একটি **ধারণা** বা ভাব হল চিন্তনের মূল ও সরলতম রূপ। এই রূপই মানুষকে সাহায্য করে একটি পদার্থের সাধারণ, আবশ্যিক গুণ-ধর্ম সাধারণভাবে প্রকাশ করতে: গতি, দ্যুতি, উপগ্রহ, ধাতু, মানুষ, পশু, ইত্যাদি। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি উদ্ভিদ সম্বন্ধে ধারণা জোর দেয় শুধু সেই জিনিসটিরই উপরে, যেটি সমস্ত উদ্ভিদে সহজাত। কিংবা মানুষ সম্বন্ধে ধারণাটি ধরা যাক। একজন ব্যক্তিমানুষের জাতিবর্ণ, বয়স, বাসস্থান, পেশা, লিঙ্গ, পারিবারিক অবস্থা, ব্যক্তিগত

বৈশিষ্ট্য, অভ্যাস, প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ তথ্য তাতে থাকে না। প্লেটো মানুষের সংজ্ঞা-নিরূপণ করেছেন এক দ্বিপদ পালকহীন জীব বলে। গল্প আছে যে এক দিন প্লেটোর একজন শিষ্য পালক-ছাড়ানো একটি কুক্কুটশাবক পাঠস্থলে এনে তার শিক্ষকের টেবিলের উপরে রেখে বলেছিল, 'প্লেটোর মতে, এটা মানুষ।' মানুষ সম্বন্ধে অন্যান্য ধারণাও আলোচিত হয়েছিল: দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষ হল বিচারবুদ্ধি ও বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীব। মার্কসই বস্তুত মানুষকে জীবজগৎ থেকে আলাদা করে বেছে নিয়েছিলেন তার শ্রমের হাতিয়ারপত্র উৎপাদন করার সামর্থ্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। মানুষ সম্বন্ধে মার্কসের ধারণায় জোর দেওয়া হয় সেই লক্ষণগুলির উপরে, যেগুলি সমস্ত মানুষের বৈশিষ্ট্যসূচক (সমস্ত মানুষে সারগত), যথা, কাজ করা, চিন্তা করা ও কথা বলার সামর্থ্য। ধারণা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ঘটে মূর্ত থেকে বিমূর্তে যাওয়ার মধ্যে, আর খোদ ধারণাগুলি হল বিমূর্তন।

মানুষের ক্রিয়াকলাপ হল সেই ভিত্তি, যার উপরে ধারণাগুলি গঠিত হয়। ত্রিকোণ, বৃত্ত বা বর্গক্ষেত্রের ধারণা দেখা দেওয়ার আগে, লোকে তাদের ব্যবহারিক কার্যকলাপে বিভিন্ন আকৃতি ও রূপের বহু পদার্থের সংস্পর্শে এসেছিল। সেগুলিকে পরিমাপ ও তুলনা করে দেখার সময়ে, অর্থাৎ সেগুলির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটার সময়ে, লোকে সেগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণ-ধর্ম লক্ষ করেছিল। ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য এইখানেই যে এর ফলে প্রধান বৈশিষ্ট্যটি

সম্বন্ধে অনুধাবন ঘটে। মনে হতে পারে যে একটি ধারণা (বিমূর্তন) আশু একটি ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির চেয়ে বেশি সীমিত, কিন্তু তা নয়। এমন কি আদিমতম ধারণাও ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির চেয়ে বেশি গভীর, এবং তা যে জ্ঞান যোগায় তা আরও সম্পূর্ণ ও প্রামাণ্য। তাই, গতি সংক্রান্ত ধারণাটি গতির বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এবং একটি যন্ত্র, ঘোড়া, মানুষ, প্রভৃতির গতি শুধু পর্যবেক্ষণ করার চেয়ে তা অনেক বেশি আবশ্যিক। তা হলেও, এই প্রশ্ন উঠতে পারে— কোনটা বাস্তব ব্যাপারসমূহকে প্রতিফলিত করে, ধারণা না বিমূর্তন? দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ফলের' ধারণাটা নেওয়া যাক। তা বোঝায় একটি মূর্ত আপেল, একটি নির্দিষ্ট কলা, অথবা একটি কমলাকে। এই সব জিনিসই বাস্তবে বিদ্যমান এবং চিন্তনে তা প্রকাশ করা যায় অনুসঙ্গী ধারণাটির সাহায্য নিয়ে — একটি আপেল, কমলা, বা কলা। কিন্তু ঘটনা এই যে শুধু মূর্তই নয়, আরও বিমূর্ত ভাবধারণাও — আমাদের দৃষ্টান্তে, 'ফলের' ধারণা — বাস্তব গুণ-ধর্মগুলি প্রতিফলিত করতে সাহায্য করে: বিভিন্ন ধরনের ফলের মধ্যে যা অভিন্ন সেটাকে প্রকাশ করে এই ভাবধারণাগুলি। ভাবধারণাগুলি পরিবর্তমান পৃথিবী ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপকে প্রতিফলিত করে, এবং তাই সেগুলি নিজেরাই পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে। এইভাবে, নতুন ধারণাগুলির উদ্ভব হয় একটা ফল হিসেবে, যেমন একটা বিমান, একজন মহাকাশচারী, ইত্যাদি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পদার্থবিদ্যা অতিক্ষুদ্র কণিকাগুলির

গুণ-ধর্ম ও সেগুলির অস্বাভাবিক গুণ-ধর্মকে প্রকাশ করে, তা প্রতিফলিত হয় সেগুলির নামের মধ্যে — 'বিচিত্র', 'মনোহর', ইত্যাদি।

ধারণাগুলির, এবং সামগ্রিকভাবে চিন্তনের গঠন বাক্‌শক্তি বা ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ধারণাগুলির (ভাব) ভাষায় ব্যক্ত হয় পৃথক পৃথক শব্দ বা গোটা ব্যাকাংশ দ্বারা। চিন্তন ছাড়া ভাষা থাকতে পারে না। এবং যদিও প্রথমত তা পদার্থসমূহকে বোঝানোর কাজেই লাগে, তা হলেও তা লোকের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের একটা উপায়ও বটে। শুরুতে, মানুষ ব্যাপারসমূহকে বোঝাত নানান ধ্বনি উচ্চারণ করে, পরে, চিত্ররৈখিক উপস্থাপনা দিয়ে। ভাষা অবশ্য শুধু পদার্থসমূহকেই বোঝায় না, চিন্তাকেও প্রকাশ করে। জোনাথান সুইফ্‌ট তাঁর বিখ্যাত *Gulliver's Travels* বইতে উপহাস করেছেন সেই বিজ্ঞানীদের যাঁরা মনে করতেন যে শব্দগুলি পদার্থসমূহের প্রতিকল্প মাত্র। এই অভিমতের অনুসারীরা এই মতৈক্যে উপনীত হয়েছিলেন যে শব্দগুলিকে বিলুপ্ত করে পদার্থসমূহ দিয়ে সেগুলিকে প্রতিস্থাপিত করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে, তাঁরা প্রত্যেকে বিভিন্ন পদার্থে ভর্তি একটি থলি সঙ্গে রাখতেন এবং অন্যদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের চেষ্টা করতেন বিশেষ বিশেষ জিনিস বার করে এবং সেগুলি দেখিয়ে; এইভাবে তাঁদের ভাব-বিনিময় করার সমস্ত প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছিল, সেটা আশ্চর্য কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ধ্বনিগুলি বা চিত্ররৈখিক প্রতিরূপগুলি নির্দিষ্ট কতকগুলি ভাবের বাহক।

বাচনে শব্দের সাহায্যে, আমরা পদার্থসমূহকে শুধু বোঝাই না, সেগুলির গুণ-ধর্ম প্রকাশ করি। যেমন, একটা ঘড়িকে ঘড়ি নামে অভিহিত করে আমরা বোঝাই যে সেটা সময়ের সঙ্গে জড়িত। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এই বিমূর্তনকর ক্রিয়াটি অনেক কম স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো কোনো যন্ত্রপাতিকে একটি অণুবীক্ষণ বা কম্পাস নামে অভিহিত করে, আমরা সেগুলির সারগত বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের জীবনে সেগুলি যে ভূমিকা পালন করে তা নির্দিষ্ট করি (জীবাণু পর্যবেক্ষণ করতে, স্থানে আমাদের দিকস্থিতি নির্ণয় করতে, প্রভৃতিতে সাহায্য করে বলে)। পদার্থসমূহকে শব্দ দিয়ে বর্ণনা করে, সেগুলির নামকরণ করে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত করি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি মূর্ত গৃহ — এবং সাধারণভাবে মানুষের আবাস; একটি বার্চ অথবা পাইন গাছ — এবং সাধারণভাবে একটি গাছ; একটি বাঘ বা ভালুক — এবং একটি পশু, একটি শিকারী প্রাণী, ইত্যাদি। ফলত, বিভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করে শব্দ ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ করে, এবং তাই নতুন জ্ঞানের প্রসার ঘটায়।

ধারণা হল চিন্তনের একটি রূপ। তার অন্য রূপগুলি হল বিচারগত অভিমত ও অবরোহী প্রথায় সিদ্ধান্ত। **একটি বিচারগত অভিমত** হল ধারণাগুলির সেই সংযুক্তি, যেখানে একটির বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয় আরেকটির মধ্য দিয়ে; একটি ভাব, যার সাহায্যে কোনো

কিছু প্রতিপন্ন অথবা নাকচ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষ ইতিহাসের স্রষ্টা; একটা perpetuum mobile নির্মাণ করা অসম্ভব। ধারণা ও বিচারগত অভিমতগুলি পরস্পর-সম্পর্কিত। শেষোক্তগুলি প্রথমোক্তগুলি দিয়ে গঠিত; সুতরাং চিন্তা করা মানে অভিমত প্রকাশ করা। জনৈক কবি একটি অভিমত প্রকাশ করেছেন: 'সহৃদয় শব্দগুলি গোলাপের মতো, মন্দ শব্দগুলি — নিষ্ঠুর আঘাতের মতো।' বিচারগত বিবেচনা চিন্তনের বিকাশ ঘটাতে সাহায্যে করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আদিম মানুষ ঘর্ষণের সাহায্যে অগ্নি (তাপ) উৎপন্ন করতে শিখেছিল। ঘর্ষণই তাপের উৎস এই অভিমত প্রকাশ করার আগে কেটে গিয়েছিল বহুযুগ। আরও বেশ কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে শুধু ঘর্ষণই নয়, সাধারণভাবে যান্ত্রিক গতির সঙ্গেও তাপ নির্গত হয়। অবশেষে, ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে তাপ ও গতির মিথষ্ক্রিয়া বিশ্বজনীন, এবং এই নিয়ম সূত্রবদ্ধ করা হয় যে গতি লুপ্ত হয় না, বরং তার একটি রূপ থেকে আরেক রূপে রূপান্তরিত হয়। এটা দেখায় জ্ঞানের অগ্রগতি, একটিমাত্র বিচারগত অভিমত থেকে আরও সাধারণ এক বিচারগত অভিমতে, এবং সেখান থেকে সর্বজনীনে চিন্তনের অগ্রগতি।

এক সারি বিবেচনা তৈরি করে চিন্তনের এক নতুন রূপ — **অবরোহী প্রথায় সিদ্ধান্ত**, যেখানে নতুন জ্ঞান আহরণ করা হয় ইতিপূর্বেই সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আরিস্ততলের নমুনাসই একটি

চিন্তার মালা: সমস্ত মানুষ মরণশীল। সক্রেটিস একজন মানুষ। ফলত, তাঁরও মৃত্যু হবে। কিংবা আরেকটি দৃষ্টান্ত নিন: ফরাসী রসায়নবিদ ও রোগজীবাণুবিদ লুই পাস্তুর, যিনি অ্যানথ্রাক্স বা দুষ্টব্রণ রোগের কারণ সন্ধান করছিলেন। এক দিন তিনি লক্ষ করেন যে তৃণভূমির একটি জায়গার ঘাসের রঙ অন্যান্য জায়গার তুলনায় অন্য রকম। তাঁকে জানানো হয় যে অ্যানথ্রাক্স রোগে মৃত একটি ভেড়াকে সেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। জমিটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করে পাস্তুর কেঁচোর বহু চিহ্ন দেখতে পান, তাই তিনি বলেন যে কেঁচোই অ্যানথ্রাক্সের বীজগুটি ভূপৃষ্ঠে নিয়ে আসে এবং সেগুলিই হল সংক্রমণের বাহন। এইভাবে, একটি সঠিক সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, অর্থাৎ কিছু নতুন জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল চিন্তনের সাহায্যে। চিন্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ-ধর্ম হল তার অজ্ঞাত থেকে জ্ঞাততে যাওয়ার সামর্থ্য, অর্থাৎ, অজ্ঞাতকে অবধারণা করার সামর্থ্য।

অবধারণা ও সৃষ্টিশীলতা

অবধারণার প্রক্রিয়া, তার স্তর ও রূপগুলি আলোচনা করার সময়ে আমরা এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে তার বৈশিষ্ট্য হল পৃথিবীর রহস্যভেদ করতে, নতুন জ্ঞান অর্জন করতে, এবং এই ভিত্তিতে পৃথিবীর রূপান্তরসাধন করতে মানুষের সামর্থ্য।

মানুষের ক্রিয়াকলাপের সৃষ্টিশীল চরিত্রের, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তথা কাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টার এই হল সারমর্ম।

সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপ কী?

একে প্রায়শই নতুন কিছু সৃষ্টির সঙ্গে এক করে দেখা হয়। সৃষ্টিশীল ক্রিয়াগুলির অধ্যয়ন জটিল, কারণ নতুন জ্ঞান প্রায়শই দেখা দেয় অপ্রত্যাশিতভাবে, 'রহস্যোদ্ঘাটনের' ধরনে, হঠাৎ সারমর্মে প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে। এর ফলে সৃষ্টিশীলতার দুটি দিকের বৈপরীত্য সাধন ঘটেছে: চেতন, যা চিন্তনের দ্বারা নির্ধারিত, এবং অবচেতন, যা চিন্তনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত নয়, বরং গভীরতর, লুক্কায়িত প্রক্রিয়াসমূহ — স্বজ্ঞা ও কল্পনার দ্বারা পরিচালিত। এর ফলে আবার অবচেতনের পরমকরণও (অতিরঞ্জন) ঘটেছে, অর্থাৎ চিন্তনের বৈপরীত্যে স্বজ্ঞাকে স্থাপন করার ঘটনা, এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সৃষ্টিশীলতার এক ভাববাদী ব্যাখ্যা ও সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপে চৈতন্যের ভূমিকার হেয়করণ ঘটেছে।

সৃষ্টিশীলতাকে পরীক্ষা ও ভুল করতে করতে শেখার প্রক্রিয়া হিসেবে, নতুনকে পাওয়ার চিরাচরিত উপায়গুলি বর্জন করে সম্ভাব্য সমাধানগুলির যান্ত্রিক বাছাই হিসেবে ব্যাখ্যা করাও ভুল।

সৃষ্টিশীলতার অন্তঃসার সংক্রান্ত প্রশ্নটির মীমাংসা করার জন্য, এক দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা দরকার; এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতি, সমাজ এবং যে মানুষ তার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পৃথিবীকে

রূপান্তরিত করার কাজে নিযুক্ত সেই মানুষের বিষয়গত অস্তিত্বের স্বীকৃতিকে চরম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। মার্কসবাদ অগ্রসর হয় এই সিদ্ধান্তসূত্র থেকে যে বস্তুগত ক্রিয়াকলাপই মুখ্য; সমস্ত মৌলিক ধরনের সৃষ্টিশীলতা সেখান থেকেই আসে এবং তার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এক মুক্ত ও যদৃচ্ছ মানবিক ক্রিয়াকলাপ হিসেবে সৃষ্টিশীলতার ভাববাদী ব্যাখ্যা খণ্ডন করতে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব করে তোলে। সৃষ্টিশীলতা মূলত এক **সচেতন** প্রক্রিয়া। ব্যাপক অর্থে, তা হল একটি নতুন, সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ উৎপাদ সৃষ্টির কাজে জড়িত-মানুষের ক্রিয়াকলাপ। সংকীর্ণ অর্থে, একে বুঝতে হবে আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের সঙ্গে জড়িত এক প্রক্রিয়া হিসেবে। সৃষ্টিশীলতা দুটি দিকের ঐক্যকে প্রকাশ করে: নিজের চাহিদা ও লক্ষ্য অনুসারে পৃথিবীর রূপান্তরসাধনের সঙ্গে যুক্ত মানুষের প্রচেষ্টা, এবং তার সৃষ্ট উৎপাদটির, সংস্কৃতি জগতের সামাজিক মূল্য। মানুষ নিজেও তার সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এবং তার সামর্থ্যগুলিও বিকশিত হচ্ছে।

সৃষ্টিশীলতার অন্যতম রূপ হল পৃথিবীর বিজ্ঞানসম্মত অবধারণা; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এই যুগে তার ভূমিকা বিপুলভাবে বেড়েছে। অসামান্য জননায়ক ও রাষ্ট্রনীতিক জওহরলাল নেহরু লিখেছিলেন: 'তবুও, আমি স্থিরনিশ্চিত যে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের দীর্ঘ গতিপথে অন্য যে কোনো জিনিসের চেয়ে মানবজীবনে বেশি বিপ্লব

ঘটিয়েছে...'* বিজ্ঞানে সৃষ্টিশীলতা হল প্রথমত নতুন জ্ঞান গঠন, নতুন এক প্রস্তু ব্যাপারের ব্যাখ্যা, এক আবিষ্কার। এই সৃষ্টিশীলতা অর্জনের জন্য, তথ্য নিয়ত সঞ্চিত ও বিশ্লেষিত হওয়া দরকার, এবং নতুন নতুন ভাবধারণা উপস্থিত করা দরকার, এই ঘটনা সত্ত্বেও যে — মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফেনম্যান যথার্থভাবেই যেমন মন্তব্য করেছেন — 'একটা নতুন ভাবধারণার কথা চিন্তা করা অত্যন্ত কঠিন।'** সাধারণত, বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশীলতাকে উপস্থিত করা হয় এক ধীরস্থির অগ্রগতি হিসেবে, যা একটা সরল রেখা হিসেবে ঘটে না, বরং উল্লম্ফ ও সহজ-প্রবৃত্তি সমেত এক প্রক্রিয়া হিসেবে ঘটে।

বৈজ্ঞানিক অবধারণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রটি হল একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যা; একটি সমস্যা উপস্থিত না করে কোনো সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপ বা আবিষ্কার হতে পারে না।

একটি সমস্যা উপস্থিত করেই সৃষ্টিশীলতা শুরু হয়

মানুষ তাদের সারা জীবন ধরে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যাগুলি ব্যবহারিক, তত্ত্বগত,

---

* Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India,* Asia Publishing House, Bombay, 1964, p. 32.

** Richard Feynman, *The Character of Physical Law,* British Broadcasting Corporation, Cox and Wyman Ltd., London, 1965, p. 172.

বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক বা নীতিশাস্ত্রগত হতে পারে। কখনও কখনও একটি সমস্যা বর্ণিত হয় অ-জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান বলে, কারণ লোকের যে জ্ঞান আছে সেই জ্ঞান এবং তাদের আরও জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে তা প্রকাশ করে। সমস্যাগুলিকে তা ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ আর অবধারণার মধ্যে এক মধ্যস্থ (যোগসূত্রের একটি রূপ) করে তোলে। একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যাকে প্রায়শই বর্ণনা করা হয় ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত সেই সমস্ত প্রয়োজন ও চাহিদার এক তত্ত্বগত সংগঠন বলে, যা এই সমস্যাগুলির গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কখনও কখনও যে সমান্তরাল (ও প্রায়শই যুগপৎ) আবিষ্কারগুলি ঘটে, এই ঘটনাটা দেখায় যে এক দিকে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ও চাহিদা, অন্য দিকে ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন ও চাহিদার মধ্যে এক যোগসূত্র আছে; যেমন বৈদ্যুতিক বাল্ব উদ্ভাবন করেছিলেন টমাস এডিসন ও পাভেল ইয়াবলোচকভ; টেলিফোন উদ্ভাবন করেছিলেন আলেকজাণ্ডার বেল ও এলিশা গ্রে; শক্তি সংরক্ষণের নিয়ম যুগপৎ ও স্বতন্ত্রভাবে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন জুলিয়াস মেয়ার, জেমস্ জাউল, ও হেরমান হেল্মহোলৎস, ইত্যাদি। ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপকে একটি সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্যও প্রয়োগ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহাদেশ যখন অবরুদ্ধ হয়েছিল, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তখন ঘোষণা করেছিলেন যে আখের চিনি আর নীল রঞ্জনদ্রব্যের প্রতিকল্প যে বার করতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া

হবে। ফলে, রসায়নবিদ গ্রুস্টাভ কির্খহফ আঙুরের চিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

অবশ্য এই শর্তটা রাখা দরকার যে বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলি একটি সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের উপরে, বিশেষত তার আশু চাহিদার উপরে নির্ভরশীল হলেও, এই নির্ভরশীলতার প্রকৃতিটি হল আপেক্ষিক, কেননা সমস্যাগুলির আত্মপ্রকাশ নির্ধারিত হয়েছিল খোদ জ্ঞানেরই বিকাশের সঙ্গে জড়িত প্রয়োজন দিয়ে। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যা, জীবন বা কর্মপ্রয়োগ থেকে তা যত দূরবর্তীই মনে হোক না কেন, ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, যার জন্য জ্ঞান প্রয়োজন জ্ঞানের নিজেরই বিকাশের উদ্দেশ্যে এবং যা নিজেই সমস্যাবলী সমাধান ও যাচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করে। এটা কোনো সমাপতনের ব্যাপার নয় যে, পশু-প্রজনন যে-দেশে সুবিকশিত ছিল এবং যেখানে কৃত্রিম নির্বাচন প্রয়োগ করা হত, সেই ব্রিটেন পৃথিবীকে দিয়েছিল তত্ত্বগত জীববিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা চার্লস ডারউইন।

একটি সমস্যা নিছক একটি প্রশ্ন নয়; তার মীমাংসার প্রয়াসে ব্যবহৃত পদ্ধতিও বটে। একটি উত্তরের সন্ধানের সঙ্গে 'পরীক্ষা ও ভুল করতে-করতে শেখার' পদ্ধতি ব্যবহার করে উপাত্তগুলির সরল সঞ্চয়ন ও সারসংক্ষেপকরণ জড়িত থাকতে পারে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পূর্বদৃষ্টি, যে সব 'সৌভাগ্যপূর্ণ অনুমান' বা 'ভাগ্যের কৃপা' গবেষকের সযত্ন ও কষ্টকর কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করে, সেগুলিও বাদ পড়ে না। বিজ্ঞানের ইতিহাস

থেকে বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে এটা দেখানো যায়। লুই পাস্তুর একটা মন্তব্য করেছিলেন যে প্রকৃতি তার রহস্য উদ্ঘাটন করে শুধু শিক্ষিত মনের কাছে। সাধারণত ভাগ্য থাকে তাদেরই সঙ্গে যারা তাদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কঠোরভাবে কাজ করছে। যেমন, জার্মান রসায়নবিদ ফ্রিডরিখ আউগস্ট কেকুলে ফন স্ট্রাডোনিৎস এক বেনজল অণুর গঠনকাঠামো সৃষ্টির ব্যাপারে বহু বছর ক্লান্তিকর কাজ করেছিলেন। প্রথমে, তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের মতো, উন্মুক্ত বন্ধনের নীতির উপরে এটি খাড়া করতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু এই পদ্ধতি সুস্পষ্ট বাস্তব ঘটনার বিরোধী ছিল। তার পর এক দিন, কতকগুলি বাঁদরকে যখন খাঁচায় পুরে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি বাসে চেপে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বাঁদরগুলো তাদের লেজ আর হাতের সাহায্যে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে একটি বৃত্ত রচনা করেছিল, তাই বিজ্ঞানীর মাথায় এই চিন্তাটা এল যে অণুর গঠনকাঠামোর এটা প্রতিরূপ হতে পারে। তাই 'ভাগ্যের কৃপাই' তাঁকে তাঁর আবিষ্কারে সাহায্য করেছিল।

অজ্ঞাত থেকে জ্ঞাততে জ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে পদ্ধতিতত্ত্বগত নীতিসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সহায়ক উপাদান। বৈজ্ঞানিক সমস্যাবলী সমাধান-প্রয়াসী বিজ্ঞানীর পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক নীতিগুলি এক দৃঢ় বনিয়াদ। এই সমস্ত নীতি উপেক্ষা করার ফলে বিজ্ঞানীরা প্রায়শই অচলাবস্থায় গিয়ে পড়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত, উল্লেখযোগ্য বিষয়ীমুখ

ভাববাদী দার্শনিক **এর্নস্ট মাখ** পরমাণুর প্রকল্পকে অস্বীকার করে নিজের দার্শনিক অনুমানগুলি প্রচার করে চলেছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন বিজ্ঞান পরমাণুর জটিল গঠনকাঠামো আবিষ্কার করার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল (১৯শ শতাব্দীর শেষ — ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিক)। মাখের পক্ষে তা রীতিমত যুক্তিসংগত ছিল, তাঁর কাছে একমাত্র বাস্তব ছিল সংবেদনগুলির সাকল্য। কিন্তু, এরূপ অবস্থান বিষয়গত বাহ্যিক ব্যাপারসমূহের স্বীকৃতির সঙ্গে বেমানান। পৃথিবীর বিষয়গত প্রকৃতি ও মানুষের তাকে বোঝার সামর্থ্য সম্বন্ধে প্রত্যয়শীল বিজ্ঞানীদের চাপের দরুনই শুধু মাখ শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্ভট অভিমত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা মূল দার্শনিক নীতিসমূহ ও অনুসন্ধানের উপায় বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়, সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণাই বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলি সমাধানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। মার্কসবাদী অবস্থান-নিষ্ঠ একজন বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণার ভিত্তি করেন বস্তুর মুখ্য চরিত্র ও চেতনার গৌণ চরিত্রের স্বীকৃতির নীতিকে, পৃথিবী ও তার বিকাশকে অনুধাবন করতে মানুষের সামর্থ্য, ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ, ইত্যাদিকে। যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নীতি সঠিকও হতে পারে অথবা ভুলও হতে পারে, সেগুলিও গবেষণা চলাকালে প্রযুক্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জার্মান ইঞ্জিনিয়ার এর্নস্ট ভের্নার সীমেন্স যুক্তি দিয়েছিলেন যে বাতাসের চেয়ে ভারি যন্ত্র বিমানচালনে ব্যবহার করা

অসম্ভব; এবং হেরমান হেল্‌মহোলৎস গাণিতিক দিক দিয়ে এই প্রকল্পটি 'প্রমাণও' করেছিলেন। কিন্তু বিমানচালনার বিকাশ তাঁদের সিদ্ধান্তের ভ্রান্ততা প্রমাণ করেছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি হল একজন অনুসন্ধানকারীর লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। কিন্তু শুধু পুরনো জ্ঞান থেকে আহরণ করেই নতুন জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। নতুন কিছু শেখার জন্য, পুরনো জ্ঞানের গণ্ডির বাইরে যাওয়া দরকার। এরূপ এক স্থানান্তরণ, পুরনো জ্ঞানের সংশোধনমূলক পুনর্বিচার, এক কষ্টকর প্রক্রিয়া। নতুন তার পথ করে নেয় পুরনোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে — এবং একথা বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও রাজনীতি সর্বত্রই প্রযোজ্য। চিন্তনের বৈশিষ্ট্য হল কিছুটা পরিমাণ স্থিতিশীলতা এবং অভিমত পুনর্বিবেচনা করার অনিচ্ছা, এটা শুধু অজ্ঞজনের মধ্যেই নয়, মহামনীষীদের মধ্যেও থাকে। বিজ্ঞানের ইতিহাস এর জাজ্বল্যমান প্রমাণে পূর্ণ: দার্শনিক ও গাণিতিক গটফ্রিড লেইবনিৎস নিউটনের মহাকর্ষের নিয়মের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছিলেন; ফ্র্যান্সিস বেকন ও বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী টিখো ব্রাগে কোপারনিকাসের চিন্তাকে নাকচ করেছিলেন; আপেক্ষিকতা তত্ত্বের স্রষ্টা **আলবার্ট আইনস্টাইন** বহু বিজ্ঞানীর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এমন কি বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক ধরনের তত্ত্ব চালু আছে যে নীতিগতভাবে নতুন একটি বৈজ্ঞানিক ধারণা তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়: প্রথমে সেটিকে আক্রমণ করা হয় এবং উদ্ভট

বলে ঘোষণা করা হয়; তার পরে মত প্রকাশ হতে শুরু করে এই মর্মে যে তা সত্যি হতেও পারে, তবে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ কিছু নয়; এবং শেষ পর্যন্ত, তার প্রকৃত তাৎপর্য স্বীকার করা হয় এবং ভূতপূর্ব সমস্ত বিরোধীরা সেটি আবিষ্কারের সম্মান পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

নতুনের সন্ধান

সৃষ্টিশীল সন্ধানের ফলে **আবিষ্কার** ঘটে, যা একটা নতুন, প্রকৃত জ্ঞান, বস্তুগত পৃথিবী বা আত্মিক সংস্কৃতির পূর্বে অজ্ঞাত তথ্য, গুণ-ধর্ম বা নিয়মগুলির উদ্ঘাটন। আবিষ্কার হল একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার সারসংকলন, তার বৈশিষ্ট্য হল নির্দিষ্ট একটি ফল, প্রকৃতি ও সমাজের বিজ্ঞানসম্মত অবধারণায় এক নতুন অগ্রগতি। নতুনের সন্ধান হল অবধারণার সমগ্র প্রক্রিয়া, তা শুরু হয় কল্পন (প্রস্তুতি) দিয়ে, তার পর বস্তু-উপকরণ সঞ্চয়ের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়, অবশেষে হয় সেই আবিষ্কারটি এবং তার যাচাই। প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে থাকে বস্তু-উপকরণ সংগ্রহ ও প্রণালীবদ্ধকরণ, তার জন্য অনেক সময় লাগতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডারউইন তাঁর জীবনের মহত্তম রচনা *On the Origin of Species by Means of Natural Selection* প্রকাশ করার আগে তথ্যাদি সংকলন ও প্রণালীবদ্ধকরণের পিছনে বহু বছর ব্যয় করেছিলেন। বস্তু-উপকরণের প্রণালীবদ্ধকরণের সঙ্গে জড়িত থাকে, সর্বোপরি,

ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের এক পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপরেখা, যে নির্দিষ্ট কতকগুলি নীতির উপরে নির্ভর করতে হবে সেগুলির বাছাই, এবং প্রযোজ্য পদ্ধতিগুলির সন্ধান। বহু গবেষকের মতে, বস্তু-উপকরণ সঞ্চয়নের — পুষ্টিসাধনের — জন্য দরকার হয় প্রচুর মেধা, বোধ ও ইচ্ছাশক্তি, এবং মেনে নেওয়া নীতি-নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়ার সামর্থ্য তাতে পূর্বানুমিত। যেমন, গাণিতিক জুল আঁরি পোয়াঁকারে ও হেন্ডরিক আণ্টন লোরেনৎস আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কারের কাছাকাছি এসেছিলেন, কিন্তু ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার নীতি-ভিত্তিক যে সমস্ত অভিমতকে তাঁরা অলংঘনীয় মনে করতেন, সেই চিরাচরিত অভিমত কাটিয়ে উঠতে তাঁরা অপারগ হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সাধারণত কীভাবে হয় সে বিষয়ে একটি সরল উক্তি আছে। বলা হয়, বিজ্ঞানে যা কিছু নতুন তা আবিষ্কৃত হয় এইভাবে: প্রত্যেকেই জানে যে তা অসম্ভব, তার পর একজন নির্বোধ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, সে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনবহিত, তাই সে একটা আবিষ্কার করে। এই উক্তিটির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চিন্তা আছে: চিন্তনে পদরেখা-চিহ্নিত পথ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত এবং নিজের পথ নিজে তৈরি করা উচিত।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি বুনিয়াদি হতে পারে, অথবা অ-বুনিয়াদিও হতে পারে। প্রথমোক্তটি পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণার উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং আমাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে সংশোধন-পরিবর্তনের মধ্য

দিয়ে গড়ে তোলে। জ্ঞান নিজেই স্থির করে দেয় নতুন নতুন নীতি: গালিলিও, কোপারনিকাস, নিউটন, ডারউইন, মার্কস ও আইনস্টাইনের আবিষ্কারগুলি স্মরণ করাই যথেষ্ট। অ-বুনিয়াদি আবিষ্কার হল সেগুলি, যেগুলি পূর্বেই প্রতিপন্ন জ্ঞাত নীতিগুলির ভিত্তিতে অর্জিত। এই ধরনের আবিষ্কারগুলি অনেক বেশি ঘন ঘন হয়, তবে এক্ষেত্রেও গবেষণার উপায়-পদ্ধতি বাছাই একটা সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া। এই ধরনের আবিষ্কারের মধ্যে আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আণবিক জীববিদ্যার জন্ম, প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠোদ্ধার ও গ্রহগুলির আবিষ্কার। ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আরবাঁ-জাঁ-জোসেফ ল্য ভেরিয়ে এইভাবেই নেপচুন গ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন। গ্রহগুলির গতির একটা নকশা সংকলন করার সময়ে তিনি লক্ষ করেন যে ইউরেনাস তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তিনি বলেন যে এই পথচ্যুতি একটা অজ্ঞাত গ্রহের প্রভাবের দরুন হতে পারে, এবং তিনি সেটির সম্ভাব্য কক্ষপথ ও অবস্থান হিসাব করেন। তাঁর প্রকল্পটি সম্বন্ধে তিনি বার্লিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহান গ. হাল্লেকে লেখেন, এবং শেষোক্তজন, আকাশের প্রাসঙ্গিক অংশটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করার পর, আবিষ্কার করেন ইতিপূর্বে অজ্ঞাত একটি গ্রহ, যার নামকরণ হয় নেপচুন।

একটি আবিষ্কার হঠাৎ, এক মুহূর্তের মধ্যে হতে পারে। একটা 'রহস্যোদ্ঘাটনের' মতো, তা হল দীর্ঘ এক অনুসন্ধানে একটা অপ্রত্যাশিত পুরস্কার। বলা হয় যে আবিষ্কারগুলি একজন বিজ্ঞানীর মনে আসে সম্পূর্ণরূপে ও ত্রুটিহীনভাবে, জিউসের মাথা থেকে আথেনার উদ্ভবের মতো এই ধরনের আবিষ্কারগুলিকে প্রায়ই জড়িত করা হয় **স্বজ্ঞার সঙ্গে**; তাই স্বজ্ঞার ধারণাটা হল এক নির্দিষ্ট ধরনের অতীন্দ্রিয় ক্রিয়া, যা একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত। আজ বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এই ধরনের সব কথার সমার্থবোধক শব্দ দিয়েছে, যেমন — দ্রুত উপলব্ধি, কল্পনা ও সুস্থ বিচারগত অভিমত। মানবমন অতি বিশিষ্ট এই দিক দিয়ে যে, একটি সমস্যা নিয়ে কাজ করার সময়ে মানুষ তার সমাধানের সমস্ত সম্ভাব্য প্রকারভেদগুলি বিবেচনা করে না, শুরু থেকেই কতকগুলিকে বাদ দেয় আপনা থেকেই। জ্ঞাতের সঙ্গে অজ্ঞাতকে সংশ্লিষ্ট করার এই সামর্থ্য প্রায়শই সাধিত হয় স্বজ্ঞামূলকভাবে, কিন্তু তা অনেকখানি নির্ভর করে মানুষের অভিজ্ঞতার উপরে, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে মিলিত, সংযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট করার সামর্থ্যের উপরে।

স্বজ্ঞা সম্বন্ধে যেটা কৌতূহলোদ্দীপক, তা এই যে এই ধরনের জ্ঞান নির্ভর করে সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়াকালে বেছে নেওয়া সম্ভাব্য অন্তর্বস্তু আর প্রামাণ্য বলে গ্রহণ-

করা অন্য জ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্রের উপরে। 'রহস্যোদ্ঘাটন' বা 'অন্তর্দৃষ্টি' স্পষ্টতই ঘটে তখন, যখন একটি গবেষণা প্রক্রিয়ার সমস্ত উপাদান একত্র মিলে এমন একটি যোগসূত্র রচনা করে, যা আগে জ্ঞাত ছিল না, এবং এইভাবে উপস্থিত করে এক নতুন, স্পষ্টভাবে সম্পূর্ণ চিত্র। এই প্রক্রিয়ার অনন্য চরিত্রটি প্রকাশ পায় এই ঘটনায় যে সমস্যাটির সমাধান, নতুন জ্ঞান, অনুসন্ধানকারীর দ্বারা অর্জিত হয় যুক্তিসংগত ভাষায় তার যাথার্থ্য প্রমাণের উপায়গুলি লাভ করার আগেই। অধিকন্তু, জ্ঞানের বিদ্যমান, প্রতিষ্ঠিত রীতিপ্রণালী থেকে এই জ্ঞান আসে না, বরং কখনও কখনও তার বিরোধিতাও করে। একটি সমস্যার সমাধান, একটি সমস্যাকীর্ণ পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর পথ, দেখা দেয় ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা ও যুক্তিসংগত চিন্তার এক সংশ্লেষণ, এক মিশ্রণের ভিত্তিতে সাধিত একটা 'লাফ' হিসেবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের অসামান্য ঐতিহাসিক লুই ভিক্তর দ্য ব্রয়েল লিখেছেন: 'নীতি ও পদ্ধতিসমূহে যা সারগতভাবেই যুক্তিসহ, সেই বিজ্ঞান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজয়গুলি অর্জন করতে পারে মনের বিপজ্জনক ও অপ্রত্যাশিত লাফগুলিরই সাহায্যে, যখন যুক্তিসংগত চিন্তনের গুরুভার বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে, কল্পনা, স্বজ্ঞা ও মর্মভেদের গুণের মতো সামর্থ্যগুলি কাজ করে।'*

---

* Louis de Broglie, *Sur les sentiers de la science*, Editions Albin Michel, Paris, 1960, p. 354.

স্বজ্ঞা হল মানুষের অ-পর্যাপ্তভাবে অধীত কিন্তু প্রশ্নাতীতভাবে যুক্তিসহ সামর্থ্যগুলির একটি অংশ। এখানে আসল বিষয়টা এই যে যুক্তিসংগত গতির প্রক্রিয়াটি এখানে সংকুচিত, যুক্তিবুদ্ধি কাজ করে যেন 'লীনভাবে', এবং তার অনেকগুলি পর্যায় অনুপস্থিত।

প্রায়শই, স্বজ্ঞা আত্মপ্রকাশ করে এক অ-চেতন ক্রিয়া হিসেবে, কেননা চিন্তনের সঙ্গে জড়িত জটিল কর্তব্যকর্মগুলি সমাধা করার প্রক্রিয়াটি চলে যেন গোপনভাবে এবং একমাত্র চূড়ান্ত ফলটিই মনে গেঁথে থাকে। অথচ, স্বজ্ঞা চূড়ান্ত ফলটিকে চৈতন্যের মধ্যে শুধু 'প্রবর্তিতই' করে না; তার ক্রিয়া আরও অনেক গভীর ও বিচিত্রগামী — পদার্থসমূহের গুণ-ধর্ম ও সম্পর্কগুলি আত্মপ্রকাশ করার আগেই সেগুলির তাৎপর্য স্পষ্ট করে তোলার এক বিশেষ গুণ তার আছে। সুতরাং একটি সৃষ্টিশীল ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হল ইতিমধ্যে প্রাপ্ত সমাধানটি যখন প্রমাণিত ও প্রতিপাদিত হচ্ছে তখনই প্রক্রিয়াটির 'যৌক্তিকীকরণ'।

তাই, অযৌক্তিকের রূপে নিজেকে উপস্থিত করলেও, স্বজ্ঞা হল মানুষের চিন্তনে একটি মুহূর্ত মাত্র। ভাব ও স্বজ্ঞা হল মানবমনের দুটি গুণ-ধর্ম, যা পরস্পরকে পরিহার করে না, বরং সর্বদা পরস্পরকে দ্বান্দ্বিকভাবে পরিপূরণ করে।

কল্পনা করা মানে রূপান্তরিত করা

অবধারণায় সৃষ্টিশীলতার বহিঃপ্রকাশের আরও একটি দিক বিবেচনা করা যাক, যথা, **কল্পনা**। বস্তু ও

ব্যাপারসমূহ কল্পনা করার সামর্থ্য মানুষের মধ্যে সহজাত; দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ, বা সৃষ্টিশীলতা কোনোটিই একে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। বহু কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিক তা বলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ্র্যান্সিস বেকন লিখেছেন যে সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়াসমূহের একটি অঙ্গ হিসেবে কল্পনার রয়েছে বস্তুসমূহের সব ধরনের অসম্ভবতম মিলন পুনঃসৃষ্টি করার ও চিন্তা করার অথবা প্রকৃতপক্ষে অবিচ্ছেদ্য পদার্থসমূহকে পৃথক করার গুণ। আলবার্ট আইনস্টাইন এই মত পোষণ করতেন যে 'কল্পনা জ্ঞানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা জ্ঞান সীমিত, পক্ষান্তরে কল্পনা বেষ্টন করে সমগ্র পৃথিবীকে, উদ্দীপিত করে প্রগতিকে, জন্ম দেয় ক্রমবিকাশের। যথাযথভাবে বললে, তা হল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এক বাস্তব বিষয়।'* লেনিনও আমাদের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করে লিখেছেন: 'এই গুণটি অত্যন্ত মূল্যবান; এটা চিন্তা করা ভুল যে একমাত্র কবিদেরই কল্পনাশক্তি প্রয়োজন।... তা প্রয়োজন এমন কি গণিতশাস্ত্রেও; কল্পনা ছাড়া অন্তরকলন ও সমাকলন আবিষ্কার করা অসম্ভব হত।'**

* Albert Einstein, *Cosmic Religion,* Covici Friede Publishers, New York, 1931, p. 97.

** V. I. Lenin, *Eleventh Congress of R.C.P.(B.), March 27—April 2, 1922. Closing Speech of the Political Report of the Central Committee of the R.C.P.(B.), March 28,* Collected Works, Vol. 33, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 318.

কল্পনা তা হলে কী?

তা হল মানুষের একটি আগেকার অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করার এবং বিদ্যমানকে অনুপস্থিতের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন নতুন ভাব ও প্রতিরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা। কল্পনা পৃথিবীকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। তার ভিত্তি হল সামাজিক কর্মপ্রয়োগ, আর সংবেদন ও ব্যবহারিক জীবন তার মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করে।

কল্পনা হল অবধারণায় ইন্দ্রিয়গত ও যুক্তিসহকে যুক্ত করার অন্যতম উপায়। তা হল দুটির এক ধরনের মিশ্রণ, যা ইন্দ্রিয়গত তা হল সেই ভিত্তি বা বস্তু-উপকরণ যা দিয়ে প্রতিরূপগুলি গঠিত হয়, আর চিন্তন এই প্রক্রিয়ায় পালন করে প্রধান ভূমিকা, বলা যেতে পারে তার কর্মসূচি বর্ণনা করে দেয়। কল্পিত পদার্থ ও ব্যাপারসমূহ নতুন ভাবধারণা গঠনে অংশগ্রহণ করে। সংবেদনগুলিরও আবার চিন্তনের উপরে এক অভিঘাত থাকে, তা নতুন নতুন প্রতিরূপ তৈরি করে।

কল্পনার অনুসন্ধান-আবিষ্কারমূলক নিহিত ক্ষমতা তার সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়ার মধ্যেও প্রকাশ পায়, যে ক্রিয়া বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের ধারাবাহিতা যোগায়। অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করে আমরা আমাদের কল্পনায় অতীতকে 'পুনঃসৃষ্টি' করতে পারি এবং সেই অতীত কালের মধ্য দিয়ে নতুন করে আবার যেতে পারি। তাই আমরা চিরায়ত রচনাগুলির এক আধুনিক ভাষ্যের কথা বলতে পারি এবং চলতি ঘটনা ও ব্যাপারগুলির সঙ্গে ইতিহাসে

তার সদৃশগুলিকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে পারি। কল্পনায় ভর দিয়ে আমরা অতীতকে 'চিন্তা করে জাগিয়ে তুলতে' ও তাকে বর্তমানে নিয়ে আসতে পারি, যেন আরেকবার সেই অতীতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। জেরগুলির (নিদর্শনগুলির) ভিত্তিতে, সব ধরনের ঐতিহাসিক, নৃজাতিগত, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি স্মারক, ঘটনা ও তথ্যগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে অতীতকে পুনঃসৃষ্টি করতে কল্পনা আমাদের সক্ষম করে তোলে।

বর্তমানের মধ্যে অতীতের প্রবর্তন সাধিত হতে পারে শুধু কল্পনায়, ভাবাবেগে। মানুষ নিজেকে মনে করে এক ভিন্ন যুগে রয়েছে বলে, যেন আবার ফিরে আসে সেখানে যা ইতিমধ্যেই বিগত, এবং 'পুনঃসৃষ্টি' করে সেটাকে, যা সে প্রত্যক্ষ করে নি। অতীতে প্রত্যাবর্তন (অতীত-দর্শন) নির্দিষ্ট একজন মানুষের জীবন, নির্দিষ্ট একটা ঘটনা বা তথ্যের সঙ্গে যুক্ত সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমি সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কল্পনা সেই পটভূমিকে পরিবর্তিত, রূপান্তরিত করে এবং, তার ফলে, সামাজিক কাল আমাদের সামনে উপস্থিত হয় বাস্তব হিসেবে।

কিন্তু, কল্পনা শুধু অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে যুক্ত করতেই সাহায্য করে না। বিকাশমূলক একটি ধারা হিসেবে ভবিষ্যৎকে দেখতেও তা সাহায্য করে, কেননা ভবিষ্যৎ হল লক্ষ্য ও ক্রিয়াকলাপের এক প্রতিরূপ, সত্তার এক ভাবগত পূর্ব-প্রত্যাশা, আসন্ন ক্রিয়াগুলির রূপরেখা। মানবজীবনের অর্থ খুঁজে

পাওয়া যায় ভবিষ্যতের মধ্যে তার অভিক্ষেপে। কিন্তু সময় সম্বন্ধে উপলব্ধির মধ্যে কল্পনা তার নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আসে: তা 'সংকুচিত' হয়ে একটি মুহূর্ত হতে পারে; অথবা, উল্টোভাবে, তা মন্থরগতি হয়ে গোটা একটা 'যুগ' ধরে চলতে পারে। বাস্তবে যার কোনো প্রত্যক্ষ উপমা নেই এমন সমস্ত সংযুক্তি ও সম্পর্কের মধ্যে পদার্থসমূহকে স্থাপন করে, কল্পনা সময় সম্বন্ধে উপলব্ধিতেও বিভ্রম বা অবাস্তবের উপাদানসমূহ নিয়ে আসতে পারে।

কল্পনা সব ধরনের মানবিক ক্রিয়াকলাপের মর্মে প্রবেশ করে এবং সম্পন্ন করে বিভিন্ন ক্রিয়া, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তার অবধারণাগত ক্রিয়া এবং নতুনকে প্রকাশ করতে মানুষকে যা সাহায্য করে। শেষোক্তটি প্রথমোক্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; এবং পূর্ব-প্রত্যাশার পক্ষে, কর্মের এক ভাবগত পরিকল্পনার মডেল নির্মাণের পক্ষে যা অপরিহার্য সেই সৃষ্টিশীল অন্বেষণে এই উভয় ক্রিয়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বাভাসমূলক ক্রিয়াও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কল্পনার সাহায্যেই একটা ভাব বিদ্যমানের গণ্ডি ভাঙে, জ্ঞানের বাধাগুলি অতিক্রম করে এবং অজ্ঞাতের দিকে হাত বাড়ায়। অবধারণাগত কানাগলি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে কল্পনা অবধারণার অধিকতর প্রগতিতে উৎসাহ যোগায়। তা নান্দনিক ক্রিয়াও সম্পন্ন করে, কেননা সৃষ্টিশীলতার প্রক্রিয়ার জন্য দরকার হয় চিত্তবিনোদন, অনুপ্রেরণা ও নান্দনিক আনন্দ। কল্পনা নির্দিষ্ট একটা নিয়ন্ত্রণমূলক ক্রিয়াও

সম্পন্ন করে: ক্রিয়াকলাপকে সংশোধন করে তা বাস্তবের এক সত্য প্রতিফলনকে সহজতর করে।

স্বাভাবিকের মধ্যে অস্বাভাবিক

অবধারণার সঙ্গে জড়িত প্রক্রিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে তত্ত্বসমূহ সূত্রবদ্ধকরণে সহায়ক **প্রকল্পগুলি** — চিন্তা-উত্থাপন বা বৈজ্ঞানিক অনুমিতিগুলি — যে ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা দরকার। বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে আন্দাজ থেকে। প্রকল্প অনন্য এই দিক দিয়ে যে তা অনুমানমূলক ও সম্ভাব্য চরিত্রের। সামগ্রিকভাবে জ্ঞানের ক্রমবিকাশের মতো, একটি প্রকল্প গঠিত হয় মানুষের প্রয়োজন ও লক্ষ্যের জবাবে।

অবধারণায় প্রকল্পগুলি কী ভূমিকা পালন করে? গবেষণার লক্ষ্যগুলি কিছুটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, প্রস্তাবিত ভাবধারণাগুলির সাহায্যে পুরনো ও নতুন জ্ঞানকে সংশ্লেষিত করার জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রকল্প উত্থাপন করেন। যে বাস্তব তথ্যগুলি প্রকল্পটির যথার্থ্য প্রমাণে সাহায্য করে সেই তথ্যগুলির সঙ্গে প্রকল্পটি যত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে, তার অবধারণামূলক ভূমিকা তত বেশি হয়। একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের কাজ হল, পূর্বে প্রতিপন্ন উপাত্তগুলির যথাসম্ভব বিরোধিতা না করে, সর্বপ্রথমে, সমগ্র তথ্যরাজি, নির্দিষ্ট ব্যাপারগুলির সামগ্রিকতাকে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু, এরূপ এক বিরোধ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তা হলে পূর্বে প্রতিপন্ন উপাত্তগুলিকে অ-পর্যাপ্তভাবে

প্রামাণিক হিসেবে প্রতিপন্ন বলে বিবেচনা করার যথেষ্ট কারণ প্রকল্পটির রচয়িতার থাকা উচিত।

একটি প্রকল্প যেভাবে নির্মিত হয় সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তার সরলতম প্রকারভেদটি নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের উপরে: সংগৃহীত বস্তু-উপকরণের সারসংক্ষেপকরণের সঙ্গে একত্রে, তা ডারউইনকে তাঁর ক্রমবিকাশ বিষয়ক প্রকল্পটি উপস্থিত করতে সাহায্য করেছিল। একটি প্রকল্পে এসে পৌঁছনোর আরেকটি পথ আছে উপমার মধ্য দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাইবারনেটিকসের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা জীবজগৎ সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানকে প্রযুক্তিবিদ্যায় স্থানান্তরিত করতে চেষ্টা করেন; এই ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ বিজ্ঞান — বায়োনিকস — গড়ে উঠেছে শাখা হিসেবে। পশুপাখির সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে বহু যন্ত্র: পাখির ডানা মানুষকে বিমান সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে, শুশুকের শরীর সাবমেরিনের আকৃতি গঠনে সাহায্য করেছে, ইত্যাদি। সাদৃশ্য টেনে মানুষ স্বাভাবিকের মধ্যে অস্বাভাবিককে দেখতে পারে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, দুটো ঝোপের মধ্যে ঝুলন্ত একটা মাকড়সার জালের মধ্যে সে ঝুলন্ত সেতুর রেখাগুলি লক্ষ করতে পারে; দ্বিপুটক জীব মল্যাস্ক জাহাজের কাঠের তৈরি অংশে যে সুড়ঙ্গ খোঁড়ে, তাই দেখে মানুষ বেলনাকার এক সুড়ঙ্গ খোঁড়ার শিল্ড উদ্ভাবন করেছে, সেটির গতি মল্যাস্কের মতো।

একটি প্রকল্পের সঠিকতা, কিংবা সেটা যে সত্য হতেই হবে সেই ঘটনাটা, যাচাই করে ব্যবহারিক

ক্রিয়াকলাপে, আর তার যুক্তিসংগত প্রমাণ থাকে বিদ্যমান জ্ঞানের সঙ্গে তাতে অনুস্যূত ভাবধারণাগুলির মিলের মধ্যে। জার্মান ঐতিহাসিক হাইনরিখ শ্লিয়েমান প্রত্যয়শীল ছিলেন যে হোমারের 'ইলিয়াড' বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে রচিত, ট্রয়ের যুদ্ধ সত্যিই হয়েছিল, এবং ট্রয় নগরের সন্ধান করা উচিত। তাঁর নির্দেশিত পাহাড়গুলিতে খননকার্য চালানোর পর তাঁর প্রকল্পের সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছিল — প্রাচীন ট্রয় সত্যিই আবিষ্কৃত হয়েছিল। এইভাবে, প্রমাণ ও যাচাই একটি প্রকল্পকে পরিণত করে গুণগতভাবে নতুন এক জ্ঞানে, এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে, যা জ্ঞানের শিখরদেশ, সর্বোচ্চ রূপ, অর্থাৎ, সারগত সম্পর্ক, বা বাস্তবের নিয়মসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান।

একটি প্রকল্পকে অবশ্যই নীতিগতভাবে যাচাইসাপেক্ষ হতে হবে, যদিও তা তৎক্ষণাৎ যাচাই করা অসম্ভব হতে পারে। যাচাইয়ের অসাধ্য প্রকল্পগুলি সাধারণত বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে। একটি প্রকল্প নীতিগতভাবে যাচাই হতে পারে এই বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে যে মানুষ পৃথিবীকে বুঝতে সক্ষম। এই অবধারণা ছাড়া, বিজ্ঞান অসম্ভব হত।

একটি প্রকল্প শুধু একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা ব্যাপারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেই চলবে না, প্রকৃতই বিজ্ঞানসম্মত একটি প্রকল্পের উচিত অন্যান্য ব্যাপারের সমগ্র পরিধিকেও গণ্য করা, তাই তা সম্প্রসারিত ও বিকশিত হতে সক্ষম।

একটি প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল

তার বুনিয়াদি স্বচ্ছতা, যদৃচ্ছ অনুমিতির, অযৌক্তিক বিধিনিষেধ ও শর্ত-সংশয়ের অনুপস্থিতি। এই বুনিয়াদি সরলতা জটিল প্রক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যার বিষয়মুখ চরিত্রের ফল। সেই প্রক্রিয়াগুলি প্রকৃতপক্ষে এমন কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত যা বিষয়গতভাবে অভিন্ন ও তাই সামান্যীকরণসাধ্য। এরূপ সরলতাকে বিজ্ঞানীরা দেখেন নান্দনিক ত্রুটিহীনতা হিসেবে, একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্পের সৌন্দর্য হিসেবে এবং তত্ত্বগত চিন্তন যাতে যথাসম্ভব বিস্তৃত পরিধির ব্যাপারসমূহকে যথাসম্ভব সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে, সেই যুক্তিসহ প্রয়োজনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে।

সত্যের অন্বেষণে

তাই, জ্ঞান মানুষের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সহজাতভাবে যুক্ত। অবধারণার লক্ষ্য হল **সত্য** অর্জন, এবং তার ভিত্তিতে, মানবজাতির সামনের নতুন কর্তব্যকর্মগুলি সম্পাদন।

সত্য কী? কিংবদন্তিতে আছে যে পণ্টিয়াস পাইলেট যীশু খ্রীষ্টকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। জীবনের অর্থ সম্বন্ধে উচ্চতর সত্য জানেন বলে দাবি করে গোলযোগ বাধানোর অভিযোগে খ্রীষ্টকে বন্দী করা হয়েছিল। এই প্রশ্নটি করে, পাইলেট সাধারণভাবে সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও তা অর্জনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

সত্যের ধারণাটি বহুশব্দার্থপূর্ণ এবং প্রায়শই

ব্যবহৃত হয় তার বিভিন্ন অর্থে। লোকে একজন সত্যকার বন্ধু, সত্যকার সৌন্দর্য, সত্যকার কবি প্রভৃতির কথা বলে। এই সমস্ত কথায় যার উপরে সর্বদা জোরটা দেওয়া হয়, তা হল এই ব্যাপারটির, জিনিসটির বা ক্রিয়াটির তাৎপর্য। অথচ সবগুলিই এসেছে 'সত্য' ধারণাটি থেকে। দর্শনশাস্ত্রগত অর্থে, ধারণাটি প্রকাশ করে জ্ঞানের অন্তর্বস্তু ও বাহ্যিক জগতের মধ্যেকার নির্দিষ্ট এক সম্পর্ককে। 'সত্য' ধারণাটি চিন্তনে বাস্তবের এক সঠিক, প্রামাণিক প্রতিফলন বোঝানোর কাজে লাগে। সত্য বস্তুনিচয়ের নিজেদের গুণ-ধর্ম নয়, বরং মানুষের মনে সেগুলির প্রামাণিক প্রতিফলন। প্রাচীন দার্শনিকরা সত্যকে জড়িত করেছিলেন সঠিক জ্ঞানের সঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে যার মিল আছে: এর বিপরীত হল ভ্রান্তি, বা ভ্রান্ত জ্ঞান, যা বাস্তবকে বিকৃত করে। আরিস্ততল তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন: 'একজন মানুষ সতভাবে চিন্তা করে তখনই, যদি সে চিন্তা করে যে, যা পৃথকীকৃত তা পৃথকীকৃত এবং যা ঐক্যবদ্ধ তা ঐক্যবদ্ধ...' অপিচ: 'এখন আমরা তোমায় সাদা বলে সত্যভাবে চিন্তা করছি বলেই যে তুমি সাদা তা নয়, বরং তুমি সাদা বলেই আমরা সত্যভাবে বলছি যে তুমি সাদা।'* আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ক্ষেত্রে সত্য জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যনির্ণয় করা হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য হিসেবে। কিন্তু সত্য সম্বন্ধে আরিস্ততলের

---

* *Aristotle's Metaphysics,* Indiana University Press, Bloomington and London, 1966, p. 158.

বোধ সঠিক হলেও এবং তা সত্য অনুধাবনের দিকে বস্তুবাদসম্মতভাবে চালিত হলেও, তাঁর সংজ্ঞার্থটি অসম্পূর্ণ; তা এত ব্যাপক ও অস্পষ্ট যে ভাববাদীরা এমন কি অজ্ঞাবাদীরাও 'সামঞ্জস্য' ও 'বাস্তব' সংক্রান্ত ধারণাকে তাঁদের নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে তার সঙ্গে একমত হতে পারেন।

একজন বিজ্ঞানী যে সাধারণ দার্শনিক অবস্থান গ্রহণ করেন, তার সঙ্গে এবং যেভাবে তিনি দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের উত্তর দেন, তার সঙ্গে সত্যের প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সত্যের প্রশ্নে বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরুদ্ধ প্রকৃতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত: বিজ্ঞানের কাছে সত্যের অন্বেষণ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির অন্যতম, আর ধর্ম শরণাপন্ন হয় বিশ্বাসের, কখনও কখনও রীতিমত খোলাখুলিভাবেই তাকে সত্যের বিপ্রতীপে স্থাপন করে।

বস্তুবাদ ও ভাববাদের বিরুদ্ধ প্রকৃতিও এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট। সব ধরনের ভাববাদ ও অজ্ঞাবাদই যে সত্যকে স্বীকার করতে নারাজ হয় তা নয়, কিন্তু সেগুলি সত্যকে ব্যাখ্যা করে অত্যন্ত বিষয়ীগতভাবে, পারিপার্শ্বিক জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব এবং মানুষের তা সঠিকভাবে অবধারণা করার ও মনে প্রতিফলিত করার সামর্থ্যের স্বীকৃতির সঙ্গে তাকে জড়িত করে না। কিছু কিছু ভাববাদী সত্যকে দেখেন লোকের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তির ফল হিসেবে। সত্যকে যাঁরা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রথম ছিলেন ফরাসী গণিতজ্ঞ জুল আঁরি পোয়াঁকারে। তাঁর মতে, বৈজ্ঞানিক

তত্ত্বগুলির (পাটীগণিতকে বাদ দিয়ে) বুনিয়াদি শিক্ষাগুলি সত্য নয়, চলিত রীতি অনুসরণ; একমাত্র যে পরম দাবিটি সেগুলিকে মেনে চলতে হয়, তা হল সেগুলির অ-বিরোধী চরিত্র। সত্যকে সাধারণভাবে তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞান বলে ব্যাখ্যা করা থেকেও একই সিদ্ধান্ত আসে। বস্তুতপক্ষে, ভ্রান্ত জ্ঞানও সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে — দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাপ ও ঈথার-এর তত্ত্ব, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক তত্ত্ব (জিওপলিটিকস বা ভৌগোলিক সংস্থান-প্রভাবিত দেশবিশেষের রাজনীতিবিদ্যা, নয়া-ম্যালথুসীয়বাদ, সব ধরনের বর্ণবাদী মতবাদ, ইত্যাদি)। কখনও কখনও যা উপযোগী তাকে সত্য বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু, আমরা আগেই দেখিয়েছি যে যা উপযোগী তার সবগুলিকেই সত্য বলে আদৌ গণ্য করা যায় না।

সত্যান্বেষীরা প্রবঞ্চিত হতে পারে

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমরা এসে পৌঁছতে পারি সেই প্রশ্নটির সঠিক উত্তরে, যে প্রশ্নটি আমরা করেছিলাম। সত্যের বৈশিষ্ট্য হল আমাদের জ্ঞান আর বিষয়গতভাবে ও মানুষের চৈতন্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে বিদ্যমান বাস্তবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য। সুতরাং, সত্য বিষয়গত, বিষয়গত বাস্তবতার প্রতিফলন হিসেবে, মানবমনের ফল হিসেবে নয়। সুসংগত, বৈজ্ঞানিক-দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সত্যের ধারণাটিকে সুনির্দিষ্ট করে এই কথা বলে যে তা বিষয়গত। লেনিন বিষয়গত

সত্যকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এমন জ্ঞান হিসেবে, যার অন্তর্বস্তু একজন ব্যক্তিমানুষ বা মানবজাতি, কারও উপরেই নির্ভর করে না।* প্রশ্ন করা যেতে পারে: মানুষ যদি সত্যকে অনুধাবন করতে পারে, তা হলে তা মানুষ-নিরপেক্ষ হয় কী করে? সত্য বাহ্যিক জগতের নয়, তা আত্মপ্রকাশ করে মানুষের ক্রিয়াকলাপের একটি ফল হিসেবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক পুঁজিবাদী সমাজে শোষণ একটা বিষয়গত বাস্তব। অথচ মার্কসের আগে তার সারমর্ম লোকে দেখতে পায় নি, তাই, পুঁজিপতিরা কেন ধনবান আর শ্রমিকরা কেন দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করে এই বিষয়ে তাদের অভিমত ভ্রান্ত ছিল। পুঁজিবাদী শোষণের সারমর্ম সম্বন্ধে মার্কসের আবিষ্কার আমাদের জ্ঞানকে বিষয়গত বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছিল, তাই সেটা হয়েছিল বিষয়গত সত্য।

'বিষয়গত সত্যের' ধারণাটির মধ্যেই রয়েছে বিষয়গত পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান, অর্থাৎ, আমাদের ভাবধারণা ও আমাদের চিন্তা আমাদের সঠিক, সত্য (বিষয়গত পৃথিবীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান যোগায়। কিন্তু বিষয়গত সত্য অর্জিত হয় মানুষের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ-ভিত্তিক অবধারণার প্রক্রিয়ায়। সুতরাং, এ কথা বলাটা যথার্থ হবে না যে সত্য এমন একটা জিনিস যা থাকে মানুষের বাইরে, তার চৈতন্যের বাইরে। সত্য

---

* V. I. Lenin, *Materialism and Empirio-Criticism*, Collected Works, Vol. 14, p. 122.

আর মানুষের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেকার সম্পর্ক তার গতিশীল চরিত্র প্রকাশ করে। সত্য অর্জন এক কষ্টকর প্রক্রিয়া, কারণ তা এক ধাপে সূত্রবদ্ধ হয় না, হয় ক্রমে ক্রমে। সুতরাং যে কোনো সত্যই সীমিত ও আপেক্ষিক। আমাদের অধ্যয়নের যেটা বিষয়বস্তু, আমরা তার কতখানি কাছাকাছি যেতে পারি? এটা হল অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক সত্যের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্র।

আমাদের চারপাশের পৃথিবী সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়, তা চিরন্তন ও অসীম। সুতরাং পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ঐতিহাসিক বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে, সীমিত ও আপেক্ষিক। **আপেক্ষিক সত্য** হল আমাদের জ্ঞান ও বাস্তবের মধ্যে এক অসম্পূর্ণ, আংশিক ও প্রায়-যথাযথ সামঞ্জস্য। আপেক্ষিক সত্যের অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে পরে আরও সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ করা যায়। প্রাচীন চিন্তকরা কখনও কখনও শুধু বাহ্যিক দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করেই বিভিন্ন ব্যাপার ও প্রক্রিয়ার এক জটিল আভ্যন্তরিক গঠনবিন্যাস সংক্রান্ত অবিশ্বাস্য ধারণা উপস্থিত করতেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞান ছিল বিজ্ঞানের যাত্রা-বিন্দু মাত্র। কর্মপ্রয়োগ ও বিজ্ঞান উভয়েরই অগ্রগতি ঘটায়, লোকে ক্রমে ক্রমে সত্যকে জানতে পারছে। ডেমোক্রিটাস শুধু অনুমান করেছিলেন যে পৃথিবী পরমাণু দিয়ে গঠিত, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানী **নিলস বোর** পরমাণুর গঠনকাঠামো আবিষ্কার করেছিলেন।

বিষয়গত সত্য শুধু আপেক্ষিক, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সীমিত ও অসম্পূর্ণই নয়, একই সঙ্গে তা

অনাপেক্ষিকও। অনাপেক্ষিক সত্য হল সম্পূর্ণ, সামগ্রিক ও যথার্থ জ্ঞান। সত্যের অনাপেক্ষিক চরিত্র — যা তার বিষয়মুখতার সঙ্গে সম্পর্কিত — দেখা যায় এই ঘটনায় যে বৈজ্ঞানিক বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে সুপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞাগুলি পরে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে, খণ্ডন করা যায় না। বিষয়গত সত্যে অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিকের ঐক্য রয়েছে এই ঘটনার মধ্যে যে জ্ঞানেরই চারিত্র্যনির্ণয় করা হয় যুগপৎ অসম্পূর্ণতা ও বিষয়মুখতা দিয়ে। অনাপেক্ষিক সত্যকে অসীম পৃথিবী সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞান বলেও বর্ণনা করা যেতে পারে। মানবজাতি অবশ্য তার ক্রমবিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে এরূপ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না: তা অর্জনসাধ্য শুধু মানুষের অনন্ত বিকাশের প্রক্রিয়ায়, তার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে ও অবধারণার প্রক্রিয়ার। সুতরাং জ্ঞানের ক্রমবিকাশের নিয়মটি হল আপেক্ষিক থেকে অনাপেক্ষিকে তার অগ্রগতি। অনাপেক্ষিক সত্য অসংখ্য বহুবিধ আপেক্ষিক সত্য দিয়ে গঠিত।

মতান্ধতার বৈশিষ্ট্য হল সত্য সম্বন্ধে একটা একপক্ষীয় মনোভাব। মতান্ধরা সত্যকে অনাপেক্ষিক বলে গণ্য করে এবং তার আপেক্ষিক চরিত্র উপেক্ষা করে। অবশ্য, কতকগুলি চিরন্তন সত্যও আছে, এবং এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সাধারণত সেগুলি হল নির্দিষ্ট কতকগুলি তথ্য বা পরিস্থিতি, যেমন: ওয়াকায়ামা জাপানের একটি শহর, হরিয়ানা ভারতের একটি রাজ্য, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মৃত্যু হয় ১৮২১ সালে,

কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে এই ধরনের সত্যে পর্যবসিত করা যায় না; এগুলি হল মামুলি তথ্য, অর্থাৎ মৌলিকতাহীন। বিজ্ঞান কোনোমতেই 'চিরন্তন সত্যগুলির' একটা যোগফল নয়।

মতান্ধতা থেকে পৃথকরূপে, আপেক্ষিকতাবাদ ধ্যাতিষঙ্গবাদ আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিক চরিত্রকে অতিরঞ্জিত করে। যেকোনো সত্যের আপেক্ষিক চরিত্র প্রাচীন দার্শনিকরাই লক্ষ করেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন যে প্রত্যেক মানুষের আছে তার নিজস্ব সত্য। সত্য আপেক্ষিক এই কথা বলার সময়ে আপেক্ষিকতাবাদ অগ্রসর হয় প্রকৃত পরিস্থিতি থেকে: পৃথিবীতে সব কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু, বাস্তব ব্যাপারসমূহ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। পরিবর্তনীয়তা ও স্থিতিশীলতার ঐক্য সম্বন্ধে বোধের অভাবের ফলে দেখা দেয় আপেক্ষিকতাবাদের চরম রূপগুলি। সব কিছুই যদি গতিময় ও পরিবর্তন-সাপেক্ষ হয়, তা হলে, আমরা বাস করি এমন পৃথিবীতে যেখানে কোনো অপরিবর্তনীয় সত্য থাকতে পারে না, তাই আমাদের জ্ঞান নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ প্রথাগত।

এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা কী চিন্তা করেন? নিলস বোর পদার্থবিদ্যায় সামঞ্জস্যের নিম্নলিখিত নীতির কথা বলেছিলেন; আগেকার যে সমস্ত তত্ত্ব ও নিয়ম কর্মপ্রয়োগে প্রতিপন্ন হয়েছে সেগুলি ভবিষ্যতেও জ্ঞানের সেই ক্ষেত্রটির পক্ষে সত্য থাকে, যে ক্ষেত্রটিতে সেগুলি সূত্রায়িত হয়েছে। নতুন তত্ত্বগুলির দ্বারা সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয় না, বিশেষ বিশেষ

ঘটনা হিসেবে সেই তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব গালিলিও ও নিউটনের ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার পথানুসরণ করেই এসেছিল। আইনস্টাইনের আগে, নিউটন-আবিষ্কৃত নিয়মগুলিকে বিশ্বজনীন বলে গণ্য করা হত, কিন্তু আমরা এখন জানি যে সেগুলির ক্রিয়া সীমাবদ্ধ। অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির অনেকগুলি স্বীকার্যকে — সমান্তরাল, স্থানের 'ঋজুরেখ' প্রকৃতি ইত্যাদি — বাতিল করে। কিন্তু ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে তা সমগ্রভাবে নাকচ করে না, এবং কিছু কিছু বুনিয়াদি ইউক্লিডীয় নীতি ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আরও একটি দৃষ্টান্ত: মার্কসবাদের প্রথম কর্মসূচিগত দলিল, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে' বলা হয়েছে যে মানুষের সমগ্র ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। পরে এঙ্গেলস এই কথাটির সঙ্গে একটি পাদটীকা দিয়েছিলেন, কেননা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রমাণ করেছিল যে একদা এক প্রাক-শ্রেণী সমাজও ছিল, যেখানে শ্রেণী সংগ্রাম অসম্ভব ছিল।

সত্যের তত্ত্বের জন্য দরকার হয় তার **মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রকৃতির** স্বীকৃতি, যাতে সর্বপ্রথমেই পূর্বানুমিত হল অবধারণার লক্ষ্যবস্তুটি যে অবস্থার অধীনে রয়েছে সেই সমস্ত অবস্থার এক যথাযথ বিবরণ নেওয়া, এবং তার বুনিয়াদি, সারগত গুণ-ধর্মগুলি, সম্পর্ক ও বিকাশ ধারাগুলি আলাদা করে বেছে নেওয়া। একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি: আমরা দাবি করতে পারি যে বৃষ্টি উপকারী, অথবা তা ক্ষতিকর। দুটি বক্তব্যের মধ্যে

কোনটি ঠিক? মূর্ত-নির্দিষ্ট অবস্থাগুলি গণ্য না করে প্রশ্নটির কোনো দিক দিয়ে মীমাংসা করা যায় না: বীজবপনের পর কিংবা চারা বড় হয়ে ওঠার সময়ে বৃষ্টি নিঃসন্দেহে উপকারী; কিন্তু সেই সঙ্গে, ফসল কাটার সময়ে বৃষ্টি ক্ষতিকর।

জটিল প্রশ্নগুলি মীমাংসা করার সময়ে সত্যের সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ের আগে সমাজতন্ত্র একসঙ্গে সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশে জয়ী হতে পারত; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের যুগে তা জয়যুক্ত হতে পেরেছিল একটিমাত্র, দুর্বলতম গ্রন্থিতে। যুদ্ধের বিষয়টি সম্পর্কেও একই কথা সত্য। রাজনৈতিক অন্তর্বস্তু-সাপেক্ষে যুদ্ধগুলি ন্যায়সংগত ও অন্যায়। মার্কসবাদ সেই সমস্ত যুদ্ধকে ন্যায়সংগত বলে মনে করে, যেগুলি জাতিসমূহ চালায় সামাজিক ও জাতীয় নিপীড়ন থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য, নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা কারর জন্য অথবা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য; এবং তা অন্যায় যুদ্ধ বলে মনে করে সেই সমস্ত যুদ্ধকে যে যুদ্ধ শোষক শ্রেণীগুলি চালায় নিপীড়িত শ্রেণী বা জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রাম দমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে, বিদেশের ভূখণ্ড দখল ও অন্যান্য জাতিকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

অকৃত্রিম সত্যকে মোহ থেকে আলাদা করে চেনা যায় কীভাবে? মার্কসবাদ আমাদের এই উত্তর দেয়: আমাদের জ্ঞানের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপন্ন হয় শুধু **কর্ম-প্রয়োগে**। একমাত্র ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপেই

আমরা অকৃত্রিম ও ভ্রান্ত জ্ঞানের মধ্যে একটা রেখা টানতে পারি। স্বভাবতই, আমাদের ক্রিয়াকলাপের ফলগুলি প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে আমাদের জ্ঞান আর যেটির দিকে আমাদের ক্রিয়াকলাপ চালিত সেই লক্ষ্যবস্তুটির মধ্যে সামঞ্জস্যের উপরে। আমাদের জ্ঞান যদি সত্য হয় এবং বাস্তবকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে, তা হলে আমাদের উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ সফল হবে এবং আমরা প্রয়োজনীয় ফলটি পাব। ভ্রান্ত ভাবধারণা একটা ভিন্ন ফল প্রসব করবে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিষয়গত নিয়মের বিরোধী বলে একটা perpetuum mobile উদ্ভাবন করা অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল।

সত্যের সন্ধান পাওয়াই যথেষ্ট নয়, তাকে রক্ষা করাও গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের ইতিহাস এমন বহু দৃষ্টান্তে পূর্ণ, যেখানে লোকে সত্য অর্জনের জন্য প্রচুর কষ্টভোগ করেছে, এমন কি মৃত্যুবরণ করেছে। ইতালীয় দার্শনিক জর্ডানো ব্রুনো এবং স্পেনীয় ঈশ্বরতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসক মিগেল সেরভেতুস সত্যের প্রতি ভালোবাসার জন্য ইনকুইজিশনের আদেশে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিলেন। ড্যানিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টিখো ব্রাগেও নিগৃহীত হয়েছিল।

সত্যের অন্বেষণে বিজ্ঞানীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছেন: ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গীরণ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে প্রবীণ প্লিনি মারা যান, এবং নিজের চালানো একটি নিরীক্ষাকর্মের সময়ে ফ্র্যান্সিস বেকন নিহত হন। প্রগতিশীল বিজ্ঞানীরা, রাজনৈতিক ও জনজীবনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, শান্তি ও ন্যায়বিচারের

প্রবক্তারা সকলেই জনগণের কাছে সত্যের আলো নিয়ে আসতে গিয়ে নিগৃহীত হয়েছেন: প্যাট্রিস লুমুম্বা, সালাভাদোর আলেন্দে, ও মার্টিন লুথার কিং সবাই এইভাবেই মারা গিয়েছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে মার্কস উদ্ধৃত করেছিলেন দান্তে আলিগিয়েরিকে:

> হেথা পড়ে থাক সকল অবিশ্বাস
> সকল ভীরুতা এখানে থাকুক মরে।*

যাঁরা সত্যের অন্বেষণ করেন ও সক্রিয়ভাবে তাকে রক্ষা করেন, এই পংক্তিগুলি তাঁদের সকলের কাছে একটা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে।

---

* Dante, *The Divine Comedy,* Illustrated Modern Library, Inc., 1944, p. 22. কার্ল মার্কস প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে' গ্রন্থে উদ্ধৃত, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৩, পৃঃ ১৬।

৫। দর্শন ও সামাজিক জীবন

হাজার হাজার সূত্র দিয়ে দর্শন সমাজের জীবনের বিচিত্রতম ব্যাপারগুলির সঙ্গে যুক্ত। তার আত্মপ্রকাশ, তার দুটি ধারার মধ্যে সংগ্রাম, মানুষের অবধারণামূলক ক্রিয়াকলাপ ও পৃথিবীতে ঘটমান সমস্ত পরিবর্তনের উৎস সম্বন্ধে অভিমতের পার্থক্য — এসব কিছুর মূলে নিহিত রয়েছে সামাজিক কারণগুলি। আবার তার দিক দিয়ে, দর্শনও রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির উপরে, ধর্মীয় আন্দোলন ও শিল্পকলাগত সৃষ্টিশীলতার উপরে, ব্যক্তিমানুষ ও সমগ্র যুগের উপরে এক অভিঘাত সৃষ্টি করে।

যে নীতি অনুযায়ী দর্শন ও সমাজের মধ্যে

মিথস্ক্রিয়া ঘটছে সেটি খ‍ুঁজে বার করার জন্য দর্শনের সামাজিক ক্রিয়াগ‍ুলির, সমাজে তার পালিত ভূমিকার সন্ধান করা, দার্শনিক চৈতন্যে সামাজিক বাস্তব যে স‍ুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় তা প্রকাশ করা, এবং সমাজের বিকাশের পর্যায়ের উপরে দার্শনিক সমস্যাগ‍ুলির ক্রমবিকাশের নির্ভরশীলতা প্রকাশ করা দরকার।

বিজ্ঞানসম্মত বলে গণ্য হতে হলে, দর্শনকে অবশ্যই সঠিকভাবে অতীত ও বর্তমান উভয়েরই ব্যাখ্যা করতে হবে অতীতে কিছ‍ু দার্শনিক এমন কি একেই দর্শনের একমাত্র ক্রিয়া বলে গণ্য করতেন। দ‍ৃষ্টান্তস্বর‍ূপ, হেগেল লিখেছিলেন যা একজন দার্শনিক ব‍ুঝতে পারে সেটাই যা ইতিপ‍ূর্বে ঘটেছে, যা অতীতের অন্তর্গত। দর্শন তার নীতিগ‍ুলি নিয়ে সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করেছে ঘটনাটি ইতিপ‍ূর্বেই ঘটে যাওয়ার পর।

আধ‍ুনিক ব‍ুর্জোয়া দার্শনিকরা দর্শনের ক্ষমতা ও উদ্দেশ্যের এই খর্বিত ভাষ্য পর্যন্ত মেনে নিতে ইচ্ছ‍ুক নন। বস্তুতই, যা আছে তার সঠিক ব্যাখ্যা করলে ভিতর থেকে প‍ুঁজিবাদী দ‍ুনিয়ার ভিত্তিকে যা ক্ষইয়ে দিচ্ছে সে অমীমাংসেয় দ্বন্দ্বগ‍ুলি উম্ঘাটিত হয়ে পড়বে: দর্শনের কাছে অন্যতম অতি গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ যে দাবি— বিজ্ঞানসম্মত হওয়া — তার সংঘাত বাধে ব‍ুর্জোয়া ভাবাদর্শবাদীদের শ্রেণী স্বার্থের সঙ্গে।

অবশ্য একটা বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের শ‍ুধ‍ু যেটা ইতিপ‍ূর্বে ঘটেছে তার ব্যাখ্যা করলেই চলবে না; তার

ভবিষ্যৎকে দূরদৃষ্টিতে দেখতেও সক্ষম হওয়া উচিত। প্রকৃতই বিজ্ঞানসম্মত এক দর্শনের সেটাও করতে সক্ষম হতে হবে। হেগেলের একজন শিষ্য দর্শনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর গুরুর মতবাদকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে: 'দর্শন হল পৃথিবীর যৌবনের নবপ্রভাতের আগমনী ঘোষণা-করা এক কুক্কুটশাবকের মতো।' যেহেতু নতুন পৃথিবী বা ভবিষ্যৎ সমাজ আত্মপ্রকাশ করতে পারে একমাত্র পুরনো পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপেরই উপরে, তাই শুধু সবচেয়ে প্রাগ্রসর শ্রেণীই সমাজের এক বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক তত্ত্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী।

সুতরাং, প্রকৃতই এক বিজ্ঞানসম্মত দর্শন, যা অতীতের এক সঠিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা আর ভবিষ্যতের এক পূর্বাভাসকে একত্রে মেলায়, তা একই সঙ্গে প্রকাশ করে প্রাগ্রসর, প্রগতিশীল সামাজিক বর্গগুলির স্বার্থকে, সর্বোপরি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থকে।

মার্কসবাদ তার শ্রেণীচরিত্র গোপন করতে চেষ্টা করে না, বরং 'বলা যায়, পক্ষভুক্তিকে অন্তর্গত করে, এবং ঘটনাবলীর যে কোনো মূল্যায়নে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর অবস্থান প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়।'* প্রলেতারিয়েত দর্শনকে দেখে তার তত্ত্বগত 'অস্ত্র' হিসেবে। তাই দর্শন হয়ে

---

* V. I. Lenin, *The Economic Content of Narodism and the Criticism of It in Mr. Struve's Book,* Collected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 401.

ওঠে সমাজের রূপান্তরের এক তত্ত্বগত বনিয়াদ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ঠিক এই ধরনেরই দর্শন। লেনিন লিখেছেন, 'মার্কসের দর্শন এক পরিপূর্ণ দার্শনিক বস্তুবাদ, যা মানবজাতিকে, ও বিশেষত শ্রমিক শ্রেণীকে জ্ঞানের শক্তিশালী হাতিয়ার যুগিয়েছে।'*

মার্কসবাদের আত্মপ্রকাশই দর্শন আর সামাজিক জীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করতে পারে। তা আবির্ভূত হয়েছিল বিশ্ব সভ্যতার রাজপথে এবং সমাজের সমগ্র পূর্ববর্তী ক্রমবিকাশ তার প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করেছিল। তা সূত্রায়িত হয়েছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, তত্ত্বগত ও বৈজ্ঞানিক অবস্থার ভিত্তিতে; **কার্ল মার্কস** ও **ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের** ব্যক্তিগত গুণাবলীও বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

যে যুগ মার্কসীয় দর্শনের জন্ম দিয়েছিল, সেটা কী ধরনের ছিল? মার্কসবাদ আকৃতি লাভ করেছিল ১৮৪০-এর দশকের মধ্যভাগে, যখন পুঁজিবাদ ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি এর মধ্যেই নেদারল্যান্ডস, ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে নাড়া দিয়ে গেছে। সেগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল, কিন্তু তখনও একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নয়। তার ঘোর শত্রু বুর্জোয়া শ্রেণীর

* V. I. Lenin, *The Three Sources and Three Component Parts of Marxism*, Collected *Works*, Vol. 19, p. 25.

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে লড়াই করেছিল বুর্জোয়াদের শত্রু সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে। সামন্ততন্ত্র বিলুপ্ত হওয়ার পর, পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত ও শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ার পর, বুর্জোয়া প্রগতির পরস্পরবিরোধী চরিত্র ক্রমেই বেশি করে প্রকট হয়ে উঠেছিল; তার অন্তঃসার ছিল এক প্রান্তে সম্পদের পুঞ্জীভবন, অপর প্রান্তে দারিদ্র্যের পুঞ্জীভবন। পুঁজিবাদ সেই সময়ে ছিল বর্ধিষ্ণু অবস্থায়, তবুও অতি-উৎপাদনজনিত সংকট দেখা দিতে শুরু করেছিল এবং বেকারি বেড়ে গিয়েছিল। ছোট চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর পংক্তিকে স্ফীত করেছিল। শ্রমিকদের ও শিশুসন্তান সহ তাদের পরিবারের সদস্যদের উপরে শোষণকে আইনের দ্বারা বিধিনিষিদ্ধ করা হয় নি। কিন্তু প্রলেতারিয়েত তো শুধু এক 'কষ্টভোগী' শ্রেণী নয়, তা এক 'সংগ্রামী' শ্রেণীও বটে। লেনিনের কথা অনুযায়ী, '...প্রলেতারিয়েতের মর্যাদাহানিকর অর্থনৈতিক অবস্থাই তাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে সামনের দিকে চালিত করে এবং তার চূড়ান্ত মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে তাকে বাধ্য করে'।* সংখ্যায় ও গুণগত দিক দিয়ে, উভয়তই প্রলেতারিয়েত বাড়ছিল এবং বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রলেতারিয়েতের সমর্থন নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক

---

* V. I. Lenin, *Frederick Engels,* Collected Works, Vol. 2, p. 22.

সংগ্রামে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা প্রলেতারিয়েতের নিজের পক্ষেও উপকারী হয়েছিল।

১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, প্রলেতারিয়েত এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে বলিষ্ঠ কর্ম-তৎপরতাগুলি ছিল ১৮৩১ ও ১৮৩৪ সালে ফ্রান্সে লিয়োঁ-র তাঁতীদের অভ্যুত্থান, ১৮৪৪ সালে জার্মানিতে সাইলেসিয়ার তাঁতীদের অভ্যুত্থান, এবং ১৮৩০-এর দশক ১৮৫০-এর দশকে ইংলণ্ডে চার্টিস্টদের অভ্যুত্থান। প্রলেতারিয়েত যতগুলি কর্ম-তৎপরতা চালিয়েছিল তার মধ্যে চার্টিজমই ছিল সর্বপ্রথম প্রকৃতই গণ ও রাজনৈতিকভাবে বিশিষ্ট কর্ম-তৎপরতা। লেনিন বলেছেন, তা ছিল মার্কসবাদের প্রস্তুতি, তার উনশেষ কথা। প্রথম শ্রমিক পার্টি গড়ে উঠেছিল সেই আন্দোলনের ভিতরে, সূত্রবদ্ধ হয়েছিল রাজনৈতিক দাবিদাওয়া।

মার্কসবাদ যে জার্মানিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেটা আপতিক ব্যাপার ছিল না। সেখানে, মার্কস ও এঙ্গেলসের মাতৃভূমিতে, শ্রেণী-বিরোধগুলি ছিল বিশেষভাবেই তীব্র; জার্মানি ছিল এক বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্বক্ষণে। প্রলেতারিয়েত ছিল রীতিমত সংখ্যাবহুল এবং ইতিমধ্যেই তা নিজস্ব শ্রেণীগত দাবিদাওয়া প্রকাশ করছিল। এমন অবস্থা গড়ে উঠছিল যা সমাসন্ন বুর্জোয়া বিপ্লব চলাকালে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের গতিবেগ সঞ্চয় করার পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠেছিল — পূর্ববর্তী বুর্জোয়া বিপ্লবগুলিতে এ রকম অবস্থা কখনও ছিল না। এই

সমস্ত বৈশিষ্ট্যই জার্মানিকে করে তুলেছিল মার্কসবাদের জন্মস্থান, **সমস্ত** ইউরোপীয় দেশে পুঁজিবাদ ও শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ তাকে প্রস্তুত করেছিল।

তাই, আমরা দেখলাম যে শ্রমিক শ্রেণী যে-সমস্ত দেশে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তার সব দেশেই বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু করেছিল, একটি দেশে নয়। কিন্তু, সংগ্রামের কোনো স্পষ্ট কর্মসূচি প্রলেতারিয়েতের ছিল না, এবং তার ব্যর্থতার এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এরূপ এক কর্মসূচির অনুপস্থিতি শ্রমিকদের সাংগঠনিক স্তরকে খর্ব করে রেখেছিল, এবং কখনও কখনও কর্ম-তৎপরতায় অংশগ্রাহীদের মধ্যে নীতিগত প্রশ্নে বহুবিধ মতও এর ফলে দেখা দিত। এক বৈপ্লবিক তত্ত্বের প্রয়োজনটা ছিল বিরাট। তাই, উদীয়মান মার্কসীয় দর্শন প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থ পূরণ করেছিল।

কিন্তু, সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের বিকাশই যে দার্শনিক সামান্যীকরণগুলির উপযুক্ত প্রচুর উপকরণ রেখে গিয়েছিল, এই ঘটনাটা ছাড়া দর্শন এক নতুন ও উচ্চতর পর্যায় অর্জন করতে পারত না। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে আবিষ্কারগুলি হয়েছিল, সেগুলি প্রকৃতির ব্যাখ্যার এক দৃঢ় ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল, যা পরিচিত হয়েছিল দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদ বলে।

এর মধ্যে সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতেও বড় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রগতিশীল-মনস্ক বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা মনোনিবেশ করেছিলেন সমাজে চলমান

বস্তুগত প্রক্রিয়াসমূহের দিকে, বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাজন ও শ্রেণী সংগ্রাম-সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির দিকে, এবং তাঁরা সরাসরি বুর্জোয়া ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন। দুজন ইংরেজ অর্থশাস্ত্রবিদ, **অ্যাডাম স্মিথ** ও **ডেভিড রিকার্ডো** মূল্যের এক শ্রম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইউটোপীয় সোশ্যালিস্ট **ক্লদ সাঁ-সিমোঁ, শার্ল ফুরিয়ে** ও **রবার্ট ওয়েনের** প্রচারিত চিন্তাভাবনাও মার্কসীয় দর্শন গঠনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক ভবিষ্যৎ সমাজে উপনীত হওয়ার বাস্তব উপায়গুলি তাঁরা দেখতে পান নি, এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথ বাতিল করেছিলেন, তা হলেও, পুঁজিবাদ সম্বন্ধে তাঁদের অনুমিত ধারণাগুলি মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা গুরুত্বসহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন।

মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত ছিল জার্মান ক্লাসিকাল দর্শন, সেই সময়ে যা দার্শনিক চিন্তার শ্রেষ্ঠ সব কিছুর প্রতিনিধিত্ব করত, বিশেষত হেগেলের ডায়ালেকটিকস ও ফয়েরবাখের বস্তুবাদ। হেগেল তাঁর ডায়ালেকটিকসকে বিশদ করেছিলেন এক ভাববাদী ভিত্তির উপরে। ভাবধারণার দ্বান্দ্বিকতায় বস্তুনিচয়ের দ্বান্দ্বিকতা তিনি প্রমাণ করেন নি, শুধু 'প্রতিভাদীপ্তভাবে অনুমান' করেছিলেন। অবধারণার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অবশ্যম্ভাবীরূপেই হেগেলের ভাববাদী মতপ্রণালীর বিরোধী ছিল, তাই তাঁর দর্শনের গণ্ডি ছিল সীমিত। অপরপক্ষে, ফয়েরবাখ বস্তুবাদী অবস্থানসমূহ থেকে হেগেলের দর্শনের এক

প্রতিভাদীপ্ত সমালোচনাত্মক বিচার করেছিলেন, কিন্তু ডায়ালেকটিকস আর বস্তুবাদকে একটিমাত্র সমগ্রে মেলাতে পারেন নি, তাই সামাজিক ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে তাঁর বস্তুবাদকে প্রয়োগ করতে তিনি অপারগ হয়েছিলেন।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানবজ্ঞানের সমগ্র পূর্ববর্তী ক্রমবিকাশ মার্কসীয় দর্শনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই নতুন দার্শনিক তত্ত্বটির সূত্রায়নের জন্য, সেই সময় অবধি মানবমন যা কিছু সৃষ্টি করেছিল সেই সবেরই শুধু আয়ত্তীকরণ ও মিলনই যে প্রয়োজন হয়েছিল তাই নয়, সেগুলির এক বুনিয়াদি সমালোচনাত্মক পুনর্বিবেচনাও প্রয়োজন হয়েছিল। আবার লেনিনের শরণ নেওয়া যাক। তিনি লিখেছেন, 'মানবজাতির সর্বাগ্রগণ্য মনীষারা ইতিপূর্বেই যে প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন সেগুলির উত্তর যোগানোর মধ্যেই রয়েছে মার্কসের প্রতিভা।'*

মার্কসবাদ হল কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের (১৮২০-১৮৯৫) সৃষ্টি; বিশ্ব ইতিহাসে তাঁদের নাম চিরকাল একসঙ্গে যুক্ত থাকবে। জন্মসূত্রে তাঁরা প্রলেতারীয় ছিলেন না; তা হলে এটা কীভাবে ঘটল যে তাঁরা, জার্মান সমাজের সুবিধাভোগী বর্গের সন্তান (মার্কসের পিতা ছিলেন বিখ্যাত

---

* V. I. Lenin, *The Three Sources and Three Component Parts of Marxism,* Collected Works, Vol. 19, p. 23.

আইনজীবী, আর এঙ্গেলসের পিতা একটি সুতাকলের মালিক), শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ব্যক্ত করেছিলেন? তীব্র হয়ে ওঠা শ্রেণী সংগ্রামের কালপর্বে বুর্জোয়া সমাজ বিখণ্ডিত হয়ে যেতে শুরু করে, এবং শাসক শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশ তাকে পরিত্যাগ করে পক্ষাবলম্বন করে বিপ্লবী শ্রেণীর, ভবিষ্যৎ যাদের হাতে রয়েছে। প্রত্যেকেই যে এই রকম পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম তা নয়; তার জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও সাহস, তথা একজন লোক জন্মগতভাবে যে শ্রেণীর অন্তর্গত তার বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি কাটিয়ে ওঠার সামর্থ্য।

মার্কস ও এঙ্গেলস যখন সহযোগী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন (১৮৪৪), তার মধ্যে উভয়েই প্রলেতারিয়েতের পালিতব্য ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন; রাজনৈতিক সংগ্রামেও তাঁরা নবাগত ছিলেন না, তাঁদের কালের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলি তাঁরা অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সমালোচনাত্মকভাবে পুনর্বিচার করেছিলেন।

মার্কসীয় দর্শন গঠনের ক্ষেত্রে দুটি বড় পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হল সেই কালপর্বটি যখন মার্কস ও এঙ্গেলসের দার্শনিক ভাবধারণাগুলি রূপ পরিগ্রহ করছিল, এবং যখন তাঁরা ভাববাদী ও বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আর বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অবস্থানে এসেছিলেন। এই পর্যায়টি শেষ হয়েছিল ১৮৪৪ সাল নাগাদ। দ্বিতীয় পর্যায়ে, কিংবা পরিপক্ক

মার্কসবাদের কালপর্বে, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল প্রতিজ্ঞাগুলি বিশদ করা হয়েছিল।

যে মতবাদ দর্শনে এক সন্ধিক্ষণ হয়ে উঠেছিল, সেই মতবাদ সৃষ্টিতে সফল হওয়ার আগে মার্কস ও এঙ্গেলস এক দুরূহ পথ অতিক্রম করেছিলেন। শুরুতে তাঁরা ছিলেন বিপ্লবী গণতন্ত্রী এবং ব্যাপক জনসাধারণের অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন। দুজনেই তাঁদের যৌবনে ক্লাসিকাল জার্মান দর্শনকে, বিশেষত হেগেলের বিষয়মুখ ভাববাদের দর্শনকে শ্রদ্ধা করতেন। হেগেলের দর্শনের যে বামপন্থী সমর্থকরা (তরুণ হেগেলপন্থীরা) তা থেকে বৈপ্লবিক ও নিরীশ্বরবাদী সিদ্ধান্ত টানতে চেষ্টা করতেন, তাঁরা তাঁদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁরা প্রত্যয়শীল হয়েছিলেন যে নিরীশ্বরবাদী ও বৈপ্লবিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভাববাদ বেমানান। তাই তাঁরা ফয়েরবাখের বস্তুবাদী দর্শনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৪৫-১৮৪৬ সালে তাঁরা প্রকাশ করেন তাঁদের সম্মিলিত রচনা 'জার্মান ভাবাদর্শ', তাতে শুধু হেগেলের ভাববাদকেই নয়, ফয়েরবাখের নৃবিদ্যাগত, অনুধ্যানমূলক বস্তুবাদেরও সমালোচনা করা হয়।

এক নতুন প্রলেতারীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি বিশদ করার সঙ্গে সঙ্গে, মার্কস ও এঙ্গেলস এক প্রলেতারীয় পার্টি গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য ব্যবহারিক বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপেও নেতৃত্ব দেন। ১৮৪৭ সালে তাঁরা এই ধরনের একটি পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন 'লীগ অফ কমিউনিস্টস' নামে এবং তার জন্য লেখেন একটি

কর্মসূচি — 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' — যা মার্কসীয় দর্শনের সূত্রায়নকে পরিপূর্ণ রূপ দান করেছিল এবং **দার্শনিক চিন্তায় এক বিপ্লবের** পরিচায়ক ছিল। এই নতুন বৈপ্লবিক দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম ডায়ালেকটিকস ও বস্তুবাদকে একটিমাত্র সমগ্রে মিলিত করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেন। মার্কসবাদের আত্মপ্রকাশের আগে, ডায়ালেকটিকসকে অনেকাংশে বিকশিত করা হয়েছিল এক ভাববাদী ভিত্তিতে, আর বস্তুবাদ ছিল অধিবিদ্যামূলক। **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ** সৃষ্টি হওয়ায় ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশে প্রকৃতি, সমাজ ও খোদ মানুষের এক সুসংগত বস্তুবাদী ব্যাখ্যার পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

সমস্ত প্রাক-মার্কসীয় দার্শনিকের — বস্তুবাদী ও ভাববাদী, দু ধরনেরই — এক জায়গায় মিল ছিল — সামাজিক ব্যাপারসমূহকে তাঁরা বিচার করতেন ভাববাদী অবস্থান থেকে, ইতিহাসকে গণ্য করতেন মানুষের ভাবধারণা, বাসনা ও ইচ্ছার এক ক্রমান্বিত মূর্তরূপ বলে। মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম বস্তুবাদকে প্রয়োগ করেন সামাজিক ব্যাপারসমূহ ব্যাখ্যার কাজে। ভাববাদকে তার শেষ আশ্রয়স্থল, মানবেতিহাস থেকে বিতাড়িত করা হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত মার্কসীয় দর্শন এখন তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করল এক নতুন অঙ্গকে — **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ**। লেনিন লিখেছেন, 'মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তনে এক বিরাট কীর্তি ছিল।

ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক অভিমতে আগে যে বিশৃঙ্খলা ও খামখেয়ালিপনা বিরাজিত ছিল, তা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল এক জাজ্বল্যমানরূপে অখণ্ড ও সুসমঞ্জস বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে...'।*

দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্রায়ন দর্শনে সংঘটিত বিপ্লবের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করেছিল। দর্শনের বিষয়বস্তু ও ক্রিয়ার ব্যাখ্যা, তথা বিজ্ঞান, কর্মপ্রয়োগ ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে তার সংযুক্তির ব্যাখ্যা, পরিবর্তিত হয়েছিল।

পুরনো অর্থে, অন্যান্য বিজ্ঞান, ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিপরীতরূপে দর্শন আজ আর নেই। মার্কস ও এঙ্গেলসের একজনও পূর্বসূরী দর্শন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক সুসংগতভাবে প্রতিপাদন করতে পারেন নি, কিংবা তার আত্মপ্রকাশের জন্য যে সামাজিক অবস্থা প্রয়োজন তা প্রকাশ করতে পারেন নি, অথবা যে সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য তা নির্ধারিত তাও প্রকাশ করতে পারেন নি। পূর্ববর্তী সমস্ত দর্শনই ছিল অনুধ্যানমূলক। বারুখ স্পিনোজা যেমন বলেছিলেন, একজন দার্শনিককে অবশ্যই কাঁদলে বা হাসলে চলবে না, তাকে বুঝতে হবে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তু ও ব্যাপারের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতে হবে। মার্কসীয় দর্শনও যা বিদ্যমান তার ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তা পুরনোর

* V. I. Lenin, *The Three Sources and Three Component Parts of Marxism,* Collected Works, Vol. 19, p. 25.

মধ্যে নতুনের অংকুরগুলিকেও দেখতে শেখায়, বিকাশের প্রধান প্রধান ধারাকে, এবং তাই সেই বিকাশকে সংশোধিত-পরিবর্তিত করার সম্ভাবনাগুলিকেও নির্ণয় করতে শেখায়। 'দার্শনিকরা নানানভাবে পৃথিবীকে শুধু ব্যাখ্যাই করেছেন; কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল তা পরিবর্তন করা', বলেছেন মার্কস।* এইভাবে দর্শন তার সামাজিক শর্তাবদ্ধতা ও সামাজিক উদ্দেশ্যকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করেছে। দর্শন সারগতভাবেই যে 'সমালোচনার অস্ত্র', তা হল অস্ত্রটির সমালোচনার এক আবশ্যিক পূর্বশর্ত, অর্থাৎ, সমাজের এক বৈপ্লবিক রূপান্তর।

বিবিধ বিজ্ঞানের প্রণালীতন্ত্রে দর্শনের স্থানও পরিবর্তিত হয়। প্রাক-মার্কসীয় চিন্তকরা দাবি করতেন যে পৃথিবীকে বোঝার সন্ধানে দর্শনের এক বিশেষ ভূমিকা আছে; দর্শনকে তাঁরা গণ্য করতেন 'সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' বলে। দর্শন অবশ্যই বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বিবেচনা করবে না, কেননা সেগুলির উপরেই তা নির্ভর করে এবং প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তনের সাধারণতম নিয়মগুলি উদ্ঘাটন করার জন্য সেগুলির যোগানো তথ্যাদিরই সারসংক্ষেপ গ্রহণ করে। এক সাধারণ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ক্রিয়া সম্পন্ন করার সময়ে দর্শন পৃথিবীকে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগগুলি আবিষ্কার করে এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে এক

* Karl Marx, *Theses on Feuerbach,* in: Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Vol. 5, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 5.

মতবাদ উপস্থিত করে। ভাষান্তরে, **বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতত্ত্বগত ক্রিয়াগুলি বিজ্ঞানসম্মত দর্শনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।**

সাধারণত, প্রাক-মার্কসীয় দার্শনিকরা মনে করতেন যে তাঁদের দর্শন পৃথিবী সম্বন্ধে এক পরম, সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত জ্ঞান দেয়। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমাণ করেন যে কর্মপ্রয়োগ, সামাজিক জীবন ও সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী, খোলাখুলি স্বীকৃত যোগসূত্র হেতু, মার্কসীয় দর্শন তার মূলনীতিগুলির নিয়ত বিকাশ ও সমৃদ্ধিসাধনকে পূর্বানুমান করে। মার্কসবাদ একটা আপ্তবাক্য নয়; তা হল ক্রিয়ার পথনির্দেশ। তাই তার **সৃষ্টিশীল** চরিত্রই তার বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ।

লেনিনের রচনাবলীতে দর্শনের বিকাশ মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল চরিত্র ও সামাজিক কর্মপ্রয়োগের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র প্রকাশ করে। লেনিন লিখেছেন: 'মার্কসের তত্ত্বকে আমরা সম্পূর্ণকৃত ও অলংঘনীয় একটা কিছু বলে গণ্য করি না; বরংচ, আমরা প্রত্যয়শীল যে তা সেই বিজ্ঞানটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে, সমাজতন্ত্রীদের যাকে অবশ্যই সকল দিকে বিকশিত করতে হবে, যদি তারা জীবনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চায়।'*

---

* V. I. Lenin, *Our Programme,* Collected Works, Vol. 4, Progress Publishers, Moscow, 1977, pp. 211-*212.*

নতুন যুগ, নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, এবং সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য দরকার হয়েছিল নতুন নতুন দার্শনিক সামান্যীকরণ। লেনিন মার্কসীয় দর্শনের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন পুঁজিবাদের পতনের যুগে, যখন তা প্রবেশ করছিল তার শেষ পর্যায়ে, সমাজতন্ত্র ও সমাজবিপ্লবগুলিতে উত্তরণের পর্যায়ে। ২০শ শতাব্দীর শুরুতে বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রটি সরে এসেছিল রাশিয়ায়, যেখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক দ্বন্দ্ববিরোধগুলি সে সময়ে চরমে উঠেছিল, এবং দেশটি তখন ছিল সাম্রাজ্যবাদের শিকলে 'দুর্বলতম গ্রন্থি'। বর্ধিত দ্বন্দ্ববিরোধের এই যুগে, মার্কসবাদ তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়েছিল এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষাগুলিকে নানান ধরনের বুর্জোয়া মতবাদ দিয়ে সংশোধিত-পরিবর্তিত করে তাকে 'উন্নত' করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছিল। বস্তুর গঠনকাঠামো সম্বন্ধে পুরনো ধারণাগুলি বর্জিত হচ্ছিল, তাই বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন পদ্ধতিতত্ত্বগত মানদণ্ড প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয়েছিল।

এই অবস্থায় মার্কসবাদকে শুধু রক্ষা ও সমর্থন করাই নয়, ব্যবহারিক প্রয়োজন, বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানগুলির বিকাশকে গণ্য করে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে বিশদ করাও দরকার ছিল। 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতামূলক-বিচারবাদ', 'দর্শন-বিষয়ক নোটবই', 'জঙ্গি বস্তুবাদের গুরুত্ব

প্রসঙ্গে', 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' প্রভৃতি রচনার বিধৃত লেনিনের ভাবধারণাগুলি সেই সময়কার অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর যুগিয়েছিল। বস্তু ও তার মূল গুণ-ধর্ম সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্বকে লেনিন সমৃদ্ধ করেছিলেন, জ্ঞানতত্ত্বের উন্নতিসাধন করেছিলেন এবং বিভিন্ন শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রাম, বিপ্লব, রাষ্ট্র, ইতিহাসে জনসাধারণ ও ব্যক্তিমানুষদের ভূমিকা ও কমিউনিস্ট গঠনরূপ সম্বন্ধে মার্কসীয় শিক্ষায় বিপুল অবদান রেখেছিলেন। তিনি মার্কসীয় তত্ত্বে বিকৃতিসাধনের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপায়ও দেখিয়েছিলেন এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও সংশোধনবাদের সমালোচনার নীতিসমূহ সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। দর্শনে পক্ষভুক্তি সম্বন্ধে তাঁর বিশদ নীতিও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন এখন বিকশিত করা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ প্রচেষ্টায়, তারা তাদের কার্যকলাপে চালিত হয় এই দর্শনের নীতিগুলির দ্বারা। তার বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে, মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের সামনে রয়েছে বহু সমস্যা, এবং তা সেই সবগুলিই সাফল্য সহকারে সমাধান করে। সমস্যাগুলির মধ্যে আছে — উন্নত সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি, সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা, আন্তর্জাতিক ও জাতীদের মধ্যে সম্পর্ক, ইত্যাদি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সফলভাবে তার ভাবাদর্শগত প্রতিপক্ষীয়দের ক্রমবর্ধমান আক্রমণকেও প্রতিহত করছে।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন এক আন্তর্জাতিক ব্যাপার।

তা হল বিপ্লবী সংগ্রামে সকল দেশের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের তত্ত্ব সর্বশক্তিমান, কারণ তা সত্য। ইতিহাস যত এগিয়ে যাবে, মার্কসীয় দর্শন ততই নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করবে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিন যে কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন আজ তা সম্পূর্ণরূপে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে: 'ইতিহাসের আগামী কালপর্বে, প্রলেতারিয়েতের মতবাদ হিসেবে মার্কসবাদের সামনে অপেক্ষা করে আছে আরও বৃহত্তর জয়।'*

---

* V. I. Lenin, *The Historical Destiny of the Doctrine of Karl Marx,* Collected Works, Vol. 18, Progress Publishers, Moscow, 1973, p. 585.

টীকা ও ব্যাখ্যা

অজ্ঞাবাদ — যে মতবাদ পৃথিবীকে জানার সম্ভাবনা আংশিকভাবে বা সমগ্রভাবে বাতিল করে।

অদ্বৈতবাদ — যে মতবাদের অভিমত হল এই যে সমস্ত অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত নীতি হল একটি উৎস: বস্তু বা অধ্যাত্মা।

অধিবিদ্যা — চিন্তনের এক অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, ডায়ালেকটিকসের বিপরীত। বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহকে অধিবিদ্যা গণ্য করে অমোঘ ও পরস্পর-নিরপেক্ষ বলে।

অপেক্ষিকতাবাদ বা ব্যতিবর্জবাদ — মানবজ্ঞানের আপেক্ষিকতা, প্রথাগততা ও বিষয়ীমুখতার এক ভাববাদী তত্ত্ব।

অস্তিত্ববাদ — সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শনে এক বিষয়ীমুখ-ভাববাদী ধারা, এর প্রবক্তারা মানুষকে সমাজের বিপ্রতীপে, এবং দার্শনিক জ্ঞানকে বিজ্ঞানের বিপ্রতীপে স্থাপন করেন।

আত্মজ্ঞানবাদ — এক বিষয়ীমুখ-ভাববাদী তত্ত্ব; এই তত্ত্ব অনুযায়ী কেবল আত্ম-রই অস্তিত্ব আছে, আর বিষয়গত

পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে একান্তভাবেই ব্যক্তিমানুষের মনে।

ঈশ্বরবাদ — জগতের এক নৈর্ব্যক্তিক প্রাথমিক কারণ হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। পৃথিবী সৃষ্টি করে ঈশ্বর তাকে ছেড়ে দিয়েছেন নিজের সহায়-সামর্থ্যের হাতে।

একলেকটিকস বা সারগ্রাহিতা — বিভিন্ন, এমন কি কখনও বা বিপরীত, দার্শনিক অভিমতকে ইচ্ছাকৃতভাবে তালগোল পাকানো।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অঙ্গীয় অংশ, এবং যুগপৎভাবে এক সাধারণ সমাজবিদ্যাগত তত্ত্ব, সমাজের ক্রিয়া ও বিকাশ নির্ধারক সাধারণ ও বিশেষ নিয়মগুলি সম্বন্ধে এক বিজ্ঞান। সারগতভাবে তা হল সামাজিক ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সহজাত নীতিগুলির প্রয়োগ।

জ্ঞানতত্ত্ব (Gnosiology, epistemology) — জ্ঞান সম্বন্ধে এক মতবাদ, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের দ্বিতীয় দিক।

ডায়ালেকটিকস — প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার বিকাশের সেই বিজ্ঞান, যা বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহকে সব দিক নিয়ে পরীক্ষা করে। অধিবিদ্যার বিপরীত।

তত্ত্ববিদ্যা (Ontology) — সাধারণভাবে সত্তা সম্বন্ধে মতবাদ, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের প্রথম দিক।

দর্শনে পক্ষভুক্তি — দর্শনের এক বিষয়মুখ, সামাজিক-শ্রেণীগত অভিমুখীনতা, প্রধান প্রধান দার্শনিক ধারার সংগ্রাম আর প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তিগুলির সংগ্রামের মধ্যে এক সংযোগ।

দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্ন — চৈতন্য ও সত্তার মধ্যে, চিন্তন ও

বস্তু, প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক সংক্রান্ত। দুটি দিক নিয়ে গঠিত — তত্ত্ববিদ্যাগত ও জ্ঞানতত্ত্বগত।

দৃষ্টবাদ — বুর্জোয়া দর্শনে এক বিষয়ীমুখ-ভাববাদী ধারা, যার লক্ষ্য হল এমন এক 'বিজ্ঞানসম্মত' দর্শন সৃষ্টি করা, যা বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রামের 'ঊর্ধ্বে' থাকবে। দৃষ্টবাদ অনেকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে। আজ এর প্রতিনিধিত্ব করেন রুডলফ কারনাপ, বারট্রান্ড রাসেল, হান্স রাইখেনবাখ প্রমুখরা।

দ্বন্দ্ববিরোধ, দ্বান্দ্বিক — যে কোনো গতির, বিকাশের এক আভ্যন্তরিক উৎস। দ্বন্দ্ববিরোধের তত্ত্ব হল ডায়ালেকটিকসের প্রাণকেন্দ্র।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ — এক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটি অঙ্গ; প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার নিয়ামক নিয়মগুলি অবধারণার বিশ্বজনীন পদ্ধতি।

দ্বৈতবাদ — যে মতবাদে বস্তু ও চৈতন্যকে দুটি স্বতন্ত্র মূল উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

নানাত্ববাদ — যে মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবী এক প্রস্থ অসংবদ্ধ পদার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, অদ্বৈতবাদের বিপরীত।

নিয়তিবাদ — যে মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীতে সমস্ত প্রক্রিয়া, মানুষের জীবন, আরম্ভে এক সর্বোচ্চ ক্ষমতা, ভাগ্য বা নিয়তির দ্বারা পূর্বনির্ধারিত।

নিয়ম — ব্যাপারসমূহের এক আন্তর, সারগত, স্থিতিশীল, পৌনঃপুনিক ও আবশ্যিক পরস্পরসম্পর্ক। বিষয়গত নিয়মগুলির অবধারণাই সমস্ত বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য।

নিরীশ্বরবাদ — এক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মততন্ত্র, যা আত্মা,

ভগবান ও পরলোকে বিশ্বাস বাতিল করে, এবং সর্বপ্রকার ধর্মকে বর্জন করে।

পদ্ধতি — সত্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপারসমূহ অনুসন্ধান করার একটি উপায়। মার্কসীয় দর্শন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

পদ্ধতিতত্ত্ব — বৈজ্ঞানিক অবধারণা ও পৃথিবীর রূপান্তরের পদ্ধতি সম্বন্ধে এক মতবাদ।

প্রতিফলন — পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে বস্তুনিচয়ের নিজস্ব গঠনকাঠামোর মধ্যে অন্যান্য বস্তুর সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলি প্রতিফলিত করার এক স্বকীয় গুণ। প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় চেতন ও অচেতন প্রকৃতির মধ্যে, তথা সমাজেও, তার উচ্চতর রূপ হল চৈতন্য।

প্রয়োগবাদ — সত্যকে উপযোগিতার সঙ্গে একাত্ম করার নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শনে এক বিষয়ীমুখ-ভাববাদী ধারা, উপযোগিতাকে একজন ব্যক্তিমানুষের বিষয়ীমুখ স্বার্থের পূরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। আজ প্রয়োগবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে আছেন চার্লস পীয়র্স, উইলিয়াম জেমস্ ও জর্জ ডিউই।

বস্তু — যে বিষয়গত বাস্তব চৈতন্যের বাইরে ও চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে থাকে ও তার দ্বারা প্রতিফলিত হয়।

বস্তুবাদ — ভাববাদের বিরোধী একটি প্রধান দার্শনিক ধারা। বস্তুবাদের বক্তব্য হল — বস্তুই মুখ্য এবং আত্মিক গৌণ। বস্তুবাদের স্বতঃস্ফূর্ত, অধিবিদ্যাগত ও স্থূল রকমফের আছে। এর উচ্চতর রূপ হল দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ — প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ সম্বন্ধে এক সুসংগত বস্তুবাদী অভিমত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এক অঙ্গ।

বিমূর্তন — পদার্থসমূহের নির্দিষ্ট কিছু গুণ-ধর্ম কিংবা

সেগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক উপেক্ষা করে, একটিমাত্র গুণ-ধর্ম বা সম্পর্কের দিকে মনোনিবেশ করা।

বিষয়মুখ — মানবচৈতন্য-নিরপেক্ষ।

বিষয়ীমুখ — মানব চৈতন্য-নির্ভর।

ভাবাদর্শ — দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নীতিশাস্ত্রগত ও নান্দনিক এক মততন্ত্র, চূড়ান্ত বিশেষণে যা সামাজিক শ্রেণীগুলির স্বার্থকে প্রকাশ করে।

ভাববাদ — এক দার্শনিক ধারা, যা দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্ন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্তুবাদের একেবারে বিপরীত। আত্মিক বিষয়টাই মুখ্য এই নীতি থেকে তা অগ্রসর হয়। বিষয়ীমুখ ও বিষয়মুখ ভাববাদের মধ্যে প্রভেদনির্ণয় করতে হলে, প্রথমোক্তটি পৃথিবীকে দাঁড় করায় ব্যক্তিগত চৈতন্যের ভিত্তির উপরে, এবং দ্বিতীয়োক্তটি মনে করে যে বাস্তবের ভিত্তি হল এক অ-বস্তুগত অধ্যাত্মা, এক ধরনের অতি-একক মন বা ঈশ্বর।

মতান্ধতা — মূর্ত-নির্দিষ্ট অবস্থা, বিজ্ঞান ও কর্মপ্রয়োগের প্রয়োজন-নির্বিশেষে অপরিবর্তনীয় ধারণা ও সূত্র-ভিত্তিক চিন্তার ধরন।

মানবিকবাদ — একজন ব্যক্তি হিসেবে মানুষের মর্যাদা, তার অবাধ বিকাশ ও সুখের অধিকারের প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তনশীল এক মততন্ত্র।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ — এক বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক মততন্ত্র, মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক সৃষ্ট এবং লেনিনের দ্বারা সৃষ্টিশীলভাবে বিকশিত। মার্কসবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তা শ্রমিক শ্রেণীর বুনিয়াদি স্বার্থ প্রকাশ করে।

শ্রেণীসমূহ, সামাজিক — জনগণের বড় বড় গোষ্ঠী, সামাজিক উৎপাদনের এক ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত ব্যবস্থায় যে স্থান তারা অধিকার করে তার দ্বারা, এবং সর্বোপরি উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দ্বারা যারা একে অপরের থেকে পৃথক।

সংশয়বাদ — যে মতবাদ বিষয়গত বাস্তবের জ্ঞানের সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সুসংগত সংশয়বাদ আর অজ্ঞাবাদের মধ্যে তফাৎ সামান্যই।

সত্য — চিন্তায় বাস্তবের সঠিক প্রতিফলন, যা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যাচাই হয় কর্মপ্রয়োগ দিয়ে।

সফিস্টি — সফিজম, বা কুতর্কের ইচ্ছাকৃত প্রয়োগ, অর্থাৎ বিতর্কে বা যুক্তি উপস্থাপনায় ভাসা-ভাসাভাবে আপাত-ন্যায়সংগত, আপাত-মনোহর যুক্তির প্রয়োগ।

স্বতঃপ্রণোদনাবাদ বা স্বেচ্ছাবাদ — দর্শনে এক ভাববাদী ধারা, যা পৃথিবীতে বিদ্যমান সব কিছুর মুখ্য ভিত্তি বলে গণ্য করে ইচ্ছাশক্তিকে।

হাইলোজোইজম — সকল বস্তুরই প্রাণ আছে, এই শিক্ষা।

নামের সূচি

আরিস্ততল (৩৮৪-৩২২ খ্রীঃ পূঃ) — প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক ও বহুমুখী পণ্ডিত, প্রাচীন কালের মহৎ চিন্তানায়ক, বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

ইবন রুশদ (আভেরোস) (১১২৬-১১৯৮) — মধ্যযুগীয় আরবীয় দার্শনিক ও পণ্ডিত, আরিস্ততলের দর্শনের বস্তুবাদী উপাদানের বিকাশ করেছেন।

ইবন সিনা (আভিৎসেন্না) (৯৮০-১০৩৭) — মধ্যযুগীয় প্রাচ্য দার্শনিক, চিকিৎসক, পণ্ডিত।

এঙ্গেলস (Engels), **ফ্রিডরিখ** (১৮২০-১৮৯৫) — প্রলেতারিয়েতের নেতা ও শিক্ষক, মার্কসের সঙ্গে একত্রে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব, দ্বন্দ্ববাদী ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সৃষ্টি করেন।

কাণ্ট (Kant), **ইমানুয়েল** (১৭২৪-১৮০৪) — জার্মান দার্শনিক ও পণ্ডিত, জার্মান চিরায়ত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা।

কোঁত (Comte), **অগ্যুস্ত** (১৭৯৮-১৮৫৭) — ফরাসী দার্শনিক, দৃষ্টবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

জেমস্ (James), **উইলিয়াম** (১৮৪২-১৯১০) — মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক, প্রয়োগবাদের বিষয়ীগত ভাববাদী দর্শনের প্রতিনিধি।

থেলস (আনুমানিক ৬২৪-৫৪৭ খ্রীঃ পূঃ) — প্রচীন গ্রীসের দর্শনের প্রথম ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিনিধি।

দেকার্ত (Descartes), **রেনে** (১৫৯৬-১৬৫০) — ফরাসী দার্শনিক ও পণ্ডিত, দ্বৈতবাদের প্রতিনিধি।

নীট্শে (Nietzsche), **ফ্রিডরিখ** (১৮৪৪-১৯০০) — জার্মান ভাববাদী দার্শনিক, স্বেচ্ছাবাদের পক্ষপাতী।

প্লেটো (৪২৮-৪২৭-৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ) — প্রাচীন গ্রীসের ভাববাদী দার্শনিক, বিষয়গত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা।

বার্কলি (Berkeley), **জর্জ** (১৬৮৫-১৭৫৩) — ইংরেজ দার্শনিক, বিষয়ীগত ভাববাদী।

মার্কস (Marx), **কার্ল** (১৮১৮-১৮৮৩) — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের, দ্বন্দ্ববাদী ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দর্শনের, বৈজ্ঞানিক অর্থশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা ও শিক্ষক।

লক (Locke), **জন** (১৬৩২-১৭০৪) — ইংরেজ বস্তুবাদী দার্শনিক।

লাও-জি (৬ষ্ঠ-৫ম শতাব্দী খ্রীঃ পূঃ) — প্রাচীন চীনের মহৎ দার্শনিক।

লামেত্রি (Lamettrie), **জুলিয়েন অফ্রে দ্য** (১৭০৯-১৭৫১) — ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিক।

লুক্রেটিয়াস কারাস (৯৯-৫৫ খৃীঃ পূঃ) — রোমক কবি ও বস্তুবাদী দার্শনিক।

লেনিন, ভ্লাদিমির ইলিচ (১৮৭০-১৯২৪) — রুশ ও আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা, সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা।

সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খৃীঃ পূঃ) — প্রাচীন গ্রীসের ভাববাদী দার্শনিক।

সার্ত্র (Sartre), **জাঁ-পল** (১৯০৫-১৯৮০) — ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক, অস্তিত্ববাদের বিষয়ীগত ভাববাদী দর্শনের প্রতিনিধি।

স্পিনোজা (Spinoza), **বেনেডিক্ট** (১৬৩২-১৬৭৭) — ওলন্দাজ বস্তুবাদী দার্শনিক।

স্পেনসার (Spencer), **হার্বার্ট** (১৮২০-১৯০৩) — ইংরেজ দার্শনিক, সমাজবিদ, মনস্তাত্ত্বিক, দৃষ্টবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

হিউম (Hume), **ডেভিড** (১৭১১-১৭৭৬) — ইংরেজ দার্শনিক, বিষয়ীগত ভাববাদের প্রতিনিধি।